সাহিত্য-শিল্প

সাহিত্য-শিল্প

(বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মুখ্য সাহিত্য-রূপ সমূহের লক্ষণ ও ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও প্রধান অধ্যাপক
ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
প্রণীত

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৫৪/৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই গ্রন্থকারের সম্পাদিত ও রচিত অন্যান্য পুস্তক

১। অভিনয়-দর্পণ (সংস্কৃত ও ইংরেজী), কলিকাতা—১৯৩৪

২। Medieval Mysticism of India (Translated from t Bengali), London, 1935

৩। চতুরঙ্গ-দীপিকা (সংস্কৃত ও ইংরেজী), কলিকাতা, ১৯৩৬

৪। পাণিনীয়-শিক্ষা (সংস্কৃত ও ইংরেজী), কলিকাতা, ১৯৩৮

৫। কর্পূরমঞ্জরী (প্রাকৃত ও ইংরেজী), কলিকাতা, ১৯৩৯

৬। বাংলা গদ্যের চাব যুগ, কলিকাতা, ১৯৪২

৭। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, কলিকাতা, ১৯৪২

৮। প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা, কলিকাতা, ১৯৪৫

সাহিত্য-শিল্প

সূচীপত্র

শ্রীমতী মমতা ঘোষের

করকমলে—

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়াবার সময় সাহিত্য-শিল্প সম্বন্ধে ছাত্রদের উপযোগী একখানি বাংলা পুস্তকের অভাব বোধ করেছিলাম। যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়তে আসে সাহিত্যের রচনা-কৌশল সম্পর্কিত মোটামুটি বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাদের অধিকাংশের জ্ঞানের অল্পতা দেখেই এ অভাবের কথা মনে জাগে। অধুনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বাংলা পড়াতে গিয়েও এ ধারণা দৃঢ়তর হয়েছে। এই হ'ল উপস্থিত গ্রন্থের রচনা ও প্রকাশের কৈফিয়ৎ।

বাংলা ভাষায় সাহিত্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার বই একাধিক আছে। তাদের কোনো কোনোটির মূল্যবত্তাও যথেষ্ট কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ বি. এ, এম. এ পরীক্ষার্থী ছাত্রদের পক্ষে সেগুলি খুব সুগম নয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ' আদি মূল্যবান্ গ্রন্থের উল্লেখ করতে হয়। সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে মোটামুটি প্রাথমিক জ্ঞান নিয়ে যদি কেউ এ পুস্তকগুলি পড়েন তবে তিনি সাহিত্য আলোচনা ও উপভোগের পদ্ধতি সম্বন্ধে নানা দুর্লভ তথ্য ও ইঙ্গিত লাভ করতে পারেন। উপস্থিত গ্রন্থ এরূপ প্রাথমিক জ্ঞান দানের উদ্দেশেই রচিত। তাই এতে প্রায়শ কোনো উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-তত্ত্ব বা সাহিত্য সমালোচনার প্রসঙ্গ আনা হয় নি।

বাংলায় লিখিত সাহিত্য-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বইগুলির লেখকগণ তাঁদের আলোচনায় দু'রকম পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। সে পদ্ধতি দুটির সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা সঙ্গত মনে করি। উল্লিখিত লেখকগণের মধ্যে একদল মুখ্যত প্রাচীন ভারতীয় সংজ্ঞা পরিভাষার সাহায্যে সাহিত্য-তত্ত্বের আলোচনা করেছেন। এ শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে মনে হয়। তাঁর 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' নামক গ্রন্থে প্রাচীন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের সাহায্যে তিনি বেশ নিপুণ ভাবে কাব্যের উপাদেয়তা বিচারের পথ দেখিয়েছেন। সাহিত্যিক বিচার সম্বন্ধে এ দেশের প্রাচীন পদ্ধতির যাঁরা পরিচয় পেতে চান এ বই তাঁদের পক্ষে পরম মূল্যবান্। প্রাচীন শাস্ত্রধারার প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি কয়েকটি গুণের জন্যে 'কাব্য-জিজ্ঞাসা'র আলোচনা-পদ্ধতি বিশেষ প্রশংসনীয় হলেও এ পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তকের জন্যে ততটা উপযোগী নয়। অল্প-বিস্তর গত দেড়শ' বছরের চেষ্টায় বাঙালী যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছে তার জন্যে দায়ী প্রধানত ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেরণা। তাই, যে বাংলা

সাহিত্য একান্ত-ভাবে আধুনিক, ও আধুনিক মানবের সৃষ্টি তার বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করবার জন্যে অপ্রচলিত বা অল্প প্রচলিত প্রাচীন সংজ্ঞা পরিভাষা তথা দৃষ্টান্তের সাহায্য নেওয়া কতকটা অসুবিধার কারণ হতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে প্রায়শ অপরিচিত ছাত্রদের নিকট 'রীতি', 'রস', 'ধ্বনি' আদি সম্পর্কিত সূক্ষ্ম বিচার প্রাচীনদের পন্থায় করতে গেলে তাদের নিকট সে সকল দুরূহ মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

উল্লিখিত লেখকদের দ্বিতীয় দল সাহিত্যের তথা সাহিত্য-তত্ত্বের আলোচনায় আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচকদের অবলম্বিত পদ্ধতিই যথাযোগ্য ভাবে অনুসরণ করে থাকেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন এ শ্রেণীর সাহিত্য-সম্বন্ধীয় লেখকদের পুরোভাগে। এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, তাঁর অবলম্বিত পদ্ধতিই বাংলার সাহিত্য-তত্ত্বের আলোচনায় অপেক্ষাকৃত সহজে ফলপ্রদ ও সহজবোধ্য পদ্ধতি। কিন্তু এ উক্তি দ্বারা এমন বোঝায় না যে, প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রের ব্যবহৃত সংজ্ঞা গুলির ব্যবহার কখনই করা উচিত নয়। প্রয়োজনমত তাদের ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু সাধারণ অর্থে বা ঈষৎ পরিবর্তিত অর্থে। পরিবর্তিত অর্থের একটা দৃষ্টান্ত 'রীতি'। ইংরাজীতে style বলতে যা বোঝায় সংস্কৃত সাহিত্যের 'রীতি' ঠিক সে জিনিষ নয়। তবে style অর্থে রীতি কথাটির ব্যবহার অসঙ্গত নয়, কারণ সংস্কৃত সাহিত্যে 'রীতি'র যে অর্থ সে অর্থে বাংলায় কথাটির বহুল প্রয়োগ সম্ভবপর নয় তাই style অর্থে রীতি শব্দের ব্যবহারে কোনো দোষ আছে বলে মনে হয় না। যদি কারো এতে ভিন্ন মত থাকে তবে রচনা-রীতি শব্দ ব্যবহার করলেই গোল চুকে যায়। রচনা-রীতি বলতে যা বোঝায় style শব্দের অর্থও প্রায় তাই। ইংরাজী শব্দের তর্জমায় অনুরূপ পদ্ধতির ব্যবহারের অন্য দৃষ্টান্ত religion অর্থে ধর্ম শব্দের প্রয়োগ। প্রাচীনদের চিন্তায় যা কথনো আসে নি এমন অর্থেই ধর্ম শব্দটি আজকাল ব্যবহৃত হচ্ছে। তবু তা নিয়ে কোনো প্রতিবাদ বা আপত্তি নেই। বোঝাবার জন্যে কথনো কথনো প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রের সুপ্রচলিত শব্দগুলির ব্যবহার করলেও বাংলায় সাহিত্য-শিল্পের আলোচনার বেলায় আধুনিক পাশ্চাত্য দৃষ্টি-ভঙ্গী যথা-পরিমাণে অবলম্বিত হয়েছে এ পুস্তকে।

উপস্থিত আলোচনায় নানা সাহিত্যিক রূপের বিশ্লেষণ মুখ্য কাজ হলেও একান্তভাবে সেরূপ বিশ্লেষণ করে' গেলে বক্তব্য বিষয় আকর্ষণ-হীন হতে পারে এই আশঙ্কায়, বাংলার ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যরূপ গুলি কেমন করে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে প্রায়শ তার ঐতিহাসিক বিবৃতি-প্রসঙ্গেই সে সকল সাহিত্য-রূপকে বোধগম্য করাবার চেষ্টা করা গিয়েছে। এরূপ প্রণালী অনুসরণের ফলে

উল্লিখিত ঐতিহাসিক বিবৃতিতে বাংলা সাহিত্যের সকল গুণী লেখকের নাম করা সম্ভবপর হয় নি। প্রত্যেক দেশেই এমন এক শ্রেণীর লেখক থাকেন যাঁদের রচনা সাহিত্য হিসাবে খুব মূল্যবান্ হলেও সাহিত্যিক রূপের ক্রম-বিকাশে তাঁদের দান নগণ্য। এ জাতীয় লেখকদের নাম তাই উপস্থিত ক্ষেত্রে বাদ পড়েছে। তা সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ কেবল ঐতিহ্য-ধারার বাহক মাত্র নন পরন্তু নূতন সাহিত্যরূপের স্রষ্টাও বটেন, তাই স্বাভাবিক কারণে বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকগণের অধিকাংশেরই নাম এ পুস্তকে এসে গিয়েছে।

নানা গ্রন্থকারের ইংরাজী বাংলা আলোচনা এ বইএর রচনার সাহায্য করেছে। তাঁদের সকলের মধ্যে Hudson, Lascelles Abercrombie, Williams ও রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বক্তব্য বিষয় ভালো করে বোঝাবার সুবিধা হবে মনে করে কয়েকস্থলে তাঁদের ভাবের এবং ভাষার অনুবৃত্তি ও উদ্ধার করেছি। এ ছাড়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র (রায় বাহাদুর), ডক্টর শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়গণের কোনো কোনো পুস্তক আমার কাজে লেগেছে। এজন্যে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার স্ত্রী শ্রীমতী মমতা ঘোষ প্রুফ সংশোধনের কালে এ বইএর নানা ভ্রমপ্রমাদ দূর করেছেন; তাঁর সাহায্যও এস্থলে স্বীকার্য। যদি এ পুস্তক দ্বারা ছাত্রদের এবং সাধারণ সাহিত্য-রসিকদের বিন্দুমাত্রও উপকার হয়, তা হলে আমার শ্রম সার্থক হ'ল বলে মনে করব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
১লা জুলাই, ১৯৪৫।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

সাহিত্য-শিল্প

প্রথম অধ্যায়

(ক) সাহিত্য-শিল্প

সাহিত্য-শিল্প বলতে কী বোঝায় তা আলোচনার আগে 'শিল্প'-কথাটির অর্থের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। যে জিনিষ তার প্রকৃতিদত্ত-রূপে বর্তমান নয়, মানুষের ক্রিয়া-কৌশল-প্রসূত, ব্যাপক-অর্থে তাকেই বলা হয় শিল্প। মানুষ নিজ প্রযত্নের দ্বারা কোনো বস্তুর স্বাভাবিক রূপের যে পরিবর্তন করে তাও শিল্প। কাজেই নৃত্য গীত বাদ্য থেকে আরম্ভ করে' রন্ধন কেশসংস্কার ইত্যাদি সব কিছুকেই শিল্পের পর্যায়ে ফেলা যায়। সংস্কৃত ভাষায় 'কলা' বলে' অপর একটি শব্দ আছে, তাতেও শিল্প বোঝায়। চতুঃষষ্টি কলা চতুঃষষ্টি শিল্পেরই নামান্তর। মানুষের যে স্বাভাবিক ভাষা, প্রায়শ তারই রূপান্তর ঘটিয়ে সৃষ্টি হয় সাহিত্যের। তাই একে বলা হয় শিল্প। এদেশের প্রাচীনেরা যে কাব্য বা সাহিত্যকে চতুঃষষ্টি কলার অন্যতম ব'লে গণনা করেছেন তাও বোধ হয় একারণে। সাহিত্যের স্বরূপ বোঝবার জন্যে একথাটি মনে রাখার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

সাহিত্য কথাটির অর্থ মোটামুটি ভাবে সকলের জানা আছে, তাই তার অর্থ নিয়ে কোনো পৃথক আলোচনা গোড়ায় করবো না; আর, সাহিত্য সম্বন্ধে পাঠকদের ধারণাকে স্ফুটতর করাই সমগ্র বইএর উদ্দেশ্যে, শিল্প হিসাবে সাহিত্যের যে বিশ্লেষণ বইতে করা হবে তার থেকেই সাহিত্যের স্বরূপ স্পষ্টভাবে প্রকটিত হবে আশা করা যায়। মানুষ ইচ্ছা করে' ও চেষ্টা করে' ভাষায় যে সকল রূপান্তর ঘটিয়ে থাকে তাদের মধ্যে এই ব্যাপারটি দেখে আমরা অবাক্ হই যে, কোনও বক্তব্য বিষয়ের বিচার আলাদা করা সম্ভবপর হলেও বলার ধরণটি তার চেয়ে পৃথকভাবে আমাদের তৃপ্তি দেয়; আবার কখনো বক্তব্য বিষয় ও বলার ভঙ্গীটির মধ্যে কোন্‌টি যে অধিকতর তৃপ্তিদায়ক তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা সাক্ষাৎ লাভ করি সাহিত্যের। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে আমরা পাই সে শিল্পকে যে নির্ভর করে' আছে শিল্প-বহির্ভূত অন্য কিছুর উপর। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখি স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ শিল্প। প্রথমটিকে বলা যেতে পারে ব্যবহারিক শিল্প আর দ্বিতীয়টিকে বিশুদ্ধ শিল্প। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা প্রজা' নামধেয় প্রবন্ধাবলির সঙ্গে 'সোনার তরী'র কবিতা-নিচয়ের তুলনা করলেই উপস্থিত বিষয়টি অপেক্ষাকৃত সহজে বোঝা যেতে পারে। এ দুখানি পুস্তকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের অন্তরের ভাবকে প্রকাশ করেছেন', কিন্তু 'রাজা প্রজা' গ্রন্থের প্রবন্ধাবলিতে তাঁর উদ্দেশ্য পাঠকবর্গের সামনে কতকগুলি তথ্যকে উপস্থাপিত করা এবং সে গুলির সাহায্যে

তর্ক-বলে পাঠককে স্বমতে আনয়ন করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে তাঁর প্রকাশভঙ্গী কতটা কার্যকরী হয়েছে তা দিয়েই এখানে তাঁর রচনার বিচার করতে হবে, পরন্তু তাঁর ভাব প্রকাশের ভঙ্গীর দ্বারা নয়। এখানে খোঁজ করার বিষয় এই যে, তাঁর প্রকাশিত তথ্য নির্ভুল কিনা ও তাঁর বিচার প্রণালী তর্কবিধিসঙ্গত কিনা। এদিক দিয়ে জিজ্ঞাসার উদ্রেক করা এবং বিচার করার সহায়তা করাই হচ্ছে তাঁর উল্লিখিত রচনার মুখ্য গুণ। দৈবাৎ যদি এ রচনার প্রকাশভঙ্গী অঙ্গহীন হ'ত তবু তাঁর প্রচারিত তথ্য নির্ভুল এবং বিচার প্রণালী ন্যায়সঙ্গত হতে পারত' ; কিন্তু সেই অবস্থায় তাঁর প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুসাধ্য হ'ত না। অতএব এই "রাজা প্রজা" নামক পুস্তকের সাহিত্যিক গুণ (বা প্রকাশভঙ্গীর উৎকর্ষ) এর উদ্দেশ্য-সাধনের সহায় মাত্র। কিন্তু কেবল এই সাহিত্যিক গুণের দ্বারাই এ গ্রন্থ বিচার্য নয়। কাজেই এই পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ যে প্রকাশ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে গুণাগুণের পার্থক্য আমরা সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু 'সোনার তরী' গ্রন্থের যে-কোনো কবিতার উদ্দেশ্য ও প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে তেমন কোনো প্রভেদ খুঁজে পাওয়া যায় কি? এ কবিতা আমাদের কোনো সত্য বা মিথ্যা খবর দেয় না, সঙ্গত বা অসঙ্গত কোনো যুক্তি তর্কের অবতারণা করে না; আর এখানে সুনীতি দুর্নীতিরও কোনো প্রসঙ্গ নেই; এ হচ্ছে শুদ্ধ কবি-মানসের রূপান্তর প্রাপ্তি, এবং প্রকাশিত রূপ হিসাবেই এর সার্থকতা। শিল্প এখানে আমাদের এমন কোনো অবস্থায় নিয়ে যায় না যেখান থেকে আমরা শিল্প-বহির্ভূত কিছুর বিচার করতে পারি। এ শিল্প নিজের ছাড়া অন্য কিছুরই আনুগত্য করে না। এর থেকে আমরা একে কেবল শিল্প হিসাবে দেখবারই প্রেরণা লাভ করি। শুধু এরকম অর্থেই শিল্পকে বিশুদ্ধ বলা যায়; অথবা আমরা এরূপ অর্থেই শিল্পকে বিশুদ্ধ ব'লে ধ'রে নিই। কারণ রবীন্দ্রনাথের 'রাজা প্রজা' আদি প্রবন্ধাবলিকেও শিল্পকার্য বলে গণ্য করা যায়, কিন্তু ঐ সকল প্রবন্ধের উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ-ভঙ্গীর বিচার করলেই কেবল সেরূপ করা সম্ভব। অতএব দেখা গেল, যে-রচনার উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়েও তাকে সাহিত্য ব'লে গণ্য করা যায় তাই হচ্ছে ব্যবহারিক সাহিত্য। লেখক যাকে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় বলেই নিয়েছেন এখানে আমরা তাকেই উদ্দেশ্য ব'লে ধরে নিই। কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যে লেখকের উদ্দেশ্যকে এমন করে' বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রকাশিত রূপটি স্বপ্রতিষ্ঠভাবে ফুটে' উঠুক এ ছাড়া তাতে লেখকের কোনো উদ্দেশ্যই থাকে না। অতএব সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা কেবল বিশুদ্ধ সাহিত্যেরই গণনা করব। এ ক্ষেত্রে

আমরা ব্যবহারিক সাহিত্যের কথা—যে সাহিত্য কোনো যুক্তি-ধারাকে পাঠকের অনুমোদনযোগ্য করবার জন্যে রচিত, তার সম্বন্ধে কিছু বলব না। এরূপ করার প্রধান কারণ এই যে, ব্যবহারিক সাহিত্যে যে এক-আধটু প্রকাশ-ভঙ্গীর উৎকর্ষ দেখতে পাওয়া যায় বিশুদ্ধ সাহিত্যে তা আরও বেশী পরিমাণে বর্তমান থাকে, আর তা সেখানে অপেক্ষাকৃত অনায়াসে চোখে পড়ে ও বোধগম্য হয়।

সাহিত্য-শিল্পের কথা বলতে গেলে তিনটি পদার্থের প্রসঙ্গ এসে পড়ে, যথা লেখক, পাঠক ও তাঁদের যোগ সাধনের উপায়-স্বরূপ ভাষা ; অর্থাৎ সাহিত্য হচ্ছে ভাব সঞ্চারের ব্যাপার। এখানে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, সাহিত্য লেখক ও পাঠকের মধ্যে যে ভাব-সঞ্চারের কাজ করেন তা কোন্ জাতীয় ভাব? ভাব সঞ্চারের প্রসঙ্গ হলেই এ কথা বুঝতে হবে যে, তা অন্যের মনে সঞ্চারিত হবার মতো রূপ লাভ করেছে এবং অন্যের মন থেকে সঞ্চরণযোগ্য রূপ লাভ করেছে। এই রূপ-গ্রহণ থেকেই তার জাতি নির্ণয় সহজ হয়ে আসে। সাহিত্যকে যখন ভাষায় প্রকাশিত রূপ বলে' ধরে' নেওয়া হয় তখন জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, এ কোন্ পদার্থের প্রকাশিত রূপ ; সাহিত্যে কোন্ পদার্থের রূপ লেখক পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে চান। এখানে সূক্ষ্ম তর্কের অবতারণা না করে' এ কথা ধরে নিতে পারা যায় যে, লেখক নিজ অনুভূতিকেই রূপদান করেন সাহিত্যে ; কিন্তু এ অনুভূতি কি যে-কোনো অনুভূতি, না কোনো বিশেষ রকমের অনুভূতি? যেমন কোনো একজন কৃষক যদি তার অপরিচিত কোনো মাঠে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে তাকায় তবে তার অভ্যাস মতো ভাবতে পারে যে, ঐ মাঠে কত শস্য জন্মাতে পারা যায়, তাতে কত গোরু চরতে পারে ইত্যাদি; কিন্তু অন্য কোনো সহৃদয় ব্যক্তি যদি সে দৃশ্য দেখেন তবে তিনি তাতে নিসর্গের শোভা দেখে চিত্তে অপূর্ব সরসতা অনুভব করতে পারেন। এ রসানুভবের সঙ্গে আমাদের প্রাণীসুলভ স্থূল প্রয়োজন অপ্রয়োজনের কোনো প্রসঙ্গ নেই। এই রসানুভব যে-জাতীয় ভাবকে আশ্রয় করে তাকে ভাষার সাহায্যে পাঠকের বা শ্রোতার চিত্তে সঞ্চারিত করাই সাহিত্যিকের কাজ।

বাইরের জগতের নানা পদার্থ, নানা ঘটনা ইন্দ্রিয়ের দরজা দিয়ে সহৃদয় ব্যক্তির অন্তরে প্রবেশ করে' তাঁর স্বাভাবিক রসবোধকে বিচিত্র অনুভূতির আকারে জাগিয়ে তোলে। তাতে কেবল যে বাইরের জগতের রূপ, রঙ্, ধ্বনি প্রভৃতিই বিদ্যমান থাকে তা নয়, পরন্তু সেই সহৃদয় ব্যক্তির ভালো লাগা মন্দ লাগা, আনন্দ বেদনা, ভয় বিস্ময়ও নানা মাত্রায় বিজড়িত। এরি ফলে সে বাইরের জগৎ তাঁর অন্তরের যোগে এক নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করে।

এ জগৎ একান্তভাবে তাঁর নিজের জগৎ হয়ে পড়ে। সহৃদয় ব্যক্তির এই অন্তর্জগৎটি বাইরের জগতের চেয়ে মানুষের বেশি আপনার। কারণ হৃদয়ের স্পর্শ লাভ করে' তা মানুষের পক্ষে অধিকতর সহজ উপলব্ধির বিষয় হয়ে পড়ে। এই হৃদয়ের সোনার কাঠির স্পর্শে তাতে যে বৈশিষ্ট্যটি এসে পড়ে তাই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য। এই বৈশিষ্ট্যটিকে ভাষায় প্রকাশ করাই সাহিত্যিকের কাজ।

বহির্জগতের রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদি সহৃদয় ব্যক্তির অন্তরে নিরন্তর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে তার থেকে যে কী রহস্যময় উপায়ে সাহিত্য জন্মলাভ করে তা বোঝাতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—

নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিন রাত।
সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা ;
বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চির জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা ;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে' তুলি মানসী প্রতিমা।

সাহিত্যের সৃষ্টি-রহস্য এমন অল্প-কথায় সুন্দর ও সার্থকভাবে আর কোনো কবি বোঝাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু সহৃদয় ব্যক্তির অন্তরে সৃষ্ট যে অভিনব জগৎ, যা বিধাতৃ-সৃষ্ট জগতের মতোই অসীম তাকে মানুষ সসীম রূপে ফুটিয়ে তুলবে কী উপায়ে? কী করে' এ জগৎ স্থায়ী আকারে মানুষের উপলব্ধির বিষয় হতে পারে? এ সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যেই সাহিত্য-শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক।

আমরা নানা প্রয়োজনের তাগিদে যে কথাবার্তা বলি বা ভাষার প্রয়োগ করি তা নানা তথ্যের প্রকাশক, সেই জন্যেই তার মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, তা নিতান্ত সাদাসিধে। তথ্য-বিশেষের প্রকাশ হলেই তার কাজ ফুরোয় এজন্যে যে ভাষায় শোভা সৌন্দর্যাদির আড়ম্বর অনাবশ্যক ; কিন্তু যে ভাষায় মানুষের

অন্তরের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে হয় তার রূপ এমন সাদাসিধে হলে চলে না, কারণ আন্তরিক অনুভূতির মতো এমন অন্তরঙ্গ ও রহস্যময় পদার্থ আর কিছুই নেই। এ হচ্ছে প্রাণের স্বাভাবিক লীলার সঙ্গে একান্ত অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত। এর মধ্যে এমন অসীমতা ও অনির্বচনীয়তা আছে যে তাকে তথ্য-বিশেষের মতো সোজাসুজি প্রকাশ করা চলে না। সেই জন্যেই সাহিত্যিক আপন অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করবার জন্যে উপমা রূপক আদি অলংকারের, শব্দ-গত সুষমা ও ছন্দ-পরিপাট্যাদির সাহায্য নেন। এ সকলের যথাযোগ্য সমাবেশের দ্বারাই তাঁর অনুভূতিটি শ্রোতার বা পাঠকের নিকট ব্যঞ্জনা লাভ করে বা তাঁর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।

ভাষার সাহায্যে ভাষার অতীত পদার্থকে শ্রোতার বা পাঠকের অন্তরে সঞ্চারিত করবার জন্যে সাহিত্য-স্রষ্টা ভাষার মধ্যে যে দুটি জিনিষ মিলিয়ে থাকেন তা হচ্ছে গান ও ছবি। শব্দ-সুষমা ও ছন্দ মিল আদি হচ্ছে সাহিত্যের গানের দিক, আর ছবির দিক হচ্ছে উপমা রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহারে। উভয়ের যথাযোগ্য ব্যবহার করে' সাহিত্যিক যে বিশেষ ভাষা প্রয়োগ করেন তার সাহায্যে তাঁর অনুভূতি গীতিকাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, গল্প উপন্যাস প্রভৃতি নানা রূপ নিয়ে প্রকাশ লাভ করে। তাই সাহিত্য-শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা বহুল ভাবে এদেরই গঠন-কৌশলের আলোচনা।

(খ) সাহিত্যের রূপ ও সাহিত্যবোধ

একটি প্রবাদ চলিত আছে, যিনি কবি তিনি জন্ম থেকেই কবি, গড়ে' পিটে কাউকে কবি ক'রে তোলা যায় না। যথার্থ প্রতিভা নিয়ে যিনি জন্মগ্রহণ করেন, সাহিত্য সৃষ্টিতে সাফল্যলাভ ঘটে কেবল তাঁরই; আর তেমন দুর্লভ ক্ষমতা নিয়ে যিনি জন্মান নি তাঁর পক্ষে লিখতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। উক্তিটি খুব সত্য হ'লেও সাহিত্য রচনায় উৎসাহীর দল যে দ'মে যাবেন তা নয়, গদ্যে পদ্যে তাঁদের বিচিত্র রচনাচর্চা চলতেই থাকবে। কারণ, শিল্পের কোনো বিভাগেই খুব ঘন ঘন আবির্ভূত হন না সে সকল কৃতী ব্যক্তি- যাঁদের মৌলিক রচনা ইতিহাসের উপর সুস্পষ্ট প্রভাবের চিহ্ন এঁকে চলে। কিন্তু জনসাধারণের রসপিপাসা যে কেবল শ্রেষ্ঠ শিল্পীর রচনা নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে থাকবে তা সম্ভবপর নয়। কি সৌন্দর্যসৃষ্টি কি সৌন্দর্য উপভোগ, দুয়ের বেলাতেই বৈচিত্র্যের নীতি অপরিহার্য। মানবপ্রকৃতি স্বভাবতই পরিবর্তন ভালোবাসে। তাই, এমন একদল লোকের প্রয়োজন, যাঁরা

সর্বোচ্চ শ্রেণীর সৌন্দর্য-সৃষ্টি না করতে পারলেও, অন্তত সাময়িক ভাবে মানুষের অন্তর্নিহিত শিল্পস্পৃহাকে সন্তুষ্ট করবার মতো কিছু দিতে পারেন। এঁদের সৃষ্টিতে যে-রস, যে-মনোহারিত্ব সহজে মেলে, তাতে হয়ত মৌলিকতার মাত্রা নগণ্য, কিন্তু গঠনকলার সুষমা নিয়ে তাঁদের রচনা সাধারণ মানুষের রসস্পৃহাকে তৃপ্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট। মাঝারি যোগ্যতাবিশিষ্ট ব্যক্তিরাই শিল্পের আবহমান ধারাকে (tradition) আশ্রয় দিয়ে যুগ থেকে যুগান্তরে পৌঁছে দেন, যে পর্যন্ত না কোনো প্রতিভাবান্ স্রষ্টার ঘটে পুনরাবির্ভাব। তখনি সেই শিল্পধারা আবার তার গতিভঙ্গী বদল করে। সে প্রতিভাবান্ ব্যক্তির জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে আবার দরকার হয় তাঁদের, যাঁরা অপেক্ষাকৃত স্বল্প ক্ষমতা নিয়ে শিল্পধারার গতি অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

শিল্পসৃষ্টির নিয়মকানুন নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন এ শ্রেণীর শিল্পীদের কথাই মনে পড়ে সকলের আগে। যে-সব শিল্পীর কাজে প্রতিভার স্পর্শ খুব সুলভ নয় তাঁদের বিচারের বেলায় গঠনকৌশলের দিকে দৃষ্টি পড়াই স্বাভাবিক। কারণ এঁরা নিজেরাও প্রায়শ গঠনকলার দিকেই দৃষ্টি দিয়ে থাকেন বেশি। অপর পক্ষে, যথার্থ প্রতিভাবান শিল্পীর যে মৌলিক সৃষ্টি, সে ওঠে 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'। তার সুষমা ও সৌন্দর্যকে হঠাৎ দেখে একান্ত অপূর্ব ব'লে মনে হয়। কোনো গঠনগত (technical) নিয়মকানুন দিয়ে এ অপূর্বতার আবির্ভাবকে নিঃশেষে বুঝে নেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তা সত্ত্বেও এরূপ বুঝবার চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল না হতে পারে। কারণ, সাহিত্যের রূপটি নজরে পড়ে তার বিষয়বস্তুর আগে। কী বলা হচ্ছে তা ভালো ক'রে জানবার আগেই জানা যায় কেমন করে বলা হচ্ছে। এ বলার ভঙ্গীটি যদি পাঠককে আকর্ষণ করে তবেই শেষ পর্যন্ত তিনি মনোযোগ দিয়ে উক্ত বিষয়ের রস গ্রহণ করতে প্রস্তুত হন। কাজেই কোনো রচনাকে বিচার করতে হ'লে আগেই দেখতে হবে তার বাহ্য রূপ। এদিক দিয়ে সাহিত্যশিল্পের গঠনকৌশল সম্বন্ধে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কেবল সাহিত্য বুঝবার জন্যে নয়, রচনা করবার জন্যেও গঠন-কৌশলের (technique) জ্ঞান অপরিহার্য। এমন কি, মৌলিক সৃষ্টি করবার মতো ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁদেরও এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কারণ, দেখা গিয়েছে যে, অনেক খ্যাতনামা লেখকেরও রচনায়, এদিক দিয়ে ত্রুটিবিচ্যুতি আবিষ্কার করা সম্ভবপর।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, সাহিত্যের বিষয়বস্তু বড়ো, না তার বাহ্যরূপ বড়ো। এ একটি বেশ শক্ত প্রশ্ন। প্রাচীন ভারতের সমালোচকেরা কাব্যের

লক্ষণাদি নিয়ে বহু বাদানুবাদ করে গেছেন, এবং বহু তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে যাঁরা সোজাসুজি বা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন যে, রচনার বাহ্যরূপটিই বড়ো, তাঁরাই হলেন দলে ভারী। কিন্তু শিল্প বা সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে মতবাহুল্য (majority opinion) চালাতে গেলে বিপদের আশঙ্কা আছে। তাই প্রাচীনদের মতটিকে একবার পরখ ক'রে নেওয়ার দরকার। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়, বক্তব্য বিষয় ও বলবার ভঙ্গী এ দুয়ের মধ্যে বিষয়বস্তুরই প্রাধান্য; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যাপার তা নয়। এ যেন দেহ ও প্রাণের সম্পর্কের মতো। বিষয়বস্তু হ'ল রচনার দেহ, আর ভঙ্গীটি তার প্রাণ। বুদ্ধির সাহায্যে লোকের মনে গৃহীত হ'লেই বিষয়বস্তুর কাজ ফুরিয়ে গেল, কিন্তু তার বিশেষ প্রকাশভঙ্গীটি আমাদের চিত্তে যে-ভাবাবেগ সৃষ্টি করে তা মানবের জীবনলীলার মতোই রহস্যময় ও গতিশীল; এ রহস্যময়তা ও গতিশীলতার দ্বারাই সহৃদয় পাঠকের অন্তর রসার্দ্র হয়ে ওঠে। এখানেই সাহিত্যের পরম ও চরম সার্থকতা।

এ কথাগুলিকে দৃষ্টান্ত দিয়ে একটু পরিষ্কার ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক্। রূপ রস ও বর্ণগন্ধের মাদকতা নিয়ে বসন্তকাল যখন হঠাৎ এসে নিখিল যুবজনের চিত্তে প্রবল আবেগ সৃষ্টি করে, তখন তাদের মনে হয় যে, আজ সকল বাধা বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে জীবনকে ভালো করে' উপভোগ করা যাক্। এ ধরণের ভাবটিকে প্রকাশ করতে গিয়েই হয়ত বিদ্যাপতি লিখেছিলেন :

"সরস বসন্ত সময় ভল পাওল
দছিন পবন বহ ধীরে।
সপনহুঁ রূপ বচন এক ভাখিএ
মুখ সেঁ দূরি করু চীরে।"

[সরস বসন্ত সময় এসেছে, মলয়পবন ধীরে বইছে; এমন সময় স্বপ্নের মতো এক বাণী বলছে; (হে তরুণি,) তোমার মুখের ঘোমটা খোলো।]

রসপিপাসু মানবচিত্তকে তরুণীরূপে এবং নানা সংস্কারবন্ধনকে তার সুন্দর মুখের অবগুণ্ঠনরূপে কল্পনা ক'রে অনবদ্য ভাষায় ও ছন্দে বিদ্যাপতি যা বলেছেন, তা শ্রোতার চিত্তপ্রবাহে যে চাঞ্চল্য ও ভাবাতিশয্যের সৃষ্টি করে, শুধু নিরলংকার গদ্যে বক্তব্য বিষয়টি বললে কি সে রকমটি ঘটতে পারত? কখনই নয়। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, বিষয়বস্তুর চেয়ে রচনাভঙ্গী শ্রেষ্ঠ। বলবার ভঙ্গীটির গুরুত্ব এত বেশি যে, তার বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিষয় বস্তুটির রসদানের ক্ষমতা আশ্চর্যজনকরূপে বেড়ে যেতে পারে; যেমন, পূর্বোল্লিখিত ভাবটি প্রকাশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,
এই সঙ্গীতমুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
* * *
অতি নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে,—
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে।"
* * *

বিদ্যাপতির গীতাংশটির যা বক্তব্য বিষয় উল্লিখিত গানটির বিষয়বস্তু প্রায় তাই হ'লেও এর ভাষায় ও ছন্দে সেটি এমন এক বিচিত্র রূপ গ্রহণ করেছে যার তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার।

অতএব দেখা গেল যে, সাহিত্যে বাহ্য রূপটির মূল্যই সমধিক। এই রূপের বৈচিত্র্য দ্বারাই সাহিত্যিক নিজের চিত্তসঞ্জাত ভাবকে পাঠক বা শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করে থাকেন।

শিল্পের ইতিহাসই হচ্ছে নূতন নূতন প্রকাশপদ্ধতির আবিষ্কার এবং প্রচারের কাহিনী। একই ভাবের প্রেরণা বিবিধ এবং বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কোনো বিশেষ রকম প্রকাশের রাস্তা সে একান্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারেনি। তাই কালে কালে বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রকাশের ভঙ্গী গ'ড়ে উঠল। প্রত্যেক শিল্পই নিজকে নিবেদন করে তার আপন প্রকাশ ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে; কিন্তু প্রত্যেকেরই লক্ষ্য হচ্ছে প্রয়োজনের সীমার বাইরে এমন কিছু সৃষ্টি করার দিকে, যা তার প্রাণীসুলভ অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য নয়, অথচ যা অন্তর্লোকে এক অনির্বচনীয় তৃপ্তির আস্বাদ এনে দিতে পারে। নিরাবরণ ও নিরাভরণ ভাষা, অন্তত আপেক্ষিক বৈচিত্র্যহীন রচনা মানুষকে কদাচিৎ এমন দুর্লভ সম্পৎ দান করতে সক্ষম। অতএব সাহিত্যশিল্প সম্বন্ধীয় আলোচনায় সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে হবে এর রচনাভঙ্গী ও রচনাকৌশলের উপর।

সাহিত্যবোধের জন্যে রচনাভঙ্গীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া অত্যাবশ্যক হলেও তার মানে এ নয় যে, শুধু এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেই সাহিত্যবোধ সম্পূর্ণ

হতে পারে। সাহিত্যেকে বুঝবার জন্যে অন্য গভীরতর চেষ্টার প্রয়োজন আছে। মানবজীবন ও তৎসম্পর্কিত সব কিছুই সাহিত্যের বিষয় হ'তে পারে; জীবনের সমগ্র প্রসার গভীরতা ও বৈচিত্র্যকে পরিব্যাপ্ত ক'রে আছে সাহিত্য। সকল অবস্থার সকল কালের মানুষের অভিজ্ঞতা ভাষা পেয়েছে এ সাহিত্যের ভিতর দিয়ে। মানুষ যা দেখেছে, অনুভব করেছে, কল্পনা করেছে, জেনেছে,— যে সম্বন্ধে তার আশা, নৈরাশ্য, ভালোবাসা সে-সমস্তই সাহিত্যের বিষয়। সাহিত্যকে বুঝতে হলে এ সকলের দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। কিন্তু এও খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। জীবনের রহস্যভেদ শুধু জীবন দিয়েই করা যায়, কোনো বইএর বা অন্য কারুর উপদেশে নয়। উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য বুঝতে হ'লে ও উপভোগ করতে হ'লে চাই জীবনের অজস্র প্রসার, অফুরন্ত অভিজ্ঞতা এবং সে সঙ্গে পর্যাপ্ত কল্পনাশক্তি। কিন্তু এ সব হঠাৎ হবার নয়, এজন্যে চাই দীর্ঘকালব্যাপী সাধনা। তবে যিনি সাহিত্যের বাহ্য রূপটিকে আয়ত্ত করেছেন তাঁর পক্ষে এ সাধনা অনেকটা সহজ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তিনি অল্পায়াসেই বুঝতে পারেন যে, রচনাভঙ্গী সাহিত্যের প্রাণ হ'লেও রচয়িতার সঙ্গে সে প্রাণের রয়েছে এক অচ্ছেদ্য যোগ। যদিও বোঝাবার জন্যে সাহিত্যিক রচনাভঙ্গীর বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, তবু শুধু বিশ্লেষণের দ্বারা কোনো রচনার মূল উৎসটি আবিষ্কৃত হয় না। এ উৎস হ'ল সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব। এ ব্যক্তিত্বের মুদ্রাঙ্কন থাকে প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনায়; আর তার থেকেই বোঝা যায় অন্য লেখকের সঙ্গে তাঁর লেখার প্রভেদ। মানুষ তার সর্বোত্তম প্রেরণা থেকে যা লেখে বা যে কোনো শিল্প রচনা করে তারি মধ্যে সে নিজেকে ধরা দেয়। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' তাঁর প্রতিভাময় অথচ চাঞ্চল্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতিবিম্ব মাত্র। আর রবীন্দ্রনাথের নানাবিধ গদ্য পদ্য রচনায় দেখতে পাই তাঁর সুদৃঢ় অথচ শান্তসুন্দর সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্বকে। যে-সব রচনা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পৎ হবার যোগ্য বলে' বিবেচিত হয়েছে সে-সকলের যথাযোগ্য আলোচনা করলেই রচনার রূপ ও রচয়িতার ব্যক্তিত্বের সম্পর্কটি ভালো ক'রে বোঝা যেতে পারে, এবং এটি বুঝতে পারলেই সাহিত্যের মূল্যনির্ধারণ ও সাহিত্য-উপভোগ এ দুইই কিয়দংশে সুসাধ্য হ'য়ে আসে।

(গ) সাহিত্যের বিষয় ও সাহিত্যরূপ

বিশুদ্ধ তত্ত্বকল্পনার (theory) দিক থেকে বলতে গেলে, জগতের যে কোনো ভাব যে কোনো বস্তু অথবা যে কোনো কাল্পনিক পদার্থ সাহিত্যের বিষয় হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও একজন সাহিত্যিকের এমন কি বিশেষ শক্তিশালী ও প্রতিভাবান সাহিত্যস্রষ্টার রচনায়ও কেবলমাত্র স্বল্পসংখ্যক ভাব ও বস্তুর সন্ধান মেলে; আর কোনও দেশের বা জাতির সমগ্র সাহিত্যের আলোচনা কালেও দেখা যায় যে, সে সাহিত্যেরও বিষয়বস্তু কোনো কোনো দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ। যেমন, যে স্বদেশপ্রেম বর্তমান কালের সাহিত্যে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, প্রাচীন সাহিত্যে তা পাওয়া যায় না; আর যে দরিদ্র ও নির্যাতিতের প্রতি দরদ সাহিত্যে প্রতিফলিত দেখবার জন্যে আজকাল আমরা উৎসুক হচ্ছি তা আধুনিক যুগের গোড়ার দিকের সাহিত্যে একেবারে অনুপস্থিত। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সাহিত্যিক তার বিষয়বস্তুকে বাছাই করে নেন। এই বাছাইএর ব্যাপারে তাঁর নিজের সংস্কার শিক্ষা দীক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে তাঁকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করে' থাকে তা বলাই বাহুল্য। অতএব সাহিত্যের রূপ সম্বন্ধে নানা দিক থেকে নানা আলোচনা সম্ভবপর হলেও সাহিত্যের বিষয় সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বিচার বেশীদূর পর্য্যন্ত চলতে পারে না। কোন্ বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচিত হবে বা হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে সাহিত্যিকের বিবেচনাই চরম প্রমাণ। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, যিনি যে কোনো বিষয় সম্বন্ধেই লিখুন তাই সাহিত্য বলে' গণ্য হবে। এখানে বলা উচিত যে, রচনাভঙ্গীই হ'ল সাহিত্যের প্রাণ। কাজেই, বলবার ভঙ্গীর মধ্যে যদি কোনো চমৎকারিত্ব না থাকে তবে কোনো রচনাকেই সাহিত্য বলে' মেনে নেওয়া দুঃসাধ্য।

সাধারণ গদ্যপদ্য রচনা থেকে দুরকম জিনিষ পাওয়া যেতে পারে। এক তথ্য বা তত্ত্ব যা জ্ঞানের বিষয়, আর হৃদয়-বৃত্তির ব্যাপার যা অনুভব করবার জিনিষ। যা কেবল জ্ঞানের বিষয়, জানা হওয়া মাত্রই তার কাজ ফুরোয়; স্মৃতি তাকে বহন করে' কোনো বিশেষ আনন্দ পায় না। কিন্তু হৃদয় বৃত্তির ব্যাপার সম্বন্ধে যে জ্ঞান তা সহৃদয় ব্যক্তিকে অপূর্ব আনন্দ দেয় এবং সে আনন্দের স্মৃতিও আনন্দজনক। এ আনন্দের অনুভূতিরও স্মৃতি যখন কারো মধ্যে কাজ করতে থাকে তখন তার কল্পনা ভাবনা এক বিস্ময়কর রঙে রেখায় বিচিত্র হয়ে ওঠে। তারই ফলে ঘটে রসস্ফূর্তি বা রসের উপভোগ। কাজেই আলোচ্য বিষয়ের দিক্ থেকে দেখ্‌তে গেলে, যে রচনার আবেদন (appeal) পাঠকের হৃদয়বৃত্তির

কাছে—বুদ্ধিবৃত্তির কাছে নয়—তাই হ'ল সাহিত্য। এজন্যে, কোনো ভাব বা বস্তু সাহিত্যের বিষয় হতে পারে কি না সে কথা বিচারের বেলায় দেখতে হবে যে তাকে অনুভবের বিষয় করে' তোলা যায় কি না। কিন্তু এরূপ প্রশ্ন করার অর্থ এই হতে পারে যে, আমরা ধরে' নিচ্ছি সব ভাব বা বস্তুকে অনুভবের বিষয় করে' তোলা যায় না। বাস্তবিক সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের এই মনে হয় যে, যা কিছু জ্ঞানের বিষয় তাকে ভাবের বিষয় করে' তোলা যায় না। কিন্তু এ বিষয় আপাতদৃষ্টিতে দুঃসাধ্য মনে হলেও হয়ত অসাধ্য নয়। কারণ প্রাচীন ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞানের উপলক্ষ্যে বেদান্তসূত্রাদি দর্শনশাস্ত্রে রচনা করে' ব্রহ্মকে জ্ঞানগম্য করবার চেষ্টা করেছেন। তাতে নানা শুষ্ক তর্ক ও কথার কাটাকাটি কিছু কম নেই। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তাঁরা কখনো কখনো সাহিত্যিক পদ্ধতিরও শরণাপন্ন হয়েছেন। তাই উপনিষদে 'কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা' (কিরূপে তাঁকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানব ? তিনি কি দীপ্তি পান ?) এর উত্তরে বলা হচ্ছে—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

তাঁর কাছে সূর্য দীপ্তি পায় না, চন্দ্র তারাও না। বিদ্যুৎও দীপ্তি পায় না, আর অগ্নি কোথা থেকেই বা দীপ্তি পাবে ? তাঁর দীপ্তি আছে বলে' সে দীপ্তির সহায়ে এরা সকলে দীপ্তি পাচ্ছে। আর তাঁর দীপ্তিতেই সকলে বিশেষভাবে দীপ্যমান।

উপনিষদের ঋষি এমনি করে জ্ঞানের বিষয়কে অনুভূতির বিষয় করে' তুলেছেন। কিন্তু এরূপ করা সকলের পক্ষে সহজ নয়। যাঁদের প্রাক্তন সংস্কার ও সাধনা বিশেষ উচ্চ শ্রেণীর তাঁরাই জ্ঞানের বিষয়কে এমনভাবে রসদায়ক করে' তুলতে পারেন। কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে প্রাক্তন সংস্কার ও সাধনার কথার আলোচনা এখানে করা অপ্রাসঙ্গিক হবে। শুধু এটুকুই এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে, কেবল বলবার ভঙ্গী বদল করলেই জ্ঞানের বিষয় অনুভূতির বিষয় হয়ে দাঁড়াতে পারে। ব্রহ্ম স্বয়ং-প্রকাশ ও তাঁর দীপ্তিতে সকলে দীপ্যমান ; একথাটি উপনিষদের ঋষি এমন করে' বলেছেন যে, কেউ ব্রহ্মকে মানুন আর নাই মানুন, তিনি সহৃদয় হলে এই ব্রহ্মের বর্ণনা তাঁকে কল্পনায় এক অপূর্ব জ্যোতির্ময় রূপ দর্শনের আনন্দ দান করবে। কোনো রচনা যদি শ্রোতার বা পাঠকের হৃদয়বৃত্তিকে উদ্বোধিত করবার মতো হয় তবেই তার দ্বারা স্ফূর্তি হয় রসের। সাধারণ কাব্য তথা সাহিত্যকে রসাত্মক বাক্য বলা হলেও সাহিত্যের আর একটি দিক আছে। সে হচ্ছে তার রূপের দিক

এই রূপ, রসের মতো একটা গূঢ় বস্তু নয়, একে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। কাব্যে আখ্যানে যে নানা পাত্রপাত্রীর চরিত্র আঁকা হয় সে সব ছবি বেশ স্পষ্টত দৃশ্যমান। সাহিত্যিক রসানুভবের সাহায্য করে বলেই যে কেবল তাদের দাম তা নয়। তাদের দেখে আমাদের হৃদয়ে যে চমৎকৃতির ভাব উদ্রিক্ত হয় তাও রসানুভবের সমগোত্রীয়।

অতএব সাহিত্যের কারবার হ'ল দু রকম বিষয় সৃষ্টি করা; এক রূপ আর এক রস। এ দুই বস্তু আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করলেও আমাদের অনুভূতিকে ব্যাপ্ত করলেও, এদের সৃষ্টি ব্যাপারে সাহিত্যিককে দুই বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। রসের সৃষ্টির বেলায় ছন্দ, সুর, অলংকার আদি নানা উপকরণের সাহায্য নিতে হয় একটু বেশী পরিমাণে। কখনো কখনো এজন্যে বাস্তবকে উপেক্ষা করে' কল্পনাকে অসীমের দিকে প্রসারিত করতে হয়। কিন্তু শুধু রূপ সৃষ্টির বেলায় সাহিত্যিকের এমন স্বাধীনতা নেই। তাকে সব সময়েই বাস্তবের সঙ্গে রফা ক'রে চলতে হয়। বাস্তবকে উপেক্ষা করে আঁকলে সে চিত্র উপভোগ্য হয় না। যা একান্ত বাস্তব তাকে নিখুঁতভাবে এঁকে গেলেও শিল্পসম্মত চিত্র আঁকা হয় না; কিন্তু এ বিষয়ে যথার্থ মাত্রাজ্ঞানই হল সাহিত্যিক প্রতিভার অন্যতম লক্ষণ। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সাহিত্যের বিষয় যাই হোক না কেন, সাহিত্যিক হৃদয়াবেগকেই ভাষায় ফুটিয়ে তুলুন আর লোকচরিত্রই আঁকুন তার বক্তব্য বিষয়কে সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে তাঁর বলবার ভঙ্গী। এজন্যেই সাহিত্যের ভাষার একটা বিশেষ রূপ দাঁড়াচ্ছে এবং রূপের ভিতর দিয়ে হতে পারে সাহিত্যের সত্যিকারের পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাব্যের নানা অঙ্গ

'সাহিত্য' কথাটির মূলগত অর্থ নিয়ে যতই মতভেদ থাক না কেন, আস্বাদন বা রসগ্রহণের কাল থেকেই অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হবে এর স্বরূপ। তখনি জানা যাবে যে, কোনো রচনায় রসের সম্ভাবনা থাকলেই কেবল তাকে সাহিত্য আখ্যা দেওয়া চলে; অর্থাৎ সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে যাকে 'কাব্য' বলা হয়েছে সাহিত্যও ঠিক তাই। অতএব কাব্যের লক্ষণ থেকেই সাহিত্যের লক্ষণও নির্ণীত হতে পারে। আলংকারিক বলেছেন, যাতে রস প্রধানভাবে বর্তমান এমন বাক্যই হ'ল

গিয়ে কাব্য। অবশ্য বাক্য অর্থে এখানে বাক্য সমষ্টিকেও বোঝাবে। রসাত্মক বাক্যেই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। একথা মেনে নিলে, সঙ্গে সঙ্গে এও মানতে হবে, যে-কোনো বাক্যেই রস পাওয়া যায় না। রস যে, বাক্যমাত্রেই সুলভ নয় তার একটা প্রধান কারণ, বাক্যে রস সঞ্চার করবার কৌশলটি সকলের জানা নেই। এ কৌশলটি কী, সাহিত্যরূপের আলোচনা প্রসঙ্গে তাই সর্বাগ্রে, এবং বোধ হয় সর্বপ্রধান জিজ্ঞাস্য।

কথা সকলেই বলতে পারেন এবং হয়ত যে কোনো বিষয় নিয়েই বলতে পারেন, কিন্তু কথা দিয়ে শ্রোতার চিত্তকে সরস করে' তুলতে হলে চাই এক বিশেষ ক্ষমতা। এ ক্ষমতা সাহিত্যিকেরও যথাযোগ্য পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাক্‌পটু ব্যক্তি এবং সাহিত্যিক এ উভয়ের মধ্যে ক্ষমতার ঐক্য থাক্‌লেও উভয়ের প্রকাশ-পদ্ধতির মধ্যে স্বাভাবিক কারণে একটা পার্থক্য থাকতে বাধ্য। কারণ, মুখের কথাকে সরস ও হৃদয়গ্রাহী করবার জন্যে কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য এবং অঙ্গ-ভঙ্গীর সাহায্যও নেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু লেখার বেলায় সে সুবিধা পাওয়া সম্ভবপর নয়। তাই লেখার ভিতর দিয়ে কোনো কিছু প্রকাশ করতে গেলে সেখানে ভাষাগত অসম্পূর্ণতা থেকে যেতে পারে। সে জন্যে এমন করে লিখতে হবে যাতে পাঠক তা পড়ে' নিতান্ত অল্পায়াসে বক্তব্য বিষয়টি বুঝতে পারেন। লিখিত রচনায় ভাষাগত অসম্পূর্ণতা নানা আকারে দেখা দিতে পারে; যেমন, শব্দপ্রয়োগের ত্রুটি, তর্কবিধির (logic) উপেক্ষা, বিষয়-বিন্যাসের বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি। এ সকল দোষ এড়িয়ে সাহিত্যিক যে রচনা করেন তার ভাষায় ক্রমশ একটা বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়ে যায়। এ বৈশিষ্ট্য আরো পাকা হয় এ কারণে যে, সাহিত্যিকের রচনার মূল উদ্দেশ্য তাঁর অনুভূতিকে শ্রোতার বা পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করা। তিনি যা অনুভব করেন, কল্পনা করেন শ্রোতার বা পাঠকের হৃদয়ে তদনুরূপ অনুভূতি বা কল্পনা, জাগ্রত করাই হচ্ছে তাঁর কাজ। এ সকল উদ্দেশ্য সামনে থাকায় সাহিত্যিককে বেছে কথা বলতে হয়, আর তাতে আবেগ ও ধ্বনিমাধুর্য সঞ্চার করতে হয় এবং কখনো কখনো তাতে দেখা দেয় অর্থগত নানা কারুকার্য। এ সকল কারণে সাহিত্যের ভাষা স্বভাবতই মুখের কথার চেয়ে বিস্তৃত ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে থাকে।

সাহিত্যের বাহ্যরূপ নিয়ে আলোচনার বেলায় সকলের আগে দৃষ্টি দিতে হবে ভাষাগত এই বৈশিষ্ট্যটির প্রতি। যখন আমরা কথাবার্তা বলি তখন যে কেবল বাক্যের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন উপবাক্য (clause) বা শব্দগুলিকে যেমন তেমন করে সাজিয়ে থাকি তা নয়, শব্দগুলির নির্বাচনেও তেমন সতর্কতা দেখানো

প্রয়োজন মনে করি। **শব্দ নির্বাচনে সতর্কতা** সাহিত্যিক ভাষায় বৈশিষ্ট্যের অন্যতম কারণ। এ কথাটা একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে পরিষ্কার করা যাক্। যেমন কোনো গল্পের আরম্ভে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—

"ফাল্গুনের প্রথম পূর্ণিমায় আম্রমুকুলের গন্ধ লইয়া নব বসন্তের বাতাস বহিতেছে। পুষ্করিণীর তীরের একটি পুরাতন লিচু গাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে একটি নিদ্রাহীন অশ্রান্ত পাপিয়ার গান মুখুয্যেদের বাড়ির একটি নিদ্রাহীন শয়নগৃহের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিতেছে" ইত্যাদি—

নির্বিচারে শব্দ বদল করে উল্লিখিত স্থলটিকে নিম্নলিখিত রূপও দেওয়া যেতে পারে :—

ফাল্গুনের পয়লা পূর্ণিমায় আমের বোলের ঘ্রাণ লইয়া নয়া বসন্তের হাওয়া বহিতেছে। পুকুরের তীরের একটি পুরাতন লিচু বৃক্ষের ঘন পল্লবের মাঝ হইতে একটি ঘুমহীন অশ্রান্ত পাপিয়ার গান মুখোপাধ্যায়দের বাড়ির একখানা নিদ্রাহীন শোবার গৃহের মধ্যে গিয়া পশিতেছে, ইত্যাদি—

এ লেখা থেকে বক্তব্য বিষয়টি বুঝে নেওয়া যে কষ্টকর তা নয়, তবে এরকম লেখার ফলে উদ্ধৃতাংশের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষভাবে কমে যাচ্ছে। মনে হয়, সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের বিশৃঙ্খল সমাবেশের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বক্তব্য বিষয় হোঁচট খেতে খেতে চলেছে।

মাতৃভাষায় সমস্ত শব্দসম্পৎ রয়েছে সাহিত্যিকের ব্যবহারের অপেক্ষায়। এর মধ্য থেকে নিজের ইপ্সিত অর্থটি প্রকাশ করবার মতো কথা বেছে নেওয়া খুব শক্ত নয়, কিন্তু যথার্থ সহিত্যিকের বিশেষত্ব এই খানে যে, তিনি এমনভাবে তাঁর শব্দগুলি নির্বাচন করেন, তাতে কেবল অভিপ্রেত অর্থটিই বোঝায় না পরন্তু যে পরিবেশের মধ্যে ফেলে' পাঠককে তার অর্থটি গ্রহণ করতে হবে তাও অনায়াসে ব্যঞ্জনালাভ করে। ইতিহাসের সুপ্রাচীন আরম্ভকাল থেকে যে নানা বিচিত্র জাতি ধর্মের লোক এসে বসবাস করেছে তার দ্বারা ভারতবর্ষ বিশ্বমানবের মিলনের ক্ষেত্র হওয়ার গৌরব লাভ করেছে ; এ কথাটি সাহিত্যিক ভঙ্গীতে বলবার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে শব্দ চয়ন করতে হয়েছিল। ভারতের এ বিশ্বদুর্লভ প্রশান্ত গম্ভীর মহিমাকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :—

হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে
জাগরে ধীরে।
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।

ভারতের আপাতদৃশ্য এক বৈচিত্র্য ও বিভেদের মধ্যে বিদ্যমান দুর্লভ মহিমা ও

প্রশংসনীয়তা যে, শ্রোতার চিত্তে এমন রসের স্পর্শ দিতে পারে এ কবিতাটি প্রকাশ হওয়ার আগে কে এত সহজভাবে অনুভব করতে পারত ?

চিন্তা ও অনুভূতির প্রতীকস্বরূপ শব্দগুলিকে বক্তব্য বিষয়ের সম্পর্কে যথাযথভাবে অন্বিত করবার ক্ষমতার উপরেই সাহিত্যিকের সামর্থ্য বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। তিনি কী ভাবে সেটি করে' থাকেন তা অনুসন্ধান করলেই সাহিত্যিক রসগ্রহণের প্রথম সূত্রটি সহজে বোঝা যেতে পারে।

উপযুক্ত **বিশেষণের প্রয়োগ** হ'ল রচনার ভাষাকে সুস্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী করবার এক প্রধান উপায়। বর্ণিত ব্যক্তি বা বস্তুর বাহ্যিক রূপ বা অন্তর্নিহিত ভাবকে যে-কথার দ্বারা সুস্পষ্ট করে তোলা যায় তারই নাম বিশেষণ। উপযুক্ত বিশেষণের প্রয়োগ কোনো বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনাকে চিত্রলিখিতবৎ স্পষ্ট দর্শনযোগ্য করে' তুলতে পারে। বিশেষণ তার সংশ্লিষ্ট শব্দগুলিকে এমন আভা, এমন বর্ণ দান করে যার ফলে সমগ্র ছত্র বা সমগ্র বাক্য মনশ্চক্ষুর সামনে এনে দেয় এক সুস্পষ্ট ছবি। বিশেষণের একটি নিপুণ প্রয়োগ থেকে যুগপৎ অনেক ছবির কল্পনা মনোমধ্যে উপস্থিত হয়।

জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।

এখানে একটি সুন্দর বিশেষণের (কানে-কানে) দ্বারা রাজকীয় প্রণয়ী যুগলের আত্ম-বিস্মৃত প্রণয়লীলার যে অপরূপ দৃশ্যরাজী পাঠকের মানস নয়নের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার।

হারিয়ে গেছে কচি সে মুখখানি
দুধে ধোয়া কচি দাঁতের হাসি। (সত্যেন্‌ দত্ত)

'কচি' ও 'দুধে ধোয়া' এই বিশেষণ দুটির প্রয়োগেও নিতান্ত শৈশবের স্নেহার্দ্র কোমলতা বেশ সহজভাবে ফুটে' উঠেছে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত থেকে জানা যায় যে উত্তম বিশেষণের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে বাহুল্য-হীনতা বা সরলতা। কোনে বিশেষণে জটিলতা থাকলে, বা তা কষ্টকল্পিত হলে সে বিশেষণের শক্তিহানি ঘটে। শোনামাত্রেই যদি বিশেষণ হৃদয়কে নাড়া না দেয় বা কল্পনার সামনে ছবি ফুটিয়ে তুলতে না পারে তবে সে বিশেষণের সার্থকতা ঢের কমে'

যায়। এ সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, সম্পূর্ণ নূতন ভাবে ব্যবহৃত বিশেষণ অনেক সময় স্বাভাবিক রসোচ্ছ্বাসের ক্রিয়াকে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত করে, যেমন,

"চঞ্চল পুলকরাশি কোন স্বর্গ হতে ভাসি
নিখিলের মর্মে আসি লাগে,"

"নামিছে নীরব ছায়া ঘন বন শয়নে।"

উদ্ধৃত এ দুটি দৃষ্টান্তে 'চঞ্চল' ও 'নীরব' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করবার মতো। এ রকম বিশেষণের সার্থকতা হঠাৎ বুঝে ওঠা সম্ভব না হতে পারে। এদের শ্রেণীগত নাম হচ্ছে বিপর্যস্ত বিশেষণ (transferred epithet)। বিশেষণ-বিপর্যাস ঘটালে যে অর্থবোধের একটু অসুবিধা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। চির পরিচিত ব্যবহারের ধারাকে পরিত্যাগ করার ফলে প্রথম প্রথম বিশেষণটি একটু শ্রুতিকটু মনে হতে পারে, কিন্তু যদি প্রয়োগের মধ্যে সত্যিকারের সার্থকতা থাকে তবে এ রকম প্রয়োগের ফলে বিশেষ্যের অর্থটি অধিকতর পরিস্ফুট ও মনোরম হয়ে দেখা দেয়।

অবশ্য যে কোনো রকমের অলঙ্কার (figures of speech) ব্যবহারেই এ শ্রেণীর অসুবিধা আছে। অভিনব বস্তুমাত্রেই কিয়ৎ পরিমাণে আশ্চর্যজনক; তাই ব'লে, কিছু নূতন হলেই যে তাতে রসসৃষ্টির বাধা জন্মাবে তা নয়। যেমন,

তুচ্ছ অতি কিছু সে নয়
দু চারি ফোঁটা অশ্রুময়
একটি শুধু শোণিত-রাঙা বেদনা।

এখানে 'শোণিত-রাঙা' শব্দটি বেদনার বিশেষণ হিসাবে একটু নতুন হলেও এর দ্বারা বেদনার মর্মকথা বেশ চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সে যাই হোক, উত্তম বিশেষণের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ হচ্ছে বাহুল্য পরিহার। নিচে এ শ্রেণীর বিশেষণের আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে:—

"অরুণরাঙা আজি এ নিশিশেষে
ধরার মাঝে নূতন কোন দেশে,
* * * *
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা।"

"শিশির-ঝরা কুন্দ ফুলে হাসিয়া কাঁদে নিশা,"

"বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূর ব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া।"

'উল্লিখিত দৃষ্টান্ত-নিচয়ে বিশেষণগুলি এমন সার্থকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যে, সেগুলির বদলে কোনো কথা একেবারেই অচল।

লেখক কখনো অনেকগুলি বিশেষণ, রূপকময় বিশেষণ বা বিশেষণাত্মক বাক্যাংশ ব্যবহার ক'রেও বক্তব্য বিষয়কে সুস্পষ্ট ক'রে থাকেন। যেমন, বহু বিশেষণের প্রয়োগ :

> "যেখানে লয়েছে ধরা
> অনন্তকুমারীব্রত হিমবস্ত্রপরা
> নিঃসঙ্গ নিঃস্পৃহ, সর্ব্ব-আভরণ-হীন"

> "প্রাণভরা, ভাষাহারা, দিশাহারা, সেই আশা নিয়ে
> চেয়ে আছি তোমা পানে।"

রূপকময় বিশেষণের প্রয়োগ :—

> "চাঁদের মুকুটপরা অচঞ্চল রাত্রির প্রতিমা
> রহিল নির্বাক হয়ে পরাভূত ঘুমের আসনে।"

উদ্ধৃত স্থল কয়টিতে ব্যবহৃত বিশেষণগুলির বাহুল্য সত্ত্বেও বক্তব্য বিষয়টি বেশ আবেগময় ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য যথেষ্ট সাহিত্য-বোধহীন ব্যক্তির হাতে বাহুল্য অনেক সময় সৌন্দর্য সৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মাতে পারে।

ভাষাগত সৌন্দর্যের আর একটি উৎস হচ্ছে **শব্দালঙ্কার**। আধুনিক কালের ভাষায় একে বলা যায় ধ্বনি-সম্পৎ। শব্দগুলি যে কেবল অর্থ ও বর্ণেরদ্যোতক তা নয়, তারা ধ্বনিও বটে। কাজেই কবিরা শব্দ নির্বাচনের বেলায় অন্য লেখকদের চেয়ে বেশি পরিমাণে দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। বিদ্যাপতি বা গোবিন্দ-দাসের পদাবলীতে মাইকেলের কবিতার চেয়ে সহজভাবে ও অকৃত্রিমরূপে শ্রুতিমাধুর্য দেখা দিয়েছে কিনা তার আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তাঁদের কবিতায় যে শ্রুতিসুখকরত্ব আছে তা অনায়াসলব্ধই হোক আর প্রযত্নকৃতই হোক, ভালো কবিতা মাত্রকেই বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তাদের মূলে রয়েছে গীতধর্ম। উপস্থিত প্রবন্ধে কাব্যের গীতধর্মী স্বভাবকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা যাচ্ছে। এই গীতধর্মের একটা দিক হচ্ছে স্বর (vowel) সন্নিবেশের পারিপাট্য। যেমন,

> "পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কী সন্ন্যাসী
> বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।"

মদনভস্মের পরে যে আশ্চর্য ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল অর্থাৎ প্রেমের দেবতা নিঃশেষে বিনষ্ট হওয়ার বদলে বিশ্বজগৎময় যে তাঁর সত্তা ছড়িয়ে পড়েছিল, উল্লিখিত

দুটি ছত্রে কবি সে আশ্চর্য্য-সম্ভূত চাঞ্চল্যকে ব্যঞ্জনা দিয়েছেন অংশত ভিন্ন ভিন্ন স্বর বর্ণের (যেমন অ, এ, ইত্যাদি) একাধিকবার আবৃত্তির দ্বারা, আর অংশতঃ ঘন-সন্নিবিষ্ট যতির সাহায্যে। দুয়েকটি ব্যঞ্জনের পুনরাবৃত্তিও অর্থকে পুষ্ট করবার সাহায্য করেছে। এ সকলের পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা দরকার।

কবিতায় গীতধর্ম সঞ্চারের এক প্রধান উপায় ব্যঞ্জন বর্ণের পুনরাবৃত্তি। এর প্রচলিত নাম হচ্ছে অনুপ্রাস। রচনার শ্রুতিমাধুর্যের বেশির ভাগে ঘ'টে থাকে নিপুণ অনুপ্রাস ব্যবহারের ভিতর দিয়ে, যেমন—

"দশদিশ দামিনী দহন-বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন-তার॥" (গোবিন্দ-দাস)
"নীরেন্দ্রপ্রতিম নীল নির্মল আকাশে" (নবীন)
"মোহন নিশীথে মুগ্ধ এ মোর মন
স্বপন পুরীর পথখানি খুঁজে ফিরে," (ঐ)
"শীতল শিথিল শিউলি বোঁটায় সুপ্ত শিশুর ঘুম টলে।" (সত্যেন্দ্র)
"কৌমুলি কুলি করে কোলাকুলি কার সে পতাকা ঘেরি।
কার মৃদু বাণী ছাপাইয়া ওঠে গর্বী গোরার ভেরী॥" (সত্যেন্দ্র)
"চল-চপলার চকিত চরণে করিছে চরণ বিচরণ
কোথা চম্পক আভরণ।"
"হায় রে হৃদয়
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।"

অনুপ্রাস যদি নিয়মিতভাবে যতিকে অনুসরণ করে তবে পাওয়া যায় **অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল** (rhyme)। এই মিল বিশেষভাবে অপভ্রংশ কবিতার দান। সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের গোড়ার দিকের কবিতায় মিল কখনো চোখে পড়ে না। অর্বাচীন কালের সংস্কৃতে যে কখনো কখনো মিলযুক্ত পদ্য পাওয়া যায় তার মূলে রয়েছে অপভ্রংশেরি প্রভাব। প্রাকৃত সম্বন্ধেও ঠিক সে কথাই বলা চলে। সে যাই হোক আমাদের বাংলাভাষীদের কাছে কবিতা মিলের সঙ্গে প্রায় অচ্ছেদ্যভাবেই জড়িত থাকত, যদি মাইকেল এসে বাধা না দিতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা পদ্যে মিলের প্রভাব এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অসংখ্য অনুবর্তীদের কাব্যই হচ্ছে একথার প্রমাণ।

বাংলা কবিতার মিল দুরকমের :—(১) 'সমাক্ষর বা অসমাক্ষর' বা ছত্রের মিল। যেমন :—

"একা যাব বর্দ্ধমানে করিয়া যতন।
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।" (ভারতচন্দ্র)

"যাহার হৃদয়ে শেল সে জানে কেমন,
পরের কেবল মাত্র লৌকিক রোদন।" (নবীন)

"বহুদিন হোলো কোন্ ফাল্গুনে ছিনু আমি তব ভরসায়,
এলে তুমি ঘন বরষায়।"

"কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।"

মিল আবার পরম্পরিত (consecutive) না হয়ে একান্তরিত (alternate) বা একাধিক-অন্তরিতও হতে পারে। যেমন :—

"গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা
ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি ;
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটা সুর
সাতটা যেন পোষা পাখী।"

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে ;
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল চরণে
তুমি চঞ্চল-গামিনী।"

"এ নহে মুখর বন মর্ম্মর গুঞ্জিত
এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ কুসুম রঞ্জিত
ফেন হিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।"

(২) দ্বিতীয় প্রকারের মিল হচ্ছে শ্লোকাদির বা ছত্রের অন্তর্গত পর্বগুলির মিল বা আভ্যন্তরীণ মিল ; এরূপ মিল প্রায়ই কেবল কবিতা স্তবকের মধ্যে বৈচিত্র্য উৎপাদনের জন্যে ঘ'টে থাকে ; তাই কদাচিৎ একে নিয়মিতভাবে পাওয়া যায়। যেমন :—

"ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি।
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই বিঘা দুই জমি।"

"স্নিগ্ধ সজল মেঘ কজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে।"

"দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহিরে
মনে হোলো যেন চিনি,
কবে নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা
ছিলে লীলা সঙ্গিনী।"

"কলাপ মেলি' করে সে কেলি রৌদ্রে স্নেহ সঞ্চারি'
ঘনার ছায়া মোহন মায়া
উচ্চকিত ঐ রবে।" (সত্যেন্দ্র)

"সাঁতার ভুলে মেঘ চলে আজ লস্করী চালে
অস্তরবির সোহাগ তাদের গুমর বাড়ালে।" (সত্যেন্দ্র)

অন্ত্যানুপ্রাসেরই মত আদ্যানুপ্রাসও মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। চরণ (=চলন) দ্বয়ের আরম্ভের শব্দে যদি অক্ষরগত মিল থাকে তবেই তাকে বলা যায় আদ্যানুপ্রাস। যেমন :—

"বনের যত মনের কথা সেই জেনেছে অন্তরে,
কিশোর কিশলয়ের আশা
তারি সে সুরে সন্তরে।" (সত্যেন্দ্র)

"কোমল হীরার কমল ফোটে কালো নিশির শ্যাম সায়রে।" (সত্যেন্দ্র)

"স্বচ্ছ হাসি শরৎ আসে পূর্ণিমা মালিকা ;
সকল বন আকুল করে শুভ্র শেফালিকা।"

"আঁধার রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা ;
সন্ধ্যা আকাশে স্বর্ণ আলোক পড়িবে ঢাকা।"

অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল ভাবপ্রকাশের কোনো উপকার করে কিনা তাই নিয়ে একালের সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবু কবিরা তাঁদের নিজেদের মতো ক'রে এর মীমাংসা ক'রে নেন। মিল (বা তৎসংসৃষ্ট আদ্যানুপ্রাস) ছাড়াও ভালো কাব্য হতে পারে ; এর দৃষ্টান্ত 'মেঘনাদবধ'। আর মিল নিয়ে যে ভালো কাব্য হতে পারে তার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা।

মিলের উপযোগিতাকে দু'রকম ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যথা :—

(১) মিল কবিতায় গীতধর্ম সঞ্চারের সাহায্য করে ; একটি ধ্বনি-গুচ্ছের সমান দূরে দূরে যদি অনুরূপ ধ্বনি শোনা যায় তবে তাতে একটি সুসঙ্গতির সৃষ্টি হয়।

(২) পয়ার ও ত্রিপদী আদি জাতীয় কবিতায় মিল, ছন্দের কাঠামোর অংশ হিসাবে গণ্য হয়। তাতে এক স্তবকের (stanza) অংশগুলির মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে সম্মিতির (symmetry) সৃষ্টি করে।

ছন্দের নিয়মে কবিতার যে কাঠামো দাঁড়াতে পারে মিলের প্রভাবে সেই কাঠামো উল্লিখিত দুরকম ভাবেই একটা সুনির্দিষ্ট রূপ পেয়ে থাকে। এটা খুবই ঠিক যে, যে-পর্যন্ত না শ্রোতার বা পাঠকের কান অন্তশ্ছন্দ (rhythm) সম্বন্ধে সচেতন হয় সে পর্যন্ত তিনি কেবল মিলের মাধুর্য দ্বারাই তৃপ্তিলাভ করেন। সমিল কবিতা গানের ধর্ম লাভ করে এবং সহজেই মনে গাঁথা হয়ে থাকে। বাংলা দেশের ছেলে ভুলানো ছড়া ও লোকগীতিগুলি প্রায়শ মিলের জন্যেই যথাক্রমে শিশু ও প্রবীণজনের নিকট চিরস্থায়ী সমাদর লাভ করেছে। কিন্তু সহজবোধ্য মিলের চেয়ে অপ্রত্যাশিত মিলই বেশি তৃপ্তিদায়ক ও শ্রুতিসুখকর। আন্ত্যানুপ্রাস ও সমান স্বরের অনুবৃত্তিই এ জাতীয় সূক্ষ্ম মিলের দৃষ্টান্ত। আদি ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্য এবং বর্তমান যুগের আরম্ভ কালের ঈশ্বর গুপ্তাদির কাব্য সহজবোধ্য ছত্রান্তিক মিলের (rhyme of lines) দৃষ্টান্তে ভরপুর। রবীন্দ্রনাথই আনলেন বাংলা কবিতায় মিলের বৈচিত্র্য। আভ্যন্তরীণ মিল ও আন্ত্যানুপ্রাসের যে সুষ্ঠু সন্নিবেশ তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় তেমন আর কোনো বাংলা কবিতায় নয়। অমিত্রাক্ষর বা অমিল ছন্দে ভালো কবিতা এবং লোকপ্রিয় কাব্য বাংলাতে একাধিক থাকলেও মিলযুক্ত কবিতারই প্রাদুর্ভাব সর্বাপেক্ষা বেশি। বাংলা গীতিকাব্যের রচনায় অমিল ছন্দ প্রায় অচল। কারণ কবির কোনো হৃদয়াবেগ বা অনুভূতিকে শব্দের বন্ধনে বন্দী করাই যেখানে কাজ, মিলের ব্যবহার সেখানে অপরিহার্য; যেহেতু, মিল কবিতার বাহ্যরূপটিকে বেশ সুনির্দিষ্ট ও আঁটসাট ক'রে দেয়; অমিল ছন্দ সে দিক দিয়ে নিতান্ত অক্ষম। মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য বা নাট্যকাব্য রচনায় অমিল ছন্দের ব্যবহার যে অনেকটা সুফলদায়ক তা অস্বীকার করবার যো নেই। বাংলার লোকপ্রিয় মহাকাব্য কয়েকখানি অমিল ছন্দেই লেখা। কয়েকখানি আখ্যানকাব্যও অমিল ছন্দে রচিত। কিন্তু মিলযুক্ত হয়েও যে ভালো আখ্যান কাব্য বা নাট্যকাব্য রচনা হতে পারে তা দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'কথা কাহিনী' ও 'বিদায় অভিশাপ' আদিতে আছে এ কথার উত্তম দৃষ্টান্ত।

কবিতায় গীতধর্ম সঞ্চারের আর একটি কৌশল আছে। সে অনেকটা অনুপ্রাস ও মিলের সঙ্গে সংসৃষ্ট। তাকে বলা যায় একই স্বরের পুনরাবৃত্তি। এই স্বরের পুনরাবৃত্তি বা **স্বরাবৃত্তি** (assonance) সময়ে সময়ে ভাববিশেষকে বেশ সুন্দর ব্যঞ্জনা দান করে। বর্তমান প্রবন্ধের গোড়ার দিকে এর একটি

দৃষ্টান্ত দেওয়া গেছে; বোঝাবার সুবিধার জন্যে আরও কয়েকটি নিচে দেওয়া গেল :—

"আমার মুলুক আসা কি ঐ ঢাকা কুয়াসায় ?
বাংলা দেশের মানুষ সেথা আজো পূজা পায়।" (সত্যেন্দ্র)

"উতলা উত্তরী হতে উড়াইয়া উন্মাদ পবনে
মন্দার মঞ্জরী"

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা"

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত দুটীর মধ্যে তৃতীয়টিতে ছাড়া স্বরাবৃত্তি অত চমকপ্রদ নয়। তা সত্ত্বেও প্রথমটিতে আকারের পুনরাবৃত্তি পাঠকের অজ্ঞাতসারে বাঙালীর মহিমার বিশেষত্বকে অভিব্যঞ্জিত ক'রে তোলে। তৃতীয় উদ্ধৃতাংশটিতে ঐকার ও ঔকারের পুনরাবর্তন বর্ষার প্রারম্ভিক বিস্ময় ও গাম্ভীর্যকে বেশ উত্তম ব্যঞ্জনা দিয়েছে।

কোনো শব্দের (word) পুনরাবৃত্তিও কবিতায় গীতধর্ম-সঞ্চারের অন্যতম উপায়। শ্রুতিমধুর ধ্বনিবিশেষকে পুনঃপুন উচ্চারণ করলে এক জাতীয় তৃপ্তি জন্মে। কিন্তু কবিতায় গীতধর্ম থাক্‌লেও তা গানের চেয়ে একটু আলাদা ধরণের পদার্থ। বক্তব্য বিষয়ের প্রতি জোর দেওয়ার জন্যেও পুনরাবৃত্তির দরকার হয় এবং সেই পুনরাবৃত্তির ফলে কবিতায় বিষয় বা তার পরিবেশ একান্ত নিবিড় ভাবে আমাদের মনকে নাড়া দিয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় পুনরাবৃত্তির বেশ সুন্দর সদ্ব্যবহার করেছেন।

পুনরাবৃত্তি আবার নানা রকমের, যথা (১) শব্দবিশেষের পুনরাবৃত্তি :

"গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।"

"মধুর আকাশ মধুর বাতাস মধুর ভুবনখানি
মধুমাখা মনে মধুর মিলনে মত্ত দুইটি প্রাণী।" (ম)

"হাস্‌ছে খোকা! হাস্‌ছে একা! হাস্‌ছে অতুল সুখে
এমন হাসি কে শেখালে ওকে? (সত্যেন্দ্র)

"কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ" (দ্বিজেন্দ্রলাল)

"এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝর ঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়॥"

(২) শব্দ-সমূহ বা বাক্যের পুনরাবৃত্তি। যেমন,

"হারিয়ে গেছে— হারিয়ে গেছে, ওরে ;
হারিয়ে গেছে বোল্-বলা সেই বাঁশী,
হারিয়ে গেছে কচি সে মুখখানি
দুধে-ধোয়া কচি দাঁতের হাসি।" (সত্যেন্দ্র)

"মনে হোলো মেঘ, মনে হোলো পাখী, মনে হোলো কিশলয়,
ভালো করে যেই দেখিবারে যাই মনে হোলো কিছু নয়।"

"আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে।

এ বেশ ভূষণ লহ সখী লহ
এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ
এমন যামিনী কাটিল বিরহ শয়নে
আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে॥"

শব্দালঙ্কার সৃষ্টির আর একটি কৌশল প্রকাশ পায় ধ্বন্যাত্মক (onomatopoetic) রচনায়। কিন্তু এ ধ্বন্যাত্মক রচনার কৌশলটি খুব সহজে আয়ত্ত হবার নয়। কাব্যে কখনো কখনো ধ্বনি সন্নিবেশের দ্বারা বস্তু ও ভাবের দ্যোতনা করা হয়। কৃত্রিমতা নগ্নভাবে প্রকাশ পেলে ধ্বন্যাত্মক রচনা ততটা তৃপ্তিদায়ক হয় না। যেমন,

"মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজুট সংঘট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা॥" (ভারতচন্দ্র)

এতে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহারের দ্বারা মহাদেবের যে রুদ্রমূর্তি অঙ্কনের চেষ্টা হয়েছে তা আমাদের তেমন খুসী করতে পারে না। ধ্বনি যদি ভাষাকে ব্যঞ্জনা দেয় তবেই তা সুন্দর, যেমন :—

"দিগন্ত বিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা প'রে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস, বহ্নিজ্বালাময়
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন নিঃশব্দ, নির্দ্দয়।"

এই স্থলটির শেষের দুটি ছত্রে ক্রমাগত দুরুচ্চার্য-সংযুক্ত বর্ণ ও উষ্মবর্ণ ব্যবহারের দ্বারা কবি মরুভূমির দুঃসহ উত্তাপ এবং ক্লেশদায়কতার বেশ চমৎকার ব্যঞ্জনা দিয়েছেন।

সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে
বসিয়া ছিলে উপল উপকূলে।

এ কবিতাংশটীতে ক্রমাগত বিভিন্ন স্বরের যোগে লকারের অনুবৃত্তি সদ্যস্নাতা নায়িকার জলসিক্ত দেহটিকে ধ্বনির মধ্যে মূর্ত ক'রে তুলেছে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ধ্বন্যাত্মক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'পাল্কীর গান' 'চরকার গান' 'দূরের পাল্লা' আদি তাঁর ধ্বন্যাত্মক রচনার উত্তম দৃষ্টান্ত। চরকার গান থেকে নিচে কিছু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :—

"ভোমরার গান গায় চরকায়, শোন্ ভাই!
থেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই।
ঘর-বার করবার দরকার নেই আর,
মন দাও চরকায় আপনার আপনার,
চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর ঘর
ঘর ঘর ক্ষীর সর আপনার নির্ভর!" (সত্যেন্দ্র)

এ কবিতাটিতে ছন্দের গতির সঙ্গে রকারের পুনঃপুন আবৃত্তির দ্বারা কবি চলন্ত চরকার শব্দটিকে বেশ নিপুণভাবে আমাদের অনুভবগম্য ক'রে তুলেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কাব্যের নানা অঙ্গ (অবশেষ)

শব্দালঙ্কারের পরেই আলোচ্য রচনার অন্তর্নিহিত ছন্দ বা অন্তশ্ছন্দ (rhythm)। কি বাহ্য প্রকৃতিতে কি কাব্য কলায়, ছন্দ হল সব কিছুর মূলে। একটি নির্দিষ্ট কাল-পর্বের অন্তে গ্রহগণ তাদের কক্ষপথে উদিত হয়, নদী স্রোতে নিয়মিত সময়ের পরে

পরে জলোচ্ছ্বাস দেখা যায়। ঋতুচক্রও এক সুনির্দিষ্ট ক্রমে পরস্পরকে অনুসরণ করে। মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস এবং হৃৎস্পন্দনের মধ্যেও নিয়মিত পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। আর এ সকল ব্যাপারের গুরুত্ব বিশেষভাবে বোঝা যায় তখনি, যখন দেখি যে মানুষের দেহ-মন গান বা বাজনার তালে তালে নৃত্যোন্মুখ হয়ে উঠে। মানুষ যে কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্যে আনন্দ পায় তার এক প্রধান কারণ তার শারীর প্রকৃতির অন্তর্নিহিত এই ছন্দ।

গদ্য ও পদ্য এ দুয়েতেই রয়েছে অন্তর্নিহিত ছন্দের খেলা। তবে গদ্যে এ ছন্দ নিয়মিতভাবে দেখা যায় না, কেবল পদ্যেরই ছন্দ প্রকাশ্যভাবে লক্ষ্যগোচর হয়। এ বিশেষত্বের জন্যেই পদ্য রচনা অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মনকে মুগ্ধ ক'রে আসছে। আদিম যুগের মানব পদ্যে তার গল্প রূপকথা রচনা ক'রে এসেছে গদ্য ব্যবহারের অনেক আগ থেকে।

পদ্যের বিশেষ লক্ষণ, বিশেষ রকমের পংক্তি দ্বারা বিভক্ত তার কাঠামো। নির্দিষ্টসংখ্যক ধ্বনিগুচ্ছে সমাপ্ত এক একটি পংক্তি, তাদের শেষে রয়েছে বড়ো যতি; কিন্তু গদ্যে এরূপ নিয়মের কড়াকড়ি নেই। যেখানে বক্তব্য বিষয়কে নিঃশেষে প্রকাশ ক'রে ফেলা হয় সেখানেই গদ্য বাক্যের বিরাম বা বড়ো যতি। পদ্য ও গদ্যের মাঝে এমন সুস্পষ্ট ভেদ থাকলেও পদ্যেরই মতো সাহিত্যিক গদ্যের মধ্যে অন্তশ্ছন্দ (rhythm) বিদ্যমান। অন্তশ্ছন্দ কী তার সংজ্ঞা নির্দেশ খুব সহজসাধ্য নয়। তবু সাহিত্যরসিকদের কানে তা সহজে ধরা পড়ে এবং দৃষ্টান্তের সাহায্যে এর স্বরূপটা বোধগম্য হতে পারে।

কোনো লেখক এরূপ একটি আত্ম-কাহিনীর কল্পনা করেন যে,

'মেঘে ঢাকা শ্রাবণ রাত্রির অন্ধকার গাঢ়, ঘন মেঘগর্জন ও ঝম্ ঝম্ রবে বৃষ্টি হইতেছে। এমন কালে স্রস্ত-বসনে আরামে খট্টায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলাম।' এই রচনাটি থেকে বক্তব্য বিষয়টিকে বুঝে নিতে আমাদের কোনো কষ্ট হয় না; কিন্তু এটিকে যদি একটু বদল ক'রে লেখা যায় যে,

মেঘাবৃত শ্রাবণ রজনীর অন্ধকার গাঢ়; তার উপর আবার ঘন ঘন হইতেছিল মেঘের গর্জন ও ঝম্ ঝম্ শব্দে পড়িতেছিল বৃষ্টি; এমন সময়ে স্রস্ত-বসনে পালঙ্কে শুইয়া নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছিলাম মনের আনন্দে।

অথবা

শ্রাবণ রাত মেঘের আবরণে ঘন আঁধার; তার ওপর ঘন ঘন মেঘের গর্জন ও ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টির বর্ষণ। এমন সময়ে শিথিল বেশ-বাসে পালঙ্কের 'পরে শুয়ে মগ্ন ছিলাম আমি সুখনিদ্রায়।

এই শেষোক্ত রচনা দুটির প্রকাশভঙ্গী যে প্রথমোক্ত রচনার প্রকাশভঙ্গীর চেয়ে আলাদা এবং সুশ্রব্য তা বোধ হয় যে-কোনো সাহিত্য-রসিকের কানেই ধরা পড়বে। এ শেষোক্ত রচনা দুটি যে শুনতে ভালো হয়েছে তার মূলে আছে তাদের অন্তর্নিহিত ছন্দ বা অন্তশ্ছন্দের আপেক্ষিক স্পষ্টতা বা প্রাচুর্য।

পদ্যে রচনার অন্তশ্ছন্দটি এত প্রচুর ও সুস্পষ্ট যে, বাইরেও তা মূর্তি গ্রহণ করে। যেমন, উল্লিখিত বিষয়টিকে নিম্নলিখিত মতো পদ্যে প্রকাশ করা চলে—যথা,

রজনী শ্রাবণ-ঘন দেয়া ঘন গরজয়
রিমঝিম শবদে বরিষে।
শেজেতে শয়ান সুখে বসন শিথিল দেহে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥

বৈষ্ণব কবির লেখায় এ বিষয়টি আরো মনোহর রূপ পরিগ্রহ করেছে, যথা—

রজনী শাঙন-ঘন ঘন দেয়া-গরজন
রিমঝিম শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥ (জ্ঞানদাস)

বাক্যের অন্তশ্ছন্দ যখন সুনির্দিষ্ট যতির বন্ধনে বাঁধা পড়ে তখনই তার ঘটে পদ্য-রূপ প্রাপ্তি। গদ্যে তেমনটি ঘটে না। বক্তব্য বিষয় প্রকাশিত হয়ে গেলেই কেবল গদ্য বাক্যকে থেমে যেতে হয়; কিন্তু পদ্য বাক্যকে যতির থেকে দূরে সমাপ্ত করলে তার পদ্যত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পূর্বোল্লিখিত গদ্য পদ্য দৃষ্টান্তগুলির তুলনা করলে একথা আরো সহজে বোধগম্য হবে; এবং এ দৃষ্টান্তগুলি থেকে এও বোঝা যাবে যে, অন্তশ্ছন্দের নিয়মিত পুনরাবৃত্তিই হ'ল পদ্যের বিশেষ লক্ষণ।

সাধারণ কবিতার গোড়ার দিকেই তার অন্তশ্ছন্দটি বিশেষভাবে প্রকটিত হয়ে থাকে। পাঠক সেটি থেকেই সর্বাগ্রে তাতে (সেই কবিতায়) অনুসৃত ছন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। আবৃত্তি যতই এগোয়, কবিতাটি যে কোন্ ছাঁচে (pattern) ঢালা সে সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ততই স্পষ্টতর হয়ে আসে। যদি কবিতার মাঝে মাঝে কোথাও এর ব্যতিক্রম হয় তবে সাধারণ ছন্দবোধ-সম্পন্ন ব্যক্তির কানে তা ধরা পড়বেই। কবিতা, নাটকেরই মতো আবৃত্তি করার জিনিষ। যদি উচ্চৈঃস্বরে না পড়া যায় তবে তার অন্তর্নিহিত গীতধর্মকে উপলব্ধি করা যায় না। যাঁরা ছন্দ-বিশ্লেষণ-ব্যবসায়ী তাঁদের মধ্যস্থতায় কবিতার সৌন্দর্য বুঝতে চেষ্টা করলে তা সব সময় সফল না হতে পারে। কেবল পদ্য-রচনা নয়, রচনামাত্রেরই অন্তর্নিহিত ছন্দ

এমন রহস্যময় যে, তাকে বোঝবার সহজ নিয়ম নিঃশেষে আবিষ্কার করা প্রায় অসাধ্য। মোটামুটি নিয়মকানুন তাকে বোঝবার সাহায্য করে বটে কিন্তু ছন্দ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বোধ শুধু তাঁদের পক্ষেই সম্ভবপর, যাঁরা এ সম্বন্ধে সহজাত সংস্কার নিয়ে জন্মেছেন। যাঁর এ স্বাভাবিক ছন্দবোধ খুব দুর্বল তিনি কবিতা উপভোগের কোনো আবশ্যকতাই অনুভব করেন না।

অন্তচ্ছন্দ সম্বন্ধে আরেকটি কথাও মনে রাখা দরকার। এ জিনিষটি দু রকমের হতে পারে, যথা—ভাষাগত অন্তচ্ছন্দ ও ভাবগত অন্তচ্ছন্দ; এ দুয়েতে তফাৎ থাকলেও এরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং পরস্পরের সহায়। কোনো ভাব বা চিত্র কবিচিত্তস্থ আবেগের প্রেরণায় কবিতার আদ্য স্তবকে বা চার ছত্রে যে রূপ পরিগ্রহ করে কবিতার অবশিষ্ট অংশেও প্রায়শ সে রূপই অনুসৃত হয়ে চলে। তা না করলে কবিতাটিতে সুষমা ও সুসঙ্গতির অভাব ঘটে। কিন্তু কবি যদি তাঁর ঈপ্সিত অর্থকে অঙ্গহীনতা থেকে বাঁচাতে যান, তবে সময় সময় কোনো বিশেষ ছাঁচকে (pattern) কঠোরভাবে অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর না হতে পারে। এ কথাটিকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যাক্। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতাটিকে নিয়ে দেখা হোক্। এটি চৌদ্দ অক্ষরের প্রবহমান পয়ার। এর আট অক্ষরের পর অর্ধ যতি আর চৌদ্দ অক্ষরের পর পূর্ণ যতি। কিন্তু স্থানে স্থানে অর্ধ যতি স্থাপনের ব্যতিক্রম (variation) দ্বারা যে কবি কেবল কবিতাটির ভাবগত বৈচিত্র্যকে ব্যঞ্জনা দিয়েছেন তা নয়; কবিতার ছন্দও তাতে অধিকতর বেগবান্ হয়ে উঠেছে। নিচে কবিতাটির গোড়ার দিক্‌টি উদ্ধৃত করছি—

> ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দার মালিকা,
> হে মহেন্দ্র, নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টীকা
> মলিন ললাটে। পুণ্যবল হোলো ক্ষীণ
> আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন,
> হে দেব হে দেবীগণ। বর্ষ লক্ষশত
> যাপন করেছি হর্ষে দেবতার মতো
> দেবলোকে।

এখানে গোড়ার ছত্রটি থেকেই সমস্ত কবিতার মোটামুটি ছন্দরূপ ধরা পড়েছে। কিন্তু তৃতীয় ছত্রের অর্থগত যতি যে ছন্দগত যতিকে বাধা দিয়েছে আকস্মিকতার দিক থেকে তা যেন স্বর্গচ্যুতিরই আশঙ্কার সঙ্গে এক-শ্রেণীস্থ। 'প্রেমের অভিষেক' নামক কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র কবিতাটির ছন্দগত ছাঁচটিকে প্রকাশ করেছেন তৃতীয় ছত্র থেকে। নিচে এ কবিতাটিরও আরম্ভাংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—

তুমি মোরে করেছ সম্রাট্, তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব মুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর। তব রাজটীকা
দীপিছে ললাট-মাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরণে।

প্রিয়ার অভাবনীয় প্রসাদ লাভের ফলে মনে যে, অপূর্ব ভাব-বিহ্বলতা এসেছিল তার কাব্যগত প্রকাশ যেন স্খলিত গতির ছন্দে নিজেকে ধরা দিয়েছে। কবিতাটির এরূপ নাটকীয় আরম্ভের ব্যঞ্জনা যিনি বুঝতে না পারবেন এর সমগ্র রসরহস্য আবিষ্কার করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হবে কি না সন্দেহ। যতি স্থাপনের এরূপ বিচিত্রতা দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবহমান-পয়ার-জাতীয় দীর্ঘ কবিতাগুলিকে বলিষ্ঠ বেগশালী এবং যথোপযুক্ত ভাবানুকূল ক'রে তুলেছেন। যতি স্থাপনের এ বৈচিত্র্য বাংলা কাব্যে সর্বপ্রথমে এনেছিলেন মাইকেল মধুসূদন তাঁর প্রবর্তিত সুপ্রসিদ্ধ অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভিতর দিয়ে। একঘেয়ে ও নিয়মিত যতিতে অভ্যস্ত বাঙালীর কানে তা প্রথম প্রথম অদ্ভুত ঠেকেছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে যতি-ব্যতিক্রমের দ্বারা এ ছন্দ বাংলা পদ্য রচনায় যে বলিষ্ঠতার আমদানি করল, তা বাঙালী পাঠক-পাঠিকার অকুণ্ঠিত অনুমোদন পেতে বিলম্ব হ'ল না। কিন্তু মিল নেই ব'লে এ অমিত্রাক্ষর খুব বেশি জনপ্রিয় হয় নি। রবীন্দ্রনাথ মিলযুক্ত পয়ারের সঙ্গে যতি স্থাপনের বিচিত্রতা যোগ করে যে প্রবহমান-পয়ার-জাতীয় ছন্দ সৃষ্টি করলেন তা অমিত্রাক্ষরেরই মতো বাংলা কবিতায় এক নতুন সৃষ্টি। তাঁর অন্যান্য বিশেষ সাহিত্যিক দানের মতো এর দ্বারাও তিনি স্মরণীয় হয়ে রইলেন। অমিল প্রবহমান পয়ার বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে আখ্যানকাব্যের প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাবে।

নানা দৈর্ঘ্যের ও সংখ্যার পর্ব-সন্নিবেশের দ্বারাও কবিতায় গীতধর্মের এবং অর্থ প্রকাশের বৈচিত্র্য ঘটে। যেমন, রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন :—

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
গোপনে রব না আমি
        বৃথা ফিরাব না তারে।
খোলোরে হৃদয়দল খোলো
ভোলোরে আপনারে ভোলো
এই সঙ্গীত-মুখর আকাশে
        গন্ধ বিকশিয়া তোলো

এই বাহির ভুবনে দিশাহারা
দিও মাধুরী ভারে ভারে।

কিন্তু কবিতাটির এই রূপে বিষয়ানুগত গতিবেগ ভালো ক'রে প্রকাশিত না হওয়ায় তিনি পরে লিখলেন,—

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো
এই সঙ্গীত মুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো
এই বাহির ভুবনে দিশাহারা
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে॥

যে কোনো সাহিত্য-রসিকই বুঝতে পারবেন এই শেষোক্ত প্রকাশভঙ্গীর ছন্দগত উৎকর্ষ। অধিকতর ধ্বনি-সমবায়ে লিখিত পর্ববহুল এ ছন্দ বসন্তের অন্তর্নিহিত লীলা-চাঞ্চল্যকে বেশ চমৎকার রূপ দিয়েছে।

যে সকল কারণে সাহিত্যের বা কাব্যের ভাষা এক বিশিষ্টতা লাভ ক'রে থাকে **অর্থালংকার** প্রয়োগ তাদের মধ্যে অন্যতম। সালংকারা ভাষা সহজেই মানুষের মনকে আকর্ষণ করে এবং সে ভাষা প্রায়শ বুঝতেও পারা যায় অপেক্ষাকৃত সহজে। যদি এমন সংশয়ের কারণ থাকে যে, যা বলা হচ্ছে শ্রোতা তা অনায়াসে বুঝতে পারবেন না, তবে আমরা তাঁর পরিচিত কোন জিনিসের তুলনা দিয়ে বিষয়টিকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রে থাকি। সাদা কথায় বললে যা দুর্বোধ্য ঠেকে, উপমা রূপকাদির সাহায্যে বললে তা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, অলংকৃত ভাষা স্মৃতির উপরও গভীরতর ছাপ এঁকে যায়। উপমা-রূপকাদির যোগে বক্তব্য বিষয়টি বেশ সহজবোধ্য হয়ে আসে, কিন্তু এ সত্ত্বেও সাহিত্যের ভাষায় এটি তার মুখ্য প্রয়োজন নয়। অলংকৃত বাক্য শ্রোতার চিত্তে যে একটা চমৎকৃতির আবেশ আনে এখানেই তার সার্থকতা। কবি যখন "পরশ-পাথর" অন্বেষণকারী পাগলের সম্বন্ধে বলেন যে, তার—

দুটিনেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোত্-হেন
উড়ে' উড়ে' খোঁজ ক'রে নিজের আলোকে।

তখন আমরা যে কেবল সে লোকটির চোখের মিট্-মিট-করা তীব্র দৃষ্টিকে

সহজে বুঝতে পারি তা নয়, ওরকম একটি অদ্ভুত ছবি তার নিজগুণেও চিত্তে এক চমৎকৃতি সঞ্চার করে, যার ফলে আমরা এক অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করি।

যে সকল ভাব আমাদের অন্তরে রসের সঞ্চার করে কেবল সেগুলিকে রূপ দেওয়াই নয়, ভাষার সাহায্যে নানা রকমের রসোদ্ভাবক চিত্র রচনা করাও কবিতার এক প্রধান কাজ, আর সেজন্যে ধ্বনি ও ছন্দের মতো রূপ-কল্পনাও (imagery) কবিতার ভাষায় অত্যাবশ্যক। কবিতা যে পরিমাণে গদ্যের চেয়ে সুসংহত ও বাহুল্য-বর্জিত প্রকাশ-পদ্ধতি, রূপ-কল্পনার প্রয়োজন তার পক্ষে সে পরিমাণে অপরিহার্য। তাই শব্দের বাহুল্য পরিহার করবার জন্যে কবিতায় শব্দময় চিত্রের আমদানী করা একান্ত প্রয়োজন। উপমা এদিক দিয়ে খুব ফলপ্রসূ। উপমার প্রয়োগই হচ্ছে রূপ-কল্পনার এক সুপ্রাচীন দৃষ্টান্ত। প্রায় তিন হাজার বছর আগের বৈদিক ঋষির উক্তিতে যখন ঝড়ের দেবতা মরুদ্‌গণ সম্বন্ধে পড়া যায়, "এরা বীরগণের মতো, যশঃকামী রণগমনোৎসুক যোদ্ধার মতো ব্যূহে একত্রিত হয়েছেন" তখন আমরা এই সুন্দর উপমাটির দ্বারা কেবল যে মরুদ্‌গণের প্রচণ্ডতা নিঃশেষে বুঝতে পারি তা নয়, এ শ্রেণীর দেবমণ্ডলীর একটা নির্দিষ্ট ছবি ও স্থায়ীভাবে আমাদের মনে মুদ্রিত হয়ে যায়। একটি বস্তুর সঙ্গে আরেকটি বস্তুর তুলনা করলেই দেখা দেয় **উপমা**। তুলিত বস্তুদ্বয়ের সর্বাঙ্গীন সাম্য দেখানো উপমার কাজ নয়। দুটি বস্তুর মধ্যে যদি কোন বিশেষ এক বিষয়েই সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে তাকে নিয়েই হতে পারে উপমার প্রবর্তন। যখন বলা হয় 'এ মুখখানি চাঁদের মতো', তখন চাঁদের অন্য সব গুণ ফেলে এর আনন্দ দান করার ক্ষমতার প্রতিই লক্ষ্য করা হয়। তাই উপমিত মুখ-খানিকে আমরা পূর্ণ চন্দ্রের মতো গোলাকার না ভেবে আনন্দজনক দৃশ্য হিসাবে নিয়ে থাকি। সার্থক উপমা সব সময়েই এরূপ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন ক'রে প্রযুক্ত হয়। যেমন, নূতন রোদ পড়লে গাছপালাতে অকস্মাৎ যে স্নিগ্ধ সহজ প্রসন্নতা দেখা দেয় তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন,

> তরুলতা-তৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে
> কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া
> মাতৃস্তন-পানশ্রান্ত-পরিতৃপ্ত হিয়া
> সুখস্বপ্ন-হাস্যমুখ শিশুর মতন।

এটি একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর উপমা। একান্ত নিখুঁতভাবে নবরৌদ্রস্নাত বৃক্ষলতাদির স্নিগ্ধ শোভার কমনীয়তা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। উপমায় খুব খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা ক'রে সাদৃশ্য দেখাতে গেলে তা অনেক সময় ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। যথা,

যেমন পরম শোভাকর পূর্ণচন্দ্র সুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুকে অত্যাশ্চর্য অনির্বচনীয় শোভায় শোভিত করে, সেইরূপ পরমেশ্বর-পরায়ণ পুণ্যাত্মারা সদালাপ ও সদুপদেশ প্রকাশ করিয়া, পার্শ্ববর্তী পুণ্যার্থীদিগের অন্তকরণ পরম রমণীয় ধর্মভূষণে ভূষিত করিতে থাকেন।

(অক্ষয়কুমার দত্ত)

সাদৃশ্যের সমস্ত খুঁটিনাটি বিচার উপমায় অচল হলেও একাধিক দিক দিয়ে সাদৃশ্য দেখালে, কখনো কখনো উপমা সমৃদ্ধতর হয়ে প্রকাশ পায়। যেমন, ব্যাঘ্রের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন,

দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্য-মেঘের তলে প্রচ্ছন্ন অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্রস্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের পরে
বিদ্যুতের বেগে ;

একই বিষয়ের সম্বন্ধে একাধিক উপমার ব্যবহারও সময় সময় প্রকাশের স্পষ্টতা বাড়িয়ে দেয়। যেমন,

মলিন-বদনা দেবী, হায়রে যেমতি
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকররাশি যথা) সূর্যকান্তমণি,
কিংবা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে ; (মাইকেল)

অথবা, যেমন কোনো নায়িকার বর্ণন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

গিরিবালার সৌন্দর্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে চেতনার ন্যায় একবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে।"

অপ্রত্যাশিত কোনো বস্তুর সঙ্গে তুলনা দিলে সেই উপমা তার চমৎকারিত্বের গুণে বিষয়টিকে বেশ হৃদয়গ্রাহী ক'রে তোলে। যেমন, দূরগ্রাম থেকে নদীর ক্ষীয়মান জলধারা পর্যন্ত প্রসারিত পায়ে-হাঁটা পথখানিকে বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন,

বক্র শীর্ণ পথ খানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত জিহ্বার মতো।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত এই উপমাটি আমাদের যেন চমক লাগিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যেও এরূপ উপমা দুর্লভ নয়। যেমন,

ভোরে উঠিয়া বিনয় দেখিল, সকাল বেলাকার আলোকটি দুধের ছেলের হাসির মতো নির্মল হইয়া ফুটিয়াছে।

নব প্রভাতের আলোটির মধ্যে যে সুকুমারতার আভা আছে তা এ উপমাটি থেকে বেশ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মাঝে মাঝে যে সকল তুচ্ছ বস্তুর প্রকাশ চোখে পড়ে তাদের কিছুর সঙ্গে উপমা দিলে, সেও বেশ চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে। যেমন,

বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন মেঘের নিঃশব্দ শাসনের নীচে কলিকাতা শহর একটা প্রকাণ্ড নিরানন্দ· কুকুরের মত······চুপ করিয়া পড়িয়া আছে।

এই সুপ্রযুক্ত উপমাটি থেকে শ্রাবণ সন্ধ্যায় ক'লকাতার চেহারাটি বেশ ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কোনো কোনো চিত্তগত ভাবের সঙ্গে উপমা দিলে, সে উপমাও মাঝে মাঝে উপমিত বস্তুর রসদানের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। যেমন,

বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি,

উপমার পরেই সব চেয়ে বেশি ব্যবহৃত অর্থালঙ্কার হচ্ছে **রূপক**। এর প্রয়োগও উপমার মতোই সুপ্রাচীন। রূপকেও উপমারই মতো দুটি পদার্থের তুলনা থেকে একটি ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু উপমার চেয়ে রূপক ঢের বেশি সংক্ষিপ্ত। যাকে নিয়ে তুলনা করা হয় (**উপমেয়,** যথা মুখাদি) আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয় (**উপমান,** যথা চন্দ্রাদি) এ দুয়ের অভেদ কল্পনা হলে তবেই তাকে বলা হয় রূপক, যেমন প্রিয়ার মুখচন্দ্র তাঁর চিত্তসমুদ্রকে উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলল। উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্য যদি 'ন্যায়', 'যেন', 'যেমন' ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে তবে তা হয়ে পড়ে উপমা। যেমন, প্রিয়ার মুখ চন্দ্রের ন্যায় তাঁর চিত্তরূপ সমুদ্রকে উচ্ছ্বসিত করল। উপমেয় ও উপমানের সাধারণ-ধর্মটি উহ্য (অনুল্লিখিত) থাকার ফলে রূপক উপমার চেয়ে আমাদের কল্পনাকে বেশি সক্রিয় করে তোলে; তার ফলে রসস্ফূর্তির সাহায্য করে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে। যেমন, যখন শুনি

তিমির-তুলিকা দাও বুলাইয়া আকাশ-চিত্তপটে।

তখনই কবির বক্তব্য আমাদের চোখে স্পষ্ট রূপ নিয়ে দেখা দেয়। গদ্য-রচনাতেও রূপকের ব্যবহার বিরল নয়। যেমন,

"তখন বংশের সৌভাগ্যশশী কৃষ্ণপক্ষের শেষকলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।"

"লোকালয়ের নয়ন-প্রাচীরের মধ্যে বিশ্ববিজয়ী প্রেমের এমন মহান্ সুযোগ মিলিত কোথায়?"

নূতন এবং অপ্রত্যাশিত বস্তুর সঙ্গে অভেদ কল্পনা করলে এই অলংকারটির প্রভাব খুব ত্বরিত ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। যেমন, যখন শুনি যে

নানাবিধ চৈতালি ফসলের স্তরে স্তরে পংক্তিতে পংক্তিতে সৌন্দর্য্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল

তখনই বসন্তের পক্ক-শস্যপূর্ণ মাঠের অজস্র শোভা চট ক'রে চোখের সামনে মূর্তি ধ'রে উপস্থিত হয়। নিচে এরূপ ধরণের রূপকের আরো দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :—

"এই সন্ধ্যা কিরণের সুবর্ণ মদিরা"

"সে বহিবে আনি ভরা অনুরাগ
যৌবন-নদী করিবে সজাগ।"

উপমার চেয়ে সংক্ষিপ্ত ব'লে রূপকের প্রভাবটি বেশ তাড়াতাড়ি বোধগম্য হয়। যখন শুনি যে, "শতকরা ন'টাকা হারের সুদের ন'পা-ওয়ালা মাকড়সা জমিদারীর চার দিকে জাল জড়িয়ে চলেছে", তখন মনে হয় এর চেয়ে আর ভালো ভাবে সুদের বাড়টাকে বোঝানো যেত না। তুলনীয় পদার্থ দুটির নানা পার্থক্য সত্ত্বেও লক্ষণীয় সাদৃশ্যটিকে সহজে বোধগম্য করতে পারাই হ'ল রূপক রচনার নিখুঁত আদর্শ। পার্থক্যগুলি যতই বেশি এবং সহজবোধ্য হবে সাদৃশ্যটি ততই গভীরভাবে শ্রোতার মনে মুদ্রিত হবে। যেমন, 'সৌন্দর্যের অগ্নি', 'লোকালয়ের নয়ন-প্রাচীর', 'যৌবন-নদী', 'সন্ধ্যা-কিরণের মদিরা' ইত্যাদি।

একই প্রসঙ্গে দুটি ভিন্নধর্মী বস্তুর রূপক ব্যবহার করা হলে তবে তাকে বলা হয় **বিমিশ্র** রূপক (mixed metaphor)। খুঁতখুঁতে সমালোচকেরা এ বিমিশ্র রূপককে অকারণে নিন্দা করতে পারেন ; তা সত্ত্বেও এ জাতীয় রূপকের উপাদেয়তা অস্বীকার করা যায় না। বিমিশ্র রূপক কবিচিত্তে আবেগের প্রাচুর্য থেকেই জন্মলাভ করে। যেমন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎ ছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূর দূরান্তরে।"

"মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মুরতি।"

শব্দকে দীপ্তি হিসাবে কল্পনা করায় এবং চক্ষুগ্রাহ্য রূপের সাহায্যে অমূর্ত রসের মূর্তি অঙ্কনের কথা বলায় এখানে রূপকের বৈচিত্র্য-প্রাপ্তি ঘটেছে।

উপমা রূপকের পরে সব চেয়ে বেশি দেখা যায় বোধ হয় **উৎপ্রেক্ষা**। এই উৎপ্রেক্ষাও উপমা-রূপকের মতো তুলনা-মূলক অলংকার। যখন উপমেয় বস্তুতে উপমানের ধর্ম লক্ষ্যগোচর হচ্ছে ব'লে দৃঢ় সংশয় হয় তখন এ অলংকারটি দেখা দেয়, যেমন

"এত বলি সিক্তপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া।"

"মনে হোলো সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে"

"নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে।
লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে।"

"নক্ষত্রের পাথার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।"

গদ্যেও, বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের গদ্যে এ অলংকারটি প্রায়ই পাওয়া যায়; যেমন

"এই দুটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত।"
"বর্ষার সন্ধ্যায় আকাশের অন্ধকার যেন ভিজিয়া ভারী হইয়া পড়িয়াছে।"
"মাঝে মাঝে এক একটী কথা যেন প্রাণের মধ্যে দংশন করিতে থাকে।"

এই উৎপ্রেক্ষা অলংকারটি কখনো কখনো রূপকের সঙ্গে একযোগে ব্যবহৃত হয়। তখন এর চমৎকারিত্ব আরো বাড়ে, যেমন

মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে।

মানব সভ্যতার আদি কাল থেকেই জড়-পদার্থাদিতে **ব্যক্তিত্বারোপ** (personification) চ'লে আসছে। এও একটি অলংকার। হিন্দুদের আদিমতম গ্রন্থ বেদ এই ব্যক্তিত্বারোপের দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। অগ্নি, বায়ু, সূর্য, বিদ্যুৎ, ঝটিকাবৃষ্টি আদিকে দেবতা কল্পনা ক'রে যে সব স্তব-স্তুতি রচিত হয়েছিল তার মূলে রয়েছে ব্যক্তিত্বারোপ। আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষিত ব্যক্তিদের আলোচনার ফলে জড় পদার্থের

দেবত্ব নষ্ট হয়ে গেলেও কবিদের কাছে এখনো তাদের দেবত্ব—অন্তত ব্যক্তিত্বের দাবী অক্ষুণ্ণ আছে। এরা ছাড়া কতকগুলি গুণ বা ভাববাচক পদার্থের উপরও কবিগণ মনুষ্য-সুলভ ব্যবহার আরোপ ক'রে থাকেন। স্বপ্ন, নিদ্রা, মৃত্যু, বাক্য, আশা, জ্ঞান আদি ভাববাচক পদার্থকে প্রাণবান্ ব্যক্তিরূপে কল্পনা করার ফলে এগুলি আমাদের নিকট বাস্তব ও স্থূল-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে প্রতিভাত হয়। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দেবীস্তব এরূপ ব্যক্তিত্ব কল্পনায় পরিপূর্ণ। যথা, 'যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা' ইত্যাদি।

কি পূর্বোক্ত ভাববোধক পদার্থ, কি সাধারণ প্রাণহীন পদার্থ, কি প্রাকৃতিক শক্তি-নিচয় এদের সকলের মধ্যেই মানবীয় লীলার—ভালবাসা, উৎসাহ, ক্রোধ, করুণা আদির আভাস মেলে। এ সকল আভাস দেখেই সেগুলির সম্পর্কে পরিপূর্ণ কল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ পরিপূর্ণ কল্পনাই পদার্থ বা ভাববিশেষের উপর ব্যক্তিত্বারোপে পর্যবসিত হয়। যেমন,

"আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চল-তলে।"

"অযুত বৎসর আগে হে বসন্ত, প্রথম ফাল্গুনে
মত্ত কুতুহলী,
প্রথম যেদিন খুলি' নন্দনের দক্ষিণ দুয়ার
মর্ত্ত্যে এলে চলি"

"অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মুখর-ভাষণ"

"হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ

......মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক।"

কবি যে জিনিষটীর উপর মানবীয় ভাবের আরোপ করেন তার সম্বন্ধে তদীয় অনুভূতির প্রকাশক হচ্ছে এই ব্যক্তিত্বারোপ। এপ্রকারেই মানবীয় আচরণ ও মনোভাবের দ্বারা তিনি পদার্থ বিশেষের সার্থকতাকে ব্যাখ্যা করেন। এ ব্যাখ্যা যে তিনি সব সময়ে সজ্ঞানে করেন তা নয়। কল্পনার যে অপরিহার্য আবেগ থেকে কবিতার জন্ম, সে আবেগের তাড়নায়ই কবি নিজের জগৎ সৃষ্টি ক'রে তাতে এমন সব অধিবাসীকে স্থান দেন যারা আমাদের স্থূল ধরণীতে, হয় জড়পদার্থ, নয় রক্তমাংসহীন

কাহিনী, নয় বৈজ্ঞানিকের প্রত্যক্ষ দৃশ্যপ্রপঞ্চ। আমাদের কাছে যারা ব্যক্তিত্বারোপের দৃষ্টান্ত মাত্র তা কবির স্থূল ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগম্য। ব্যক্তিত্বারোপের ফলে যখন কোনো পদার্থ বা ভাব জীবন্তবৎ প্রতিভাত হয় তখনি তা সফল, নচেৎ তা মামুলি অলংকার-রূপে কাব্যের ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়; রস-স্ফূর্তিতে কোনো বিশেষ সহায়তা করে না।

উপরে যে দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া হ'ল সেগুলি সোজাসুজি (direct) ব্যক্তিত্বারোপের দৃষ্টান্ত। একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যক্তিত্বারোপ করলে তার ফলে এই অলংকারটি বৈচিত্র্যলাভ করে। যেমন,

"ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে
ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তার
বেষ্টন করে কায়া।"

"নূতন জাগা কুঞ্জবনে কুহরি উঠে পিক
বসন্তের চুম্বনেতে বিবশ দশদিক।"

"চন্দ্র তারার উজল প্রদীপ জেলে
অসীম আকাশ দেখিল নয়ন মেলে।" (ম)

"পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন"

"শ্রাবণ রজনী ধীরে মেঘ-কুন্তল খোলে" (ম)

অতীতে হয়ে গেছে বা ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কোন অদ্ভুত ব্যাপারের প্রত্যক্ষবৎ বর্ণনাকে ভাবিক অলংকার বলা হয়। এ অলংকারটি বর্ণনাকে খুব ত্বরিত অনুভবগম্য ক'রে তোলে। যেমন,

"পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিছে শিখ
নির্মম নির্ভীক।"

"নববধূ সীতা আভরণহীন
উঠিলা বিদায় রথে।
রাজপুরী মাঝে উঠে হাহাকার
প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারে সার
এমন বজ্র কখনো কি আর
পড়েছে এমন ঘরে?"

"আজি হতে শত-বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহল-ভরে
আজি হতে শতবর্ষ পরে"

"কাণ্ডারী তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙ্গালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর ;
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।" (নজরুল)

উপরে যে সকল অর্থালঙ্কারের কথা উল্লিখিত হ'ল সেগুলি ছাড়া অন্য অর্থালঙ্কার বাংলা সাহিত্যে প্রচুরভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। যেমন দীপক ; উপমেয় ও উপমানের একই ক্রিয়া বা অনেক ক্রিয়াপদের সঙ্গে একমাত্র কারকের সম্বন্ধকে **দীপক** বলে। এই দীপকালংকার কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের গদ্যে দৃষ্ট হয়। যথা—

"কেবল সম্প্রতি অতি অল্পদিন হইল আধুনিক কাল দূরদেশাগত নবীন জামাতার মত নূতন চাল-চলন লইয়া পল্লীর অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে।"

"অনেক রাত্রে এক সময় ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলের ছেলেরা চুপ করিয়া গেল।"

বিরোধাভাসও (oxymoron) এজাতীয় স্বল্পব্যবহৃত একটী অলংকার। আপাতপ্রতীয়মান বিরোধের বর্ণনা দ্বারা যেখানে বক্তব্য বিষয়ের বিশেষত্বকে দৃঢ় করা হয় সেখানে এই অলংকারটি দেখা দেয়।

"কোন দূরদেশের ও দূরকালের উৎসব আপন শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝলমল করিয়া দিত।"

"মৃত্যু-সিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমর-মুরতি
সমুন্নতভালে।"

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।"

'উল্লেখ' নামক অলংকারটিও বেশি ব্যবহৃত হয় না। একমাত্র বস্তুকে অনেক প্রকারে নির্দেশ করলে উল্লেখ অলংকারের সৃষ্টি হয়। যথা—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে
আকুল পুলকে উলসিছ ফুলকাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে
তুমি চঞ্চলগামিনী।"

স্মরণ নামক অলংকারেরও আধুনিক বাংলার প্রয়োগ অতি বিরল। কোনো পদার্থকে প্রত্যক্ষ ক'রে তার সদৃশ বস্তুর কথা মনে পড়লে তাতে এ অলংকারটির উৎপত্তির কারণ ঘটে; যথা—

"হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।"

উল্লিখিত অলংকারগুলি ছাড়া অলংকারের সাক্ষাৎ আধুনিক বাংলা সাহিত্য কদাচিৎ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য আলংকারিকগণের মতে লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের প্রয়োগও অর্থালংকারের মধ্যে গণ্য।

শব্দের অন্তর্নিহিত যে শক্তির বলে তার বাচ্যার্থ (literal meaning) থেকে বাচ্যার্থের সংশ্রবযুক্ত অন্য অর্থের জ্ঞান জন্মে তার নাম লক্ষণা। লক্ষণাদ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয় তাকে **লক্ষ্যার্থ** বলে।

"রঘুপতি আবার মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন কোন প্রেমপূর্ণ হৃদয় বস্ত্রাদি লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই।"

"সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।"
"পঞ্জাব আজি গরজি উঠিল "অলখ নিরঞ্জন।"

বাক্যস্থ শব্দগুলির বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ বাদ দিয়ে বাক্যের অর্থে যে ব্যঞ্জনা পাওয়া যায় তাহাকে **ব্যঙ্গ্যার্থ** কহে; যথা

তিনি স্বর্গারোহণ করেছেন (অর্থাৎ তিনি মারা গিয়েছেন)। তোমার হাতের নোয়া অক্ষয় হোক (অর্থাৎ তুমি সধবা থাক)।

"বাতায়ন খুলে যায় ঘরে ঘরে
ঘুম ভাঙ্গা আঁখি ফুটে থরে থরে।"

"আমরা হইলাম পিতৃহারা
কাঁদিয়া কহে দশ দিক্।"

লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের প্রয়োগ অলংকার ব'লে গণ্য হ'লেও এ সকলের চমৎকারিত্ব খুব সহজে অনুভব-গম্য নয়। তবু ভাষাকে জোরালো করবার জন্য মাঝে মাঝে এর ব্যবহার দেখা যায়।

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে অনেক অলংকারের নাম ও আলোচনা আছে। কিন্তু উল্লিখিত উপমা রূপকাদি কয়েকটি ছাড়া সে সকল আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রায় দুর্লভ। কেবল হাস্যরস সৃষ্টির জন্য তাদের ব্যবহার একালের বাংলা সাহিত্যে কদাচিৎ দেখা যায়।

ইংরাজীতে epigram নামক একটি অলংকার আছে। তারও দৃষ্টান্ত বাংলা কাব্যে একান্ত দুর্লভ নয়। যথা—

"জনগণে যারা জোঁক সম শোষে তারে মহাজন কয়।
সন্তান সম পালে যারা জমি তারা জমিদার নয়।" (নজরুল)
"মাটিতে যাদের ঠেকেনা চরণ, মাটির মালিক তাহারই হন।" (নজরুল)

চতুর্থ অধ্যায়

গীতিকবিতা (১)

'গীতিকবিতা" এই নামকরণ থেকেই বোঝা উচিত যে এ শ্রেণীর কবিতা গীতি বা গানের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। অবশ্য সকল শ্রেণীর কবিতায় বা পদ্যেই গানের ধর্ম কিছু-কিছু পরিমাণে রয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে হ'লে ললিতকলার আদিমতম ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। যে সুদূর অতীতে মানুষ দৈনিক জীবনসংগ্রামের অন্তে সন্ধ্যাবেলায় নাচগানের আসরে পাড়াপড়শী ও আত্মীয় বন্ধুজনের সঙ্গ-সুখ ভোগ করত তার কথা স্মরণ করতে হবে। এসকল ক্ষুদ্র সম্মিলনে কখনো কখনো গানের পরে নৃত্য বা নৃত্যের পরে গান হ'ত। এ শ্রেণীর গানগুলি হয়ত বেশীর ভাগই ছিল কোন প্রাকৃতিক শক্তির উদ্দেশ্যে রচিত আর সে রচনার উৎস প্রায়শ ছিল রচয়িতার হর্ষাদি হৃদয়াবেগের প্রেরণা। মানব সভ্যতা ক্রমশ অগ্রসর হলেও এ শ্রেণীর গান তৈরীর প্রথা লোপ পায়নি, এমন কি কোনো কোনো দেশের ও সভ্যতার বেলায় এরূপ গান রচনা এবং গানের ব্যবহার ব্যাপকভাবে ধর্মকার্য্যের অঙ্গীভূত ব'লে বিবেচিত হতে থাকে। যেমন প্রাচীন ভারতবর্ষে ঘটেছিল; নানা শ্রেণীর দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত স্তুতিগীত ছিল সেখানে যজ্ঞাদিঅনুষ্ঠানে অবশ্য পঠনীয় বা গেয়। এ সকল স্তুতিগীতের এক অতুলনীয় ভাণ্ডার হচ্ছে ঋগ্বেদ সংহিতা (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)।

গীতিকবিতার গোড়ার ইতিহাস যাই হোক্, এর এক প্রধান লক্ষণ এই যে, এ শ্রেণীর কবিতা ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকেই জন্মলাভ করে। কবি তীব্রভাবে ও আন্তরিক ভাবে যা কিছু অনুভব করেন সেটি ছন্দের সাহায্যে প্রকাশ করলেই তা গীতিকবিতা হবে, তা সুরলয়-সহকারে গাওয়া হোক্ আর নাই হোক্। বাংলা সাহিত্যের যে প্রাচীনতম নমুনাগুলি (১০ম-১২শ শতাব্দী) পাওয়া গেছে তাতেও স্থানে স্থানে গীতিকবিতা সুলভ ভাবাবেগ প্রকাশের দৃষ্টান্ত আছে ; যথা

জোইনি তঁই বিণু খনহি ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বি কমলরস পিবমি ॥ (চর্যা—৪)

কিন্তু চর্যাপদগুলির গীতিকাব্যত্ব একান্ত গৌণ, কারণ এখানে কোনো আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রচারের বাহন হিসাবেই গীতিকবিতার ব্যবহার হয়েছে। এদিক দিয়ে চর্যাপদের পূর্ববর্তীকালে বাংলাদেশে রচিত অপভ্রংশ কবিতাগুলির গীতিকাব্যত্ব ঢের বেশি সুস্পষ্ট ; যথা—

নব মঞ্জরি সজ্জিঅ চুঅঅ গাছে
পরিফুল্লিঅ কেসু ণআ বনে আছে।
জই এথি দিগন্তর জাহিই কন্তা
কিঅ বম্মহ নথি কি ণথি বসন্তা ॥ (প্রাকৃত পৈঙ্গল)

[আমের গাছে নূতন বোল ধরেছে, বনে নূতন-ফোটা পলাশ ফুল (ও) আছে। এমন সময়ে যদি প্রিয়জন বিদেশে যায় তবে কি (ভাব্ ব) ভালোবাসার দেবতা নেই, না বসন্ত নেই ?]

দুর্ভাগ্যবশত বাঙালীর রচিত এ ধরণের অপভ্রংশ কবিতা বেশি পাওয়া যায় না। বাঙালী সিদ্ধাদের রচিত 'দোগকোষে'র অন্তর্গত পদগুলিতে গীতি-কাব্যসুলভ ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছাসের দৃষ্টান্ত নিতান্ত দুর্লভ। অথচ এই শ্রেণীর ভাবোচ্ছাসই হ'ল গীতি-কবিতার প্রাণ। কি কারণে ঠিক বলা যায় না, বাংলা গীতিকাব্যে ব্যক্তি-গত ভাবোচ্ছাস আধুনিক কালের আগে পর্যন্ত সোজাসুজি ভাবে প্রকাশ পায় নি। কবিগণ তাঁদের মনের ভাব প্রায়শ বিবিধ আখ্যানকাব্যের নায়ক-নায়িকার মুখেই ফোটাতেন। এদিক দিয়ে রাধাকৃষ্ণকে তাঁরা করেছিলেন এক অতুলনীয় মুখপাত্র। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে' যে কয়টি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা আছে তারাই এ শ্রেণীর রচনার সুপ্রাচীন নিদর্শন। তাঁর রচিত "কে না বাঁশী বাএ বড়াই" ইত্যাদি পদ হয়ত পাঠকদের অনেকেরই সুপরিচিত। পরবর্তীকালে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির অতুলনীয় গীতিকাব্যের প্রভাবে এবং চৈতন্য দেবের প্রেরণায় বাংলাদেশে বৈষ্ণব

'পদাবলী' নামক যে অপূর্ব গীতি-কবিতার প্রসার হয়েছিল তারও পশ্চাতে ছিল সেই পরারোপিত আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস। এই ব্যাপারটিকে লক্ষ্য ক'রেই কবি জিজ্ঞাসা করেছেন :—

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?"

এবং

"সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান
বিরহ-তাপিত ? হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে ?"

পরোক্ষভাবে হোক্ আর সোজাসুজি ভাবেই প্রকাশিত হোক্ বৈষ্ণবপদাবলীতে বাংলা গীতিকাব্যের যে উৎকর্ষ প্রকটিত হয়েছিল প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা একান্ত দুর্লভ। বাংলা গীতিকাব্যের এরূপ অসাধারণ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেরও আশ্চর্যজনক বিকাশ হয়েছিল। সঙ্গীতের সঙ্গে উক্ত পদাবলীর মিলনেই সম্ভবপর হইয়াছিল "কীর্তন" নামক বিশেষ বাংলা সঙ্গীতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। সঙ্গীতের প্রভাব এ গীতিকাব্যের প্রকৃতিকে কিয়দংশে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। ললিতকলার কোনো এক বিভাগে উন্নতি ঘটলে তার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য বিভাগেও অগ্রগতির তাগিদ আসে। নানা সুরলয়-সহকারে গীত হওয়ার ফলেই হয়ত পদাবলী শ্রেণীর গীতিকাব্যে কতকগুলি বিশেষত্ব দেখা দিল। কোনো একটি রাগ রাগিণী যদি খুব বেশীক্ষণ ধ'রে আলাপ করা যায় তবে তা নিজের সহজ সরল রূপটি হারিয়ে ফেলে ; গীতিকবিতার সম্বন্ধেও ঠিক তাই ঘটে। প্রিয়ার প্রেম-বিকশিত আঁখির প্রশংসা করতে গিয়ে হঠাৎ বাছা বাছা কথাগুলি ফুরিয়ে আসতে পারে ; তখনো সেই প্রশংসা জোর ক'রে চালাতে গেলে তা উৎপাত ব'লে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা। মানুষের হৃদ্গত ভাবগুলির উচ্ছ্বাস প্রায়শ খুব ক্ষণস্থায়ী, সে-কারণে তাদের প্রকাশও খুব স্বল্প পরিসরের মধ্যেই সম্ভবপর।

উক্ত পদসমূহের অপেক্ষাকৃত ছোট আকারেরও এই এক কারণ। গেয় হওয়ার জন্যে রচিত ব'লে এ শ্রেণীর গীতিকাব্যে ছন্দ বা মিলের কড়াকড়িও তেমন নেই। যেখানে ছন্দ ইত্যাদি শিথিল, গায়কের কণ্ঠ সেখানে উপযুক্ত সুর ভরাট ক'রে কবিতাটির সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণভাবে প্রচার করে। গীতিকাব্য রচনার এ পদ্ধতি মধুসূদনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে চ'লে আসছিল।

গীতিকাব্যের একটি মৌলিক লক্ষণ এই যে, এতে শুধু একটিমাত্র ভাব বা

ভাবের উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হবে। কী রকম মনের অবস্থা থেকে গীতিকবিতা লেখা হয় তার একটি সরল ও সুস্পষ্ট বিবরণ রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে আছে। তিনি লিখেছেন—

> একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা একেবারেই এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের কবিতাটি নির্ঝরের মতই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।

কখনো কখনো এমন মুহূর্ত আসে যা স্মৃতির উপর এক লোকাতীত জগতের বার্তা স্থায়ীভাবে মুদ্রিত ক'রে যায়। সময়ান্তরে কবি যখন এরূপ মুহূর্তকে আত্ম-সমাহিতভাবে স্মরণ করেন তখনই জন্মলাভ করে গীতিকবিতা।

যমুনার প্রবাহ দেখে কালপ্রবাহের যে ধ্বংসলীলা কবির মনে ছবির মতো ভেসে ওঠে, অথবা অজাতদন্ত শিশুর হাসি দেখে কবি তাতে যে স্বর্গসুলভ রস ও সৌন্দর্যের ছবি দেখতে পান, অথবা বিদ্যালয়ের দৈনিক ছুটির অন্তে ছেলের দলের উদ্দাম আনন্দ উল্লাস তাঁর মনে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি এনে দেয়, সেই ছবি তাঁকে পেয়ে বসে যে পর্যন্ত ছন্দোবন্ধে তিনি তা প্রকাশ না করেন। আখ্যানকাব্য নাটক বা উপন্যাস রচনার বেলায়ও এরূপ ব্যাপার ঘটতে পারে। লেখকের চিত্ত যখন এরূপ একটি ভাবের দ্বারা অধিকৃত হয় তখন তাকে প্রকাশ করতে গেলেই দেখা দেয় গীতি-কবিতা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে মাইকেল, গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র লাল প্রভৃতি তাঁদের মহাকাব্য এবং নাটকে গীতি-কবিতা লিখে গেছেন। যেমন, 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে রাবণের বিলাপদ্বয় (বীরবাহুর এবং মেঘনাদের মৃত্যুতে ১ম ও ৯ম সর্গ) এবং সীতার পঞ্চবটী প্রবাসের বর্ণনা (৪র্থ সর্গ)।

এ সকল দৃষ্টান্ত থেকে নিতান্ত সত্য মনে হয় সেই কবি-সমালোচকের কথা যিনি ব'লে গেছেন যে, 'গীতি-কবিতাই হ'ল কাব্য-সাহিত্যের সারভূত। নাটক বা আখ্যান রচনায় যে জাতীয় ক্ষমতার প্রয়োজন তার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট নয় এমন নিছক কবিত্ব শক্তিই গীতিকাব্য রচনায় রূপ পরিগ্রহ করে। আখ্যান বস্তুর (plot) শৃঙ্খলা বিধানের অথবা চরিত্র চিত্রণের জন্য কবি যখন কোনো প্রয়াস না করেন তখন তিনি নিজের ক্ষমতাকে এমন এক সাময়িক আনন্দের ক্ষেত্রে অগাধ বিহারের স্বাধীনতা দিতে পারেন যেখান থেকে বিশুদ্ধ কাব্য জন্মলাভ করে।'

নাটক এবং গল্পে গীতিকবিতার মতো একটি ভাবগত বা উদ্দেশ্যগত ঐক্য (unity) থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই ঐক্য রক্ষার প্রচেষ্টা দর্শক বা পাঠকের দৃষ্টিকে কদাচিৎ এড়াতে পারে। তিনি বেশ বুঝতে পারেন নানা দৃশ্যাবলী ও চরিত্র সৃষ্টি কেমন ক'রে সেই ঐক্যের সন্ধানে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলছে। উপমার ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় যে, তিনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাজীকরের হাতের কৌশল যা গোপন রেখে সে লোককে আশ্চর্য ক'রে দিচ্ছে। কিন্তু গীতি কবিতার বেলায় তিনি হঠাৎ একেবারে বাজীকরের দেখানো আশ্চর্যজনক দৃশ্যটিই দেখে ফেলেন। সাময়িকভাবে দেখা বা অনুভব করা কোনো দৃশ্য বা ভাবকে বিনা প্রয়াসে প্রকাশ করলেই তা হয় গীতিকবিতা। এখানে কবির কোনো বাঁধা ধরা উপায়ে অগ্রসর হওয়ায় সুবিধা নেই। কেবল তাঁকে এইটুকু দেখতে হবে তিনি যে ভাবটি অনুভব করেছেন সেটি তাঁর শ্রোতার চিত্তে যেন তৎক্ষণাৎ আবেগ সঞ্চার করে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, তিনি এমন যে-কোনো গঠনপদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন যা সেরূপ আবেগ-সঞ্চারের পক্ষে অনুকূল। কিন্তু একথা যেন কেউ না ভাবেন, যে হৃদয়াবেগ গীতি-কবিতার মূল কারণ সে হৃদয়াবেগ অনুভবের সঙ্গে সঙ্গেই ভালো গীতি-কবিতা রচিত হয়।

সাধারণ রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে যা বলেছেন গীতি-কবিতার সম্বন্ধেই তা বিশেষভাবে খাটে। তিনি বলেন, "**কোনো সদ্য আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে তখন যে, লেখা ভাল হইতে হইবে এমন কথা নাই। তখন গদ্‌গদ বাক্যের পালা। ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলেনা তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্য-রচনার পক্ষে তাহা অনুকূল হয় না। স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রঙ্‌ ফোটে ভাল। প্রত্যক্ষের একটা জবরদস্তি আছে তাহার শাসন কাটাইতে না পারিলেই কল্পনা আপনার জায়গাটি পায় না। * * * রচনার বিষয়টিই যদি তাহাকে ছাপাইয়া কর্তৃত্ব করিতে যায় তবে তাহা প্রতিবিম্ব হয়, প্রতিমূর্তি হয় না।"

কবির অনুভূতির ও রচনার যে সময়গত ব্যবধান উত্তম গীতি-কাব্য নির্মাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তারি জন্যে উক্ত নির্মাণকার্য খানিকটা আয়াসসাধ্য হয়ে পড়ে। এরূপ আয়াসের কথা ভেবেই সুবিখ্যাত আইরিশ কবি ইয়েটস্ (W.B. Yeats) লিখেছিলেন :—

> A line will take us hours may be,
> Yet if it does not seem a moments' thought,
> Our stitching and unstitching has been naught.

গীতি-কবিতার রচনা অন্য যে কোনো উচ্চাঙ্গ শিল্পের মতোই বহু প্রচেষ্টার ফল কিন্তু এর বিশেষত্ব এই যে, গীতিকবিতা তখনই উত্তম ব'লে গণ্য হবে যখন এতে প্রচেষ্টার লেশমাত্র বাইরে প্রকটিত হবে না।

প্রাচীন গীতিকাব্য রচনার যুগে কবিকে প্রায়শ প্রয়াস করতে দেখা যায় না। তিনি প্রায়ই কোনো বিশেষ রূপকে আশ্রয় ক'রে লিখতে যান না ; কোনো বিশেষ ভাব হঠাৎ আশ্চর্য্যজনক উপায়ে এক বিশেষ রূপ নিয়ে দেখা দেয়। কবি তখন তাকে তার সেই রূপেই পূর্ণভাবে গ'ড়ে তোলেন।

সাহিত্যিক সৃষ্টিকার্যের আগে যে এক রহস্যময় ব্যাকুলতা কবির মনে বিরাজ করে তার মধ্যেই ভাবটি তাঁকে সুস্পষ্ট ভাবে পেয়ে বসে এবং এই ভাবটি একটি চরণ বা ছত্ররূপে প্রথম প্রকাশিত হয়। এখানেই সৃষ্টির মারাত্মক সন্ধিক্ষণ ; কারণ যে পংক্তি বা ছত্র এভাবে প্রথম দেখা দেয় তাই সমগ্র কবিতার অন্তচ্ছন্দ বা স্তবক-বন্ধকে নিয়ন্ত্রিত করে। এ জায়গা থেকেই গীতি-কবিতা নানা রূপ নিয়ে বিকাশ-লাভ করে। কখনো কখনো প্রথম পংক্তি বা ছত্র কবিতার পরবর্তী পংক্তি গুলিকে নিজের মতো সাজিয়ে তোলে। কখনো বা প্রথম পংক্তির পরিপুষ্টির জন্য পরবর্তী পংক্তি গুলিকে নানা আকারে গ'ড়ে তোলা হয়।

এরূপ কারণে এমন ঘটনা অনেকবার ঘটেছে যে কবি তার প্রথম পংক্তিতে প্রকাশিত ভাবটির ঐশ্বর্য পরবর্তী পংক্তিগুলিতে বজায় রাখতে পারেন নি। যেমন সুপরিচিত চণ্ডীদাসের 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' এবং জ্ঞানদাসের 'তোমার গরবে গরবিণী আমি' ইত্যাদি পদ। হেমচন্দ্রের 'শিশুর হাসি' কবিতাটিও এর অন্যতম দৃষ্টান্ত।

প্রাচীন বাংলা চর্যাপদগুলি সাধনতত্ত্বের বাহন হ'লেও তাতে গীতিকবিতার লক্ষণ বর্তমান। কারণ এতে সাধকগণের অনুভূত তত্ত্বের এক দিক (aspect) অনুভূত হৃদয়াবেগের মতোই কাব্যের ভাষায় ও ছন্দোবন্ধে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই এগুলিকে পরবর্তী কালের গীতিকবিতার মত রচয়িতাদের হৃদয় থেকে স্বত-উৎসারিত বাণী ব'লে ধরা যেতে পারে। লৌকিক সুখ দুঃখ নিয়েও হয়ত এজাতীয় গীতিকবিতা চর্যার যুগে রচিত হয়েছিল ; দুর্ভাগ্যবশত সেসব আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌছয়নি। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে' যে সকল গীতিকবিতা দেখতে পাই তাতেই হয়ত আছে উক্ত লুপ্ত কবিতাগুলির অনুবৃত্তি। বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত কয়েকটি গীতি-কবিতাই বোধ হয় বিশুদ্ধ বাংলা গীতি কবিতার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দৃষ্টান্ত। কেবল প্রাচীনতম ব'লে নয়, রসের সৃষ্টি হিসাবেও এগুলিকে স্মরণীয় ব'লে গণ্য করতে হয়। এ প্রসঙ্গে 'কে না বাঁশী বাএ বড়াই'

'দিনের সুরজ পোড়াআঁ মারে' ও 'মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী' আদি উত্তম পদগুলিকে লক্ষ্য করা হচ্ছে। কিন্তু যে কারণেই হোক, পরবর্তী বাংলা গীতি-কবিতার, বিশেষ ক'রে, বৈষ্ণব-পদাবলীর উপর বড়ু চণ্ডীদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট নয়। এদিক দিয়ে প্রভাব বিস্তারে মৈথিল ভাষার কবি বিদ্যাপতি ও সংস্কৃত ভাষার কবি জয়দেব অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর এক প্রধান অংশ এদুজনের কবিতার অনুসরণ বা অনুকরণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা গীতিকবিতার ভাণ্ডারে বৈষ্ণব কবিতার দান অতুলনীয়।

আধুনিক কালের আগে পর্যন্ত রচিত গীতিকবিতা গানরূপেই লেখা হ'ত। কিন্তু এ গানগুলি সুরকে বা রাগরাগিণীকে প্রকাশ করবার অবলম্বন হিসাবে রচিত নয়। এদের নিজস্ব অর্থগৌরব এবং ছন্দমাধুর্যও বর্তমান। অবশ্য বর্তমান প্রসঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে, বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত এমন পদ দুর্লভ নয় সঙ্গীত থেকে বিচ্ছিন্ন করলে অর্থাৎ না গাইলে যাদের যথার্থ রস উপলব্ধি করা যায় না। সে যাই হোক্ এই গানগুলিতে রচয়িতাগণ নানা দৈর্ঘ্যের ছন্দ ও ও নানা মিলের বিন্যাসে রচনার যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন, আর এই বৈচিত্র্যের সাহায্যে ফুটে উঠেছে নানা ভাবের সমারোহ। বৈষ্ণব পদাবলী নিয়ে গভীর ভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এতে প্রেমকে অবলম্বন ক'রে এক বিপুল কাব্যসঞ্চয় রচিত হয়েছিল। কিন্তু বিষয়বস্তুর পরিস্ফুটনের দিক দিয়ে দেখ্‌লে প্রায় লেখকেরই নিজস্ব ভঙ্গী ছিল না। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে কৃত্রিমতা ছিল। এর মধ্যে স্থানে স্থানে বিষম ভাষাগত আড়ম্বর দেখা যায়। এ দোষটির ফলে গীতিকবিতার সহজ সুন্দর রূপটি স্থানে স্থানে ক্ষুন্ন হয়েছে। যেমন,

> মঞ্জুল বঞ্জুল নিকুঞ্জ মন্দিরে
> সোঙরি সো গুণধাম।
> মরম অন্তরে জপয়ে মন্তরে
> একলি তোহরি নাম॥

ইত্যাদি গোবিন্দ দাসের পদটি এর উত্তম দৃষ্টান্ত। ইনি জয়দেবের রচনা থেকে এর ভাবটি নিয়েছেন; কিন্তু এতেও দোষ হ'ত না, যদি ভাষার আড়ম্বরটি বর্জন করতেন। রায়শেখর, যদুনন্দন, মোহনদাস, বল্লভদাস প্রভৃতির রচনায় এ শ্রেণীর ত্রুটি বিদ্যমান। পদাবলীর কৃত্রিমতার অপর কারণ, ভাব ও চিত্রের এমন কি ভাষার পুনরুক্তি; অর্থাৎ প্রায় একই ভাব নিয়ে একই ছন্দে নানা কবি পদ রচনা করেছেন। যেমন রাধিকার পূর্বরাগ (সাক্ষাৎ দর্শন) ও রূপানুরাগের

পদগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে তাতে বিদ্যাপতির 'এ সখি কি পেখলুঁ এক অপরূপ' এই চরণটির ভাব ও ভাষা উল্লিখিত বিষয়ের পদাবলীতে অন্যূন বারো বার পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। যেমন, গোবিন্দ দাস অন্যূন দুটি পদে নিম্নলিখিত রূপে উক্ত ভাবটিকে প্রকাশ করেছেন :—

'আজু কি পেখলুঁ কেলি কদম্বের তলে'
'কি হেরিলাম কদম্বের তলে'

আর জ্ঞানদাসের অন্তত চারিটি পদে উক্ত ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে। যেমন :—

'তরুমূলে কি রূপ দেখিনু'
'সজনি কি পেখলুঁ শ্যামরচন্দে'
'কি হেরিলাম নীপমূলে ধন্দ'
'কি রূপ হেরিলাম কালিন্দী কূলে'

এ সকল ছাড়া আরো পাঁচ জন পদকর্তা ভাবটিকে নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশ করেছেন :—

'কি পেখলুঁ যমুনার তীরে' (যদু)
'কি রূপ দেখিনু সেই নাগর শেখর' (বলরাম)
'কি পেখলুঁ বরজ-রাজকুল-নন্দন (অনন্ত)
'কি রূপ দেখিলাম মধুর মুরতি' (দ্বিজ ভীম)
সজনি কি হেরিনু যমুনার জলে (চণ্ডীদাস)

এ শ্রেণীর পুনরাবৃত্তিতে এবং বহু প্রচলিত উপমানের (যেমন, নব জলধর, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, অমৃত আদি) পুনঃপুন ব্যবহারের ফলে পদাবলীর এক বিশিষ্টাংশের গীতিকবিতা হিসাবে উপাদেয়তা কমে গিয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত ত্রুটিগুলি বা অন্য রকমের ত্রুটি সুবিশাল বৈষ্ণব পদাবলীতে আবিষ্কার করা সম্ভবপর হলেও পদকর্তাদের বিশেষ কৃতিত্বের বিষয় এই যে, তাঁদের রচনার মধ্যে এমন অনেক পদ রয়েছে অন্যূন দু'শ' বছর পরেও যাদের রসদান-ক্ষমতার বিন্দুমাত্র অপচয় হয় নি; শুধু তাই নয়, তাঁদের রচিত এ শ্রেণীর কবিতা বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতার সমকক্ষ ব'লে গণ্য হওয়ার যোগ্য। যেমন জ্ঞানদাসের পদ :—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥

অথবা

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥

ইত্যাদি পদে ভালবাসার যে নিবিড় রূপ প্রকাশিত হয়েছে তা ভাষার ছন্দে ও ভাবে অতুলনীয়।

ব্রজবুলিতে রচিত গোবিন্দ দাসের কয়েকটি পদেও এ শ্রেণীর প্রেমমূলক গীতি-কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন,

তুহুঁ অতি মন্থর গমন দুরন্তর
মধু যামিনী অতি ছোটী।
সো ঘর বাহির করত নিরন্তর
নিমিখ মানয়ে যুগকোটি॥

অথবা

যো মঝু চরণ- পরশ-রসলালসে
লাখ মিনতি মুঝে কেল।
তাকর দরশন বিনি তনু জরজর
দরশ পরশ সম ভেল॥

এই পদ্যাংশ দুটি বৈষ্ণব গীতিকাব্যের উত্তম দৃষ্টান্ত। এ দুটিতে যেরূপ সরল ভাষায় ও ছন্দে রাধার গভীর প্রেম-ব্যাকুলতা বর্ণিত হয়েছে তার তুলনা মেলা ভার। এরূপ উচ্চশ্রেণীর ভাবগম্ভীর গীতিকবিতা গোবিন্দ দাসের আরো আছে।

যাঁহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহু নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হই তথি মাহ॥

ইত্যাদি পদটিতেও প্রেমের অপূর্ব আত্মহারা ভাব প্রকাশিত হয়েছে।

সো কুসুমিত বন কুঞ্জকুটীর।
সো যমুনা জল মলয় সমীর॥
সো হিমকর হেরি লাগয়ে চন্দ।
কানু বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক॥

ইত্যাদি পদ্যাংশেও গোবিন্দ দাসের গীতিকবিতা রচনার প্রতিভা বেশ সার্থক-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সহজ ছন্দ ও ভাষা কবিতাটির ভাবকে খুব মনোহর রূপে প্রকাশ করেছে।

বৈষ্ণব পদাবলী থেকে যে কয়টি অংশ উপরে উদ্ধৃত হয়েছে তাদের পদলালিত্য ও ভাষার সারল্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো। এদের আবৃত্তি শুনলেই মনে হয় যেন এরা কারো প্রয়াসের দ্বারা রচিত নয়; কবির চিত্ত থেকে তাঁর অনুভূত সহজ আনন্দবেগে উৎসারিত এ কবিতাগুলি। সমস্ত প্রথম শ্রেণীর বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধেই এ মন্তব্য প্রযোজ্য।

আধুনিক বাংলা দেশ যে একালে একজন বিশ্ববিশ্রুত গীতিকবিতা লেখকের জন্মদান করতে পেরেছে এ ঘটনাটিও বিশেষভাবে তার সাহায্য করেছে নিশ্চয়। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য কবিযশ পাশ্চাত্য-দেশে ব্যাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার কোনো কোনো গুণিজন (যেমন ইয়েটস্) প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য অনুমান করেছিলেন। তাই গীতাঞ্জলি নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে ইয়েটস্ একদিন রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন 'আপনার এই যে কাব্য আজ আমাদের গোচর হলো একে বাংলা সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখছি, কিন্তু বস্তুত এতো বিচ্ছিন্ন নয়,—যে একটি বৃহৎ ভূমিকার উপর এই কাব্যের বিশেষ স্থান আছে সেটি না জানতে পারলে এর রস উপলব্ধি হয়তো সম্পূর্ণ হবে না।' আধুনিক বাংলা কাব্যের পাঠকদের একথাটি বিশেষভাবে মনে রাখার মতো।

মুখ্যত মধুর ভাবের প্রেমকে অবলম্বন ক'রে পদ রচনা করলেও পদকর্তাগণ তাকে নানা প্রধান অবস্থার (যেমন পূর্বরাগ, অভিসার, বিরহ, মিলন) মধ্যে ফেলে আবার সে সকলের অন্তর্গত দশা বৈচিত্র্যের (যেমন, পূর্বরাগের—মৌন, মৌনভঙ্গ, স্বপ্ন-দর্শন, চিত্রপট-দর্শন, সাক্ষাৎ-দর্শন, অভিসারের উৎকণ্ঠা, তিমিরাভিসার, বর্ষাকালের দিবাভিসার, গ্রীষ্মকালের দিবাভিসার, হিমাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, তীর্থযাত্রাভিসার, উন্মত্তাভিসার ইত্যাদি, বিরহের-চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু, ইত্যাদি) বর্ণনা ক'রে কবিতার বিষয়ে অভিনবত্ব সঞ্চার করেছেন।

বৈষ্ণব পদাবলী প্রাচীন বাংলা গীতিকবিতার এক প্রধান ভাণ্ডার হলেও সেকালের সাহিত্যে যে অন্য গীতিকবিতার সন্ধান পাওয়া যায় না তা নয়। তৎকালে রচিত নানা আখ্যান কাব্যের মাঝে মাঝেও এ শ্রেণীর কবিতার সাক্ষাৎ মেলে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে দেবীর নিকট ফুল্লরার দারিদ্র্য বর্ণন, গোপীচন্দ্রের গানে ও ময়নামতীর গানে সন্ন্যাস গ্রহণে উন্মুখ গোপীচন্দ্রের নিকট তাঁর রানীর অনুগমন প্রার্থনা, এ সকলকে গীতি কবিতার পর্যায়ে ফেলা চলে। বৈষ্ণব-পদাবলীর ও আখ্যানকাব্যের যুগ কাটিয়ে আমরা গীতিকবিতার সন্ধান পাই সাধক কবি রামপ্রসাদে। তাঁর এবং তাঁর অনুগামী শাক্ত পদ রচনাকারীদের মধ্যে বাংলা গীতি

কাব্যের যে বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় এর কিয়দংশে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব থাকলেও তা নিতান্ত অভিনবত্ব-বর্জিত নয়। তাঁর সমকালিক ভারতচন্দ্র সম্বন্ধেও প্রায় সে কথা বলা যায়। এ দুজনের কেউই প্রথম শ্রেণীর গীতিকাব্য লিখে যেতে পারেন নি। আধুনিক কালের কোনো কোনো পাঁচালীকার যাত্রাওয়ালা এবং কবিওয়ালার (যেমন দাশরথি, কৃষ্ণকমল, শ্রীধর কথক আদি) রচিত গানের মধ্যে গীতিকবিতার আভাস দেখতে পাওয়া যায়। তবে এ সকল পদ্যে অনুপ্রাস যমকের ছড়াছড়ি-বশত বা বৈষ্ণব পদের অনুকরণ হেতু এ পরিমাণ কৃত্রিমতা দেখা দিয়েছে যে এদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত গীতিকাব্যের রস পাওয়া দুঃসাধ্য। এ সত্ত্বেও কোনো কোনো গীত-রচয়িতার লেখার মাঝে মাঝে উচ্চ শ্রেণীর ভাবগম্ভীর গীতি-কবিতার ছিটে-ফোঁটা পাওয়া যায়। যেমন, নিধুবাবুর—

> সাধিলে করিব মান কত মনে করি।
> দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাশরি॥

এই দুই ছত্রে তিনি প্রেমের যে গভীরতা প্রকাশ করেছেন তার সঙ্গে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-পদকারদের সৃষ্টির তুলনা হতে পারে। রাম বসুর দু'একটি গান সম্বন্ধেও ঠিক একথা বলা যায়। যেমন,

> মনে রইল সই মনের বেদনা।
> প্রবাসে যখন যায় গো সে
> তারে বলি বলি বলা হল না। ইত্যাদি

শ্রীধর কথকের রচিত—

> ভালবাসিবে ব'লে, ভালবাসিনে।
> আমার সে ভালবাসা, তোমা বই জানিনে॥

ইত্যাদি গানটিতেও ভাবগত সৌন্দর্য বর্তমান।

অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন অথচ প্রাগাধুনিক যুগের বা সেই ধারায় রচিত যে গীতি-কবিতাগুলির কথা উপরে বলা হ'ল সেগুলির গুণ কিছু কিছু থাকলেও তারা সাহিত্যিক রূপের (form) দিক দিয়ে বড়ই দীন। অবশ্য এজন্যে তাদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কারণ সেগুলি মুখ্যত সাহিত্য হিসাবে রচিত নয়। সুরের বাহন হিসাবেই তাদের অস্তিত্ব। এজন্য তাদের মধ্যে ছন্দের ও ভাষার ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়।

বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে নানা উপভাষায় (যথা ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর আদির চল্‌তি-ভাষায়) রচিত লোকগাথাগুলির (folk-poems) মাঝে কখনো কখনো উত্তম

গীতি-কবিতার সন্ধান মেলে। দীনেশচন্দ্র সেন এই সকল গাথাকে খুব প্রাচীন মনে করলেও অন্তত বর্তমান রূপে (যে রূপে উক্ত সেন মহাশয় সেগুলিকে প্রকাশ করেছেন) এরা দেড়শ দু'শ' বছরের বেশি প্রাচীন নয়। কাজেই কবিওয়ালা এবং পাঁচালীকারদের রচনার সঙ্গেই তাদের আলোচনা হওয়া উচিত। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র অন্তর্গত 'কঙ্ক ও লীলা' (নয়ান চাঁদ ঘোষ) নামক গাথায় লীলার বিলাপ, 'চন্দ্রাবতী' (নয়ান চাঁদ ঘোষ) গাথায় জয়চন্দ্রের বিদায়বাণী, 'কমলা' (দ্বিজ ঈশান) নামক গাথায় প্রদীপ কুমারের প্রেম নিবেদন আদি গীতি-কবিতা ব'লে গণ্য হতে পারে। ছন্দের ত্রুটি ও অমার্জিত উপভাষার শব্দমিশ্রণের কথা বাদ দিলে এগুলিকে উচ্চ শ্রেণীর গীতি-কবিতা বলা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

গীতি-কবিতা (২)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যেসকল গীতি-কবিতা রচিত হয়েছে তাদের পশ্চাতে আছে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব। একাজে অগ্রণী হলেন মাইকেল মধুসূদন। তিনি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' নামে যে গীতিকবিতা সমূহ রচনা করেন তাদের আদর্শ যে পাশ্চাত্য গীতিকবিতা, উক্ত কবিতাগুলির ছন্দ, অলঙ্কার ও ভাব, বিশেষত স্তবকবন্ধ দেখলেই তা ধরা পড়ে। তবু এ সকলের মধ্যে কেউ কেউ বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব কল্পনা করেছেন ; কিন্তু উক্ত পদাবলীর আন্তরিকতা ও গভীরতা এ গুলিতে অনুপস্থিত। এক বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য কিছুর জন্যে যে তিনি বৈষ্ণব কবিদের কাছে ঋণী তা মনে হয় না। তাঁর 'মেঘনাদ-বধ' কাব্যের মাঝে মাঝে যে গীতি-কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা আগেই বলা হয়েছে, কিন্তু বাংলা কাব্য-ভাণ্ডারে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান গীতিকবিতার 'সনেট' (sonnet) বা 'চতুর্দশপদী' রূপ। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায় এটিও পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে অনুকৃত।

পয়ার ছন্দে চৌদ্দটি ছত্রে রচিত হয় সনেট। এতে অন্ত্যানুপ্রাস বা মিলের খুব বাঁধাবাধি নিয়ম আছে।* কিন্তু সনেটে মিলের এ বাঁধাধরা নিয়ম সবাই বিশেষ মেনে চলেন নি। রবীন্দ্রনাথ চৌদ্দ ছত্রের পয়ারেই সনেট রচনা করেছেন।

* বিশুদ্ধ চতুর্দশপদীতে দুটি ভাগ থাকে :—৮ ছত্রের ও ৬ ছত্রের। প্রথম ভাগের মিল অ ই ই অ অ ই ই অ এরূপ আদর্শের হওয়া প্রয়োজন ; শেষের ভাগে উ এ উ এ উ এ এই আদর্শে।

এরকম বাঁধাবাঁধির মধ্যে কোন হৃদ্‌গত ভাবকে সফল ভাবে রূপ দেওয়া শক্ত কাজ। দিতে পারলে তা খুব উচ্চ শ্রেণীর শিল্প ব'লে গণ্য হয়।

মাইকেলের সনেটগুলির মধ্যে কতকগুলি নিঃসন্দেহ-ভাবে উত্তম গীতিকবিতার পর্যায়ে পড়ে। এ গুলি ছাড়াও তাঁর 'আত্মবিলাপ' ('আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়') ইত্যাদি রচনা উচ্চশ্রেণীর গীতি-কবিতা। কিন্তু এসকল কৃতিত্ব সত্ত্বেও মাইকেল মধুসূদন বাংলা গীতিকাব্যের নিজস্ব সুরটুকু ধরতে পারেন নি। তিনি অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের বেশি বেশি প্রয়োগ করেছেন ব'লে তাঁর গীতি-কবিতাগুলি একটু ভারিক্কি রকমের, তাতে ভাষার বা ভাবের তেমন মর্মস্পর্শিতা নেই, আর এই মর্মস্পর্শিতা প্রচুর পরিমাণে না থাকলে কোনো গীতিকবিতা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে না।

বাংলা কাব্যে অভিনব গীতিকবিতার প্রবর্তন করলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। ইনিও মাইকেলের মতো ইংরেজী কাব্যধারার অনুগামী। ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিদের প্রভাব তাঁর উপর বেশ স্পষ্ট। তিনি যে স্বরচিত গীতিকবিতায় বেশ একটি আন্তরিকতা ও মর্মস্পর্শিতার ভাব আমদানী করতে পেরেছিলেন তার কারণ শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর উদারতা। তাঁর কবিতার ভাবগুলি যেমন সহজ সরল প্রাণের আবেগ থেকে উদ্ভূত তিনি তাদের তেমনি সহজ সরল অকৃত্রিম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। যে ভাষা আশে পাশে ব্যবহৃত হ'ত নিজের ভাবগুলিকে প্রকাশ করবার জন্যে তিনি সে ভাষাকে ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি। তার ফলে খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে প্রচুর খাঁটি বাংলা বা প্রাকৃত শব্দ তাঁর রচনায়ই একালে প্রথম দেখা যায়। কিন্তু কেবল প্রাকৃত শব্দের অকুণ্ঠিত প্রয়োগে নয়, সংস্কৃত শব্দেরও বেশ নিপুণ প্রয়োগের দ্বারা তিনি তাঁর গীতিকবিতাকে উপাদেয় ক'রে তুলেছিলেন। খাঁটি বাংলা শব্দের সঙ্গে যে সকল সংস্কৃত শব্দের ধ্বনিগত সাম্য আছে, ঠিক সেগুলিকেই বেছে বেছে প্রয়োগ করায় তাঁর শব্দপ্রয়োগ শ্রুতিকটু না হয়ে শ্রুতিমাধুর্যেরই কারণ হয়েছিল।

নিচে তাঁর রচনার কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করা হ'ল। গভীর-নিশীথে সমস্ত জগৎ যখন নিদ্রামগ্ন তখন চাঁদকে সম্বোধন ক'রে তিনি বলছেন :

জন্মিতে দেখেছ তুমি ব্যাস বাল্মীকিরে,
কিরণ দিয়েছ সেই পর্ণের কুটিরে।
তপোবনে ছেলে দুটি,
কচি মুখে হাসি ফুটি
জননীর কোলে বসি দেখিত তোমায়।

কি যে সে কহিত বাণী
জানে তাহা ফুলরাণী
জাগে যাহা প্রতিধ্বনি অমর গাথায়॥

কবি তাঁর প্রিয়তমাকে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন :—

জীবন জুড়ান ধন হৃদি ফুলহার
মধুর মুরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সম্মুখে সে মুখখানি জাগে অনিবার।
কি জানি কি ঘুমঘোরে
কি চোখে দেখেছি তোরে
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।

উল্লিখিত কবিতাংশ দুটি থেকেই বিহারীলালের ছন্দ-কৌশল সুশ্রব্যতার জ্ঞান ও আন্তরিকতার পরিচয় পাই। কিন্তু তাঁর নিজের কালে তিনি এজন্যে যথোচিত সমাদর পান নি। কারণ মধুসূদন এবং তাঁর অনুবর্তীদের সংস্কৃতবহুল গুরুগম্ভীর রচনার বিশেষত তথাকথিত মহাকাব্যের মোহে তখন বঙ্গীয় পাঠককুল মুগ্ধ। কিন্তু এ সত্ত্বেও বাংলা কাব্যের ইতিহাসে বিহারীলালের 'স্থান অতুল্য ও দান অমূল্য'। সুশ্রব্যতাজ্ঞান ও আন্তরিকতার সঙ্গে আর একটি জিনিষ বিহারীলালের কবিতাকে উৎকর্ষ দান ক'রে গেছে। সে হচ্ছে তাঁর বিষয়-নির্বাচন এবং দৃষ্টিভঙ্গী। এতদিন বাংলা সাহিত্যে হয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম নয়ত ব্যক্তিগত প্রেমের ব্যাপার নিয়েই অধিকাংশ গীতিকবিতা রচিত হয়ে এসেছিল। মাইকেলই এ ধারার খণ্ডন ক'রে সফলভাবে পথিকৃতের কাজ ক'রে গেছেন। তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাগুলি এ বিষয়ের সাক্ষ্য, কিন্তু এগুলি ভাবগম্ভীর এবং নিখুঁত রচনা হলেও তেমন ক'রে প্রাণকে স্পর্শ করে না। এদিক দিয়ে বিশেষ কৃতী হলেন বিহারীলাল। তাঁর কবিচিত্ত ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিদের মতো গতানুগতিকতার মোহ থেকে মুক্ত। তাই তিনি যে সারদার মঙ্গলগীতি গেয়েছেন সে সারদা ঠিক সরস্বতী নন। তিনি তাঁর কল্পনার চোখে দেখা এক নূতন দেবী, যিনি একাধারে সৌন্দর্য-স্বরূপিণী লক্ষ্মী আর বাক্‌স্বরূপিণী সরস্বতী এবং তদুপরি কবির সাধনাস্বরূপিণী হৃদয়-প্রতিমা। এরূপ অপূর্ব কল্পনা, শ্রুতিমধুর ভাষা ও বিচিত্র ছন্দ নিয়ে বিহারীলাল যে কবিতা লিখে গেছেন তাই আধুনিক বাংলা গীতি-কবিতাকে নব প্রেরণা দান করেছে। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক অন্য কবিগণ (যেমন, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৮৩৭-১৮৭৮ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৮-১৯০৩, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ১৮৩৮-১৯০৭) তাঁদের

রচনায় বিহারীলালের মতো ভাবানুকূল ভাষা ও অভিনব কল্পনার ঐশ্বর্য প্রকাশ করতে পারেন নি। প্রায়শ নীতি-উপদেশ ও দার্শনিক চিন্তাদি তাঁদের প্রিয় ছিল, কিন্তু এসব জিনিষ নিয়ে উচ্চ-শ্রেণীর গীতিকবিতা রচিত হওয়া সম্ভবপর হয় নি।

বিহারীলালের বয়োজ্যেষ্ঠ কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও এখানে উল্লেখ করা উচিত। তাঁর 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়' ইত্যাদি রচনা বাংলা গীতিকাব্যকে নূতন বিষয় দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে। ইংরেজী সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত কবিদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সর্বাগ্রে এমন স্পষ্টভাবে দেশপ্রেমকে গানে প্রকাশ করেছিলেন।

বিহারীলাল নিজের কালে সর্বজনীন সমাদর না পেলেও তাঁর কাব্যের অনুরাগী একটি দল (তা যতই ছোট হোক) ছিল। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) ও অক্ষয়কুমার বড়ালের (১৮৬০—১৯১৯) নামই বিশেষভাবে পরিচিত। অক্ষয়কুমার বিহারীলালের কবিত্বে মুগ্ধ হলেও তাঁর প্রভাবকে কাব্যে তেমন ভাবে স্বীকার করেন নি। কেবল তাঁর কোনো কোনো গীতি-কবিতায় বিহারীলালের সরল ভাষা লক্ষ্য-গোচর হয়। যেমন তাঁর 'সন্ধ্যা' নামক কবিতাটীর একটি স্তবকে যখন পড়ি

দূরে সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী,
সুনীল বসনে ঢাকি' ফুল তনুখানি।
তরল গুণ্ঠন আড়ে
মুখশশী উঁকি মারে ;
সরমে উছলি পড়ে কত প্রেমবাণী॥

তখন মনে হয় বিহারীলালের ভাষাই পড়ছি; ছন্দোবন্ধেও অক্ষয়কুমার তাঁর অনুকারী, কিন্তু কল্পনা-সম্ভার এবং আদর্শের দিক দিয়ে অক্ষয়কুমার স্বতন্ত্র; বিহারীলালের কল্পনার বলিষ্ঠতা ও ক্ষিপ্র গতি তাঁর গীতিকবিতায় প্রায় দুর্লভ। তাঁর কিঞ্চিৎ পরবর্তী মহিলা কবি কামিনী রায় (১৮৬৪—১৯৩৩) সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। তবে এঁর ভাষাটি ছিল প্রায়শ খুব মোলায়েম ও সাদাসিধে। এরি জন্মে তাঁর কোনো কোনো ছত্র বেশ মিষ্টি বোধ হয়। যেমন,

দু'খানি সুগোল বাহু দু'খানি কোমল কর,
স্নেহ যেন দেহ ধরি' সেথায় বেঁধেছে ঘর ;
রূপ আদি কাছে টানে, গুণে বেঁধে রাখে হিয়া,
আমারে সে ডাকিতেছে যেন হাতছানি দিয়া।

আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। বিহারীলালের কাব্যে ভাষার ছন্দের ও ভাবের যা কিছু চমৎকারিত্ব, তার পশ্চাতে ছিল ইংরেজী রোম্যান্টিক কাব্য সাহিত্য। তাঁর সাহিত্যিক মহত্ব অস্বীকার না ক'রেও বলা যায় যে, তাঁর প্রতিভা রচনার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু তিনি যে কাব্যধারা বাংলা দেশে প্রবর্তিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা পেলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। সেজন্যে তিনি নবপ্রবর্তিত গীতিকবিতা রচনার ধারাকে স্বীয় লোকোত্তর প্রতিভাবলে এমন এক উৎকর্ষ দান করতে পেরেছেন যা দেখে কখনো কখনো মনে হয় যে, বাংলা গীতিকবিতার চরম উন্নতি হয়ে গেছে। বাংলা কাব্য-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে যেন যুগান্তর উপস্থিত হয়েছে। তাঁর কাব্য-সাধনার এক প্রধান লক্ষণ: যা কিছু আদর্শ, যা কিছু বিস্ময়কর, এবং যা কিছু রহস্যময় তার সম্বন্ধে এক অদম্য কৌতূহল। এ কৌতূহলের মূলে ছিল মানবীয় স্বাধীনতার দাবী, যে রাষ্ট্রীয় সামাজিক বা ধর্ম সাধন সম্পর্কীয় বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল মানুষকে স্বাভাবিক বিকাশের পথে এগুতে বাধা দিচ্ছে তাকে ভাঙবার দাবী, এবং কি জীবনে, কি কাব্যে মানুষের বিধিদত্ত ক্ষমতাকে নিজ বুদ্ধিতে স্বাধীনভাবে সফল ক'রে তোলবার দাবী।

সমসাময়িক বাংলার নানাবিধ কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে নানাপ্রকার স্বাধীনতার আন্দোলন চল্‌ছিল; তারই ফলে যেন ঘটল বাংলা গীতিকবিতার পুনর্জন্ম প্রাপ্তি। বৈষ্ণব-পদাবলী যুগের পর এমন গীতিকবিতার সমারোহ আর দেখা যায় নি। গীতিকবিতার এই আকস্মিক অভ্যুত্থানকে বুঝতে হ'লে তার ইতিহাসটির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী নানা দুঃখকষ্টের মধ্যেও মোটামুটি তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছিল। নবাগত ইংরেজ রাজশক্তির আশ্রয়ে যে নূতন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গ'ড়ে উঠছিল তারা তখন প্রভুশক্তির ছত্রচ্ছায়ায় মোটামুটি শান্তিতে বাস করছিল; তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ, তাদের জীবনে কোন জটিল বা দুর্ভাবনাময় প্রশ্ন ছিল না। এজন্যে সাহিত্যে ও ধর্মাদির চর্চায় সেকালের লোকেরা ছিলেন বহুল পরিমাণে রক্ষণশীল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও যৌবনকালে—যখনকার পারিপার্শ্বিক ঘটনা-নিচয় তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভাকে নিশ্চিতরূপে সন্ধুক্ষিত ও প্রভাবিত করেছে—বাংলার সমাজ-ধর্ম ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তুমুল বিপ্লব চল্‌ছিল। সে ইতিহাস সবিস্তারে বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে। এ বিপ্লবযুগের দেবতাই বাংলা গীতিকাব্যের পুনর্জন্ম দান করেছেন। এই পুনর্জন্মই রবীন্দ্রনাথের অন্যূন অর্ধশতাব্দীব্যাপী সাধনার ফলে লোকচক্ষুর গোচরে এসেছে। তার 'প্রভাত সঙ্গীত' (১৮৮৩) গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নবীন বাংলা গীতিকাব্যের

সুপ্রভাত হ'ল। ক্রমশ 'মানসী'তে (১৮৯১) ও 'সোনার তরী'তে (১৮৯৫) এ কাব্যের নবজীবন অপূর্ব বর্ণ-শব্দ-সুষমায় বাংলা দেশকে উজ্জ্বল ক'রল। 'ক্ষণিকা' (১৯০০) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার এক যুগ পরিবর্তন হ'ল। মানবীয় সুখ দুঃখের, ভাব ও কল্পনার যে উদ্দাম আবেগ তাঁকে নানা বিচিত্র ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়েছিল বাংলা গীতিকবিতা তার থেকে অপূর্ব রূপ-বৈচিত্র্য ও রস-সমৃদ্ধি লাভ করল। এ পর্যন্ত রচনার পরই যদি রবীন্দ্রনাথের লেখনী বিশ্রামলাভ করত তবু তাঁকে বাংলার (তথা ভারতের) যুগান্তরকারী গীতিকবিতার স্রষ্টা ব'লে মনে করা চলত। কিন্তু দেশের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তখন তাঁর অলোকসামান্য কবিপ্রতিভার মধ্যাহ্নের প্রাক্‌কাল মাত্র। এবার তাঁর বীণায় যে নূতন সুর উঠ্‌ল তা বাংলা গীতিকাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করল ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার রসধারা। এ রস যে, লৌকিক কবিতার মধ্যে, তথা লৌকিক গীতিকবিতার মধ্যে লৌকিক ভাষায় প্রকাশ করা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' (১৯০১) 'খেয়া', (১৯০৬) 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) আদি প্রকাশের আগে তা কেউ ভাবতে পারে নি। এ সকল রচনা পড়লে মনে হয় এগুলিতে হয়ত বৈষ্ণব-পদাবলী বা উপনিষদের খানিক প্রভাব আছে, কিন্তু নিপুণভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় সে প্রভাব ধরা ছোঁয়ার অতীত। শুধু তাতে এই বোঝা যায় দেশের যে আবহমান কাব্য-ধারায় উপনিষৎ বা বৈষ্ণব-পদাবলী রচিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরাধিকারী ব'লেই উক্ত প্রভাবের কথা মনে হয়। ভারতীয় সাধনার যে বিশ্বজনীন দিক আছে, সে দিকটা বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের রচনায় ফুটেছিল বলে তাঁর এ যুগের কতিপয় কবিতার অনুবাদ (যা 'গীতাঞ্জলি' নামে ১৯১২ সালে বিলাতে ছাপা হয়) পাশ্চাত্য কাব্যরসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এর ফলে বঙ্গবাণী সমাদৃত হলেন বিশ্ববাণীর পূজারীগণের সভায়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকের মহার্ঘতম সম্মান 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করলেন (১৯১৩)। এ সবই তাঁর জীবনের ৫২ বছরের মধ্যে ঘট্‌ল। তারপর তিনি যে পঁচিশ বছরের উপর বেঁচে ছিলেন তাঁর কবিতা রচনা বন্ধ হয় নি; মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি কবিতা রচনা ক'রে গেছেন এবং তাঁর শেষের দিকের কবিতাগুলির মধ্যেও উচ্চাঙ্গের গীতিকবিতা বিরল নয়।

রবীন্দ্রনাথ যেমন মানসিক, হৃদয়গত ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার নানা স্তর থেকে তাঁর কবিতার বিষয় সংগ্রহ করেছিলেন, তেমনি সে সকলকে প্রকাশ করবার জন্যে তাঁকে নানা রকম পদ্যরূপের (verse-form) সাহায্য নিতে হয়েছিল। মাইকেল অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তক হয়েও সমিল পদ্যকে অবহেলা করেন নি; তাঁর

'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ও অন্য কয়েকটি ভালো কবিতা মিলযুক্ত পদ্যে রচিত। আর মিলযুক্ত কবিতায় স্তবকবন্ধও বোধ হয় তিনিই সর্বাগ্রে প্রবর্তিত করেন; কিন্তু এসকল সত্ত্বেও মাইকেলের ব্যবহৃত পদ্যরূপ খুব স্বল্পসংখ্যক। হেমচন্দ্র বা বিহারীলাল আদির পদ্যরূপও বেশি-সংখ্যক নয়। এ দিক দিয়ে বাংলা গীতি-কাব্যকে নূতন ঐশ্বর্য দান করলেন রবীন্দ্রনাথ। বৈষ্ণবপদাবলীতে বাঁধাধরা কয়েকটি ছন্দ মাত্র ছিল; বাংলা লৌকিক গান আদিরও ছিল তাই। মোটামুটি তৎকালীন 'প্রেম'-মাত্র সম্বল গীতিকবিদের ছন্দের পুঁজিও ছিল সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতায় একদিকে যেমন প্রাকৃতিক ও পার্থিব নানা সৌন্দর্যের উদাত্ত প্রশস্তি, নরনারীর হৃদ্গত নানা সুকুমার ভাবের রসোদ্বোধক প্রকাশ, এবং কল্পনাযন্ত্রে পরিস্রুত কল্প-লোকের আনন্দ ধারা, অপর দিকে তেমনি সামাজিক রাজনৈতিক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভাবনা ও সমস্যা সমূহের কবিসুলভ রূপদান। এরকম বিবিধ ও বিচিত্র বিষয় বস্তুর প্রকাশের জন্য যে তদনুরূপ বিবিধ ও বিচিত্র পদ্যরূপের প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতার রূপবৈচিত্র্যের সবিস্তার আলোচনা এখানে করা নিষ্প্রয়োজন; তাঁর 'চয়নিকা' 'সঞ্চয়িতা' আদি যে কোন সংগ্রহ-গ্রন্থ পড়লেই এ বিষয়ের প্রমাণ মিলবে। তাতেই দেখা যাবে কত বিচিত্র রকমের ছন্দে ও স্তবকবন্ধে তিনি কবিতা লিখে গেছেন। ছন্দ সৃষ্টি করতেও তাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। আগেই বলা হয়েছে যে, মাইকেল প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে মিলযুক্ত প্রবহমান পয়ার সৃষ্টি ক'রে তিনি কেমন অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'বলাকা' প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যবহৃত অসমান চরণের ছন্দ-ব্যবহার ক'রে তিনি যেমন জোরালো গীতি কবিতা রচনা করেছেন তাও লক্ষ্য করবার মতো। রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার বিষয়বস্তু বা ভাবাবেগ যেন আপনিই তার পদ্যরূপটি নির্দিষ্ট ক'রে দেয়। রবীন্দ্রকাব্যের কল্পনাগত ঐশ্বর্যও তাঁর কবিচিত্তের প্রখর আবেগ-চাঞ্চল্যের প্রতীক। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিতে কবি যে তীব্র হৃদয়াবেগ নিয়ে আরম্ভ করেছিলেন নিজ কর্তব্যের এবং আদর্শের কথা স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে তা এক অপূর্ব শান্তরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'বসুন্ধরা' ও 'সোনার তরী' কবিতায় পৃথ্বীর মানস-প্রদক্ষিণ শেষ ক'রে যেই তিনি তার প্রত্নযুগের ইতিহাসের দিকে কল্পনাকে প্রসারিত ক'রে আপনাকে তার সঙ্গে একীভূত দেখছেন তখনও তাঁর হৃদয়াবেগ দ্রুত গতিতে এক অপূর্ব আনন্দরসে পরিবর্তিত হয়েছে। এবং এরূপ বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিচিত্র বর্ণ ও সুষমাভরা কল্পনার চিত্ররাজী এঁকে কবি তাঁর ভাবকে রূপদান করেছেন। রবীন্দ্র-কাব্যে স্বাভাবিক প্রেরণার সঙ্গে কলাকৌশল মেলাবার আশ্চর্য শক্তি দেখতে পাওয়া যায়। এ অদ্বিতীয় শক্তিটিরই

বলে ঠিক যথাযোগ্য বিশেষণগুলি চটপট্ কবির মনে উদয় হয় এবং ছন্দ বর্ণ যোগে সুষমা বিচার ক'রে তিনি তাদের ব্যবহার করেন।

রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা গীতি-কবিতা যে এমন অচিন্ত্যপূর্ব ঐশ্বর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল তার এক প্রধান কারণ তাঁর অনবদ্য ভাষা। এ বিষয়ে তিনি খানিকটে ইঙ্গিত লাভ করেছিলেন তাঁর গুরু বিহারীলাল থেকে। বিহারীলাল যে, ভাষার ক্ষেত্রে কতকটা স্বাভাবিকতার পক্ষপাতী ছিলেন তা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর অনুসরণে গ'ড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতার বচনভঙ্গী (poetic diction)। তাই আরম্ভ থেকেই তাঁর কবিতায় নিপুণ পদলালিত্যের সঙ্গে অভিধেয়ার্থের একটা অসাধারণ স্বচ্ছতা বর্তমান। সেকালের 'বিশাল রসাল' সংস্কৃত শব্দ ও সমাস পড়তে অভ্যস্ত সমালোচকগণ তাই রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত হালকা চালের ছন্দের মতো তাঁর কবিতার ভাষাকে দেখেও বিদ্রূপ না ক'রে পারেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিত্বের অন্যান্য বিশেষত্বের ন্যায় ভাষার ব্যবহারেও যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা বিস্মিতচিত্তে পুনঃপুন লক্ষ্য করবার মতো। সংস্কৃত ভাষার শব্দে প্রায়শ যে একটা ধ্বনি-গাম্ভীর্য ও মহিমা আছে তা খাঁটি বাংলা (তদ্ভব বা দেশী) শব্দে কদাচিৎ পাওয়া যায়। আর নিত্যব্যবহৃত মুখের বুলিতে যে একটা ছলাকলাহীন মনভোলানো ভাব আছে দিব্যি পরিপাটি ও সুমার্জিত সংস্কৃত শব্দে তা প্রায়ই মেলে না। রবীন্দ্র-নাথের আগে বৈষ্ণব-কবিদের দুয়েকজন ছাড়া এ সত্যটি তেমন ক'রে কেউ বুঝতে পারেন নি। এ পরম সত্যটি তাঁর কবিচিত্তে প্রতিভাত হয়েছিল ব'লেই তাঁর কবিতা ও গান বাংলা দেশকে এমন ক'রে মুগ্ধ করতে পেরেছে। ভাষা প্রয়োগের ঔচিত্যবোধ থাকাতেই তিনি 'বধূ' কবিতায় একেবারে খাঁটি বাংলা কথায় লিখেছেন :—

> হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে।
> প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে।
> আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে
> যেন সে ভালোবেসে চাহে আমারে!

এতে এমন একটি শব্দও নেই নিত্যকার কথাবার্তায় ব্যবহার করলে যা বেমানান ঠেকবে। কিন্তু 'উৎসর্গে' একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন :—

> তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্ত সঞ্চিত
> তপস্যার মত। স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমাঞ্চিত
> নিবিড় নিগূঢ়ভাবে পথশূন্য তোমার নির্জ্জনে
> নিষ্কলঙ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবিসর্জ্জনে।

এতে খাঁটি বাংলা শব্দের সঙ্গে কবি এমন সংস্কৃত কথা, এমন কি সমাসবদ্ধ কথাও জুড়ে দিয়েছেন যা চলতি কথাবার্তায় ব্যবহার করলে অদ্ভুত ঠেকবে কিন্তু হিমালয়ের সেই শান্ত গম্ভীর পরিচ্ছন্ন ভাবটির আভাস আনবার জন্যে ঐ সংস্কৃত কথা কয়টি ব্যবহার করা দরকার ছিল। কবি এমন নিপুণতার সঙ্গে এই কথা ক'টিকে এনেছেন যে তারা বাংলা শব্দের সঙ্গে মিলে পদ্যাংশটিকে বেশ চমৎকার ভাবে শ্রুতিমধুর ক'রে তুলেছে। কি ভাষায় কি ছন্দে কি ভাবে কি কল্পনা-প্রসূত চিত্রসম্ভারে (imagery) রবীন্দ্রনাথ বাংলা গীতি-কাব্যকে এক অজস্র বিপুলতা ও বৈচিত্র্য দান ক'রে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত গীতি-কবিতার নব্য ধারা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২) বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে অনুসরণ ক'রে গেছেন। যে উদ্দাম হৃদয়াবেগ থেকে সাধারণত কবিতার (বিশেষ করে গীতি-কবিতার) জন্ম তার অধিকারী না হয়েও মানুষ কাব্য-জগতে কতটা অসাধ্য সাধন করতে পারে সত্যেন্দ্রনাথের রচনা তার এক বিস্ময়কর প্রমাণ। তিনি তাঁর সুনিপুণ ছন্দোবন্ধ, শ্রুতিসুখকর অন্ত্যানুপ্রাস (=মিল), বহুধা-বিচিত্র কল্পনা, যথাযোগ্য শব্দচয়ন আদি কৌশলের সাহায্যে স্বরচিত কবিতার উপর এক বিশেষত্বের ছাপ রেখে গেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরে কবি-কল্পনার পেছনে যে প্রায়শ রবীন্দ্রনাথের মতো হৃদয়াবেগের প্রবলতা ছিল না তার প্রমাণ পেতে হ'লে তাঁর 'তাজ' (অভ্র-আবীর) নামক কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' (বলাকা) কবিতাটি (যেটি তাজমহল নিয়ে লেখা) পড়তে হয়। তাহলে দেখা যাবে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাটিতে কবির হৃদয়াবেগ খুব চাপা। কিন্তু উদ্দাম হৃদয়াবেগের অধিকারী না হলেও সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে যতখানি হৃদয়াবেগ সম্ভবপর ছিল তাকেই তিনি প্রায়শ বেশ চমৎকার ভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের কৃতকার্যতার এক মুখ্য কারণ তাঁর ছন্দ সৃষ্টির ও ব্যবহারের প্রতিভা। এদিক দিয়ে তাঁর ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার ক'রে গেছেন। তিনি বলেছেন, "সত্যেন্দ্রনাথের মতো বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা বাংলায় খুব কমই আছে।" ছন্দের পরেই সত্যেন্দ্রনাথের ভাষার নৈপুণ্য। এ বিষয়েও তিনি গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তাজা টাটকা কল্পনার ছবি উপমা অনুপ্রাস আদিকেও মনে করতে হবে। এ সকলের দৃষ্টান্ত স্বরূপে 'প্রথম হাসি' নামক কবিতা থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করছি :—

প্রথম হাসির পান সুপারি কে দিল ওর মুখে
হাসির কাজল কে পরালে চোখে ?

হাসছে খোকা ! হাসছে একা ! হাসছে অতুল সুখে
এমন হাসি কে শিখালে ওকে ?
কলস্বরে হাসছে ! ওরে ! হাসছে আপন মনে !
দেখন-হাসি পরীর হাসি দেখে' !
খুলেছে আজ হাসির কুলুপ কোন কুঠুরীর কোণে,—
মাণিকে তাই আকাশ গেল ঢেকে' !

সত্যেন্দ্রনাথের এই কবিতাটির সঙ্গে হেমচন্দ্রের 'শিশুর হাসি' কবিতাটির তুলনা করলেই এর উৎকর্ষ সহজে ধরা পড়বে। উপরে উদ্ধৃত কবিতাটিতে সত্যেন্দ্রনাথের ব্যবহৃত সরলতম ভাষার নমুনা পাওয়া যায়। এ ছাড়াও তিনি তাঁর ভাষায় যথাযোগ্য সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার ক'রে রচনার প্রাঞ্জলতা ও সুশ্রব্যতা রাখতে পারতেন ; .নিচে তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে ; 'গঙ্গার প্রতি' কবিতায় তিনি লিখেছেন :—

অমল পরশ তোর বড় স্নিগ্ধ মাগো তোর কোল,
অন্তকালে ক্লান্তভালে বুলাও গো অমৃত-হিল্লোল।
কত জননীর নিধি সঞ্চিত রয়েছে ওই বুকে ;
তোরে স'পি পুত্র কন্যা, তোরি কোলে ঘুমাইবে সুখে
একদিন তারা সবে , দেহভার বহে প্রতীক্ষায় ,
আত্মার মিলন স্বর্গে, তোর জলে কায়ে মিলে কায়,
ভস্ম মিলে ভস্মসনে—এ মিলন প্রত্যক্ষ সাকার,
যুগে যুগে আমাদের মিলনের তুমি মা আধার।

এ কবিতাটিতেও সত্যেন্দ্রনাথ কল্পনার চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। বিভিন্ন সাহিত্য থেকে সংগৃহীত কবিতা সমূহের অনুবাদেও তিনি যে অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন সেও তাঁর শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার আর এক প্রমাণ। এ সম্বন্ধে তাঁর 'তীর্থরেণু'র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :—

তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য্য নহে, ইহা সৃষ্টিকার্য্য।

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় আর একজন রবীন্দ্রানুগ কবি হচ্ছেন অকালে পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়। তাঁর স্বল্পস্থায়ী ২২ বৎসর জীবনের মধ্যে তিনি যা কিছু লিখে গেছেন তাতে মনে হয় বেঁচে থাক্‌লে তিনি বাংলা গীতিকবিতাকে অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারতেন। তাঁর 'শেলির (Shelley) প্রতি', 'চণ্ডালী' প্রভৃতি কবিতায় যে তীব্র হৃদয়াবেগ প্রকাশ পেয়েছে সেই থেকেই তাঁর বিরাট ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আন্দাজ করা যায়। অকালে মৃত এই কবি আমাদের মনে ইংরেজ কবি

কীট্সের কথা জাগিয়ে দেয়। অকালমৃত সত্যেন্দ্রনাথ ও সতীশচন্দ্রের পরেই যে দুয়েকজনের নাম করা উচিত তাঁদের মধ্যে নজরুল ইস্লাম লোকপ্রিয়তায় বোধ হয় সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর কাব্যসৃষ্টি বিশ্রামলাভ করেছে এজন্যে সে সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা যেতে পারে। বাংলা গীতিকবিতায় এঁর নিজস্ব দান একান্ত নগণ্য নয়। তাঁর মধ্যে গীতিকবি-সুলভ বলিষ্ঠ হৃদয়াবেগ আছে যার জন্যে তাঁর কবিতা অল্পকালের মধ্যে বাংলা দেশে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পেরেছিল। তাঁর ছন্দ মিল ভাষা ও কল্পনা-নৈপুণ্য সবই প্রশংসার্হ। এ সকল দিক দিয়ে তাঁকে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাঁর কাব্যে এ শেষোক্ত কবির প্রভাব সহজেই ধরা পড়ে। তবু হৃদয়াবেগের তীব্রতায় তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়েছেন। তাঁর কবিতাগুলিই এ কথার প্রমাণ।

বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অনেক কবি গীতিকবিতার সাধনায় রত আছেন। কিন্তু তাঁদের কাব্য সম্বন্ধে নিরপেক্ষ আলোচনার বাধা এই যে তাঁরা এখনো সৃষ্টিকার্যে ব্যাপৃত আছেন, কিন্তু এ বাধা সত্ত্বেও আধুনিক কবিতার আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে যদি আমরা জীবিত কবিদের রচিত গীতিকবিতার ঐশ্বর্যের প্রতি উদাসীন থাকি। কবির দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য অনুসারে যত বিভিন্নপ্রকারে সম্ভব এই কাব্য-সঞ্চয় সৃষ্ট হয়েছে। এ সকল রচনায় দু'রকমের ঝোঁক (tendency) লক্ষ্য করা যায়। প্রথম হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত গীতিকবিতার রূপ, রস ও ভাষার অনুসরণে সেই সকল ভাব ও চিন্তার প্রকাশের অনুশীলন যেগুলি আমাদেরি কালের মতো সর্বকালেরই অভিজ্ঞতার বিষয়। দ্বিতীয় হচ্ছে মুখ্যত সাম্প্রতিক ইংরেজী গীতিকবিতার অনুসরণে যুগোচিতভাবে ও রূপে কবিদের আত্মপ্রকাশের চেষ্টা। এতে যে শুধু স্বকীয় কালের রঙ্ থাকবে এঁরা তাতেই সন্তুষ্ট নন; তাঁরা চান যে তাঁদের কবিতা হবে একালকার সংঘাতবহুল জীবনের প্রতীক। এজন্যে তাঁদের কেউ কেউ নিয়মিত ছন্দোবন্ধ, মিল আদিকে গীতিকাব্যের রাজ্য থেকে একান্তভাবে নির্বাসিত ক'রে গদ্য জাতীয় ছন্দের সাধনায় রত। আগেকার দিনে যে সব উপমা তথা অন্য অলঙ্কার অনুচিত বা কবিত্ববিরোধী ব'লে গণ্য হত তাঁরা সে সকলকে চালাবার চেষ্টা করছেন। যেমন,

"টক্‌টকে টম্যাটোর মতো
লাল হয়ে শশাঙ্কশেখর
চুপ করে বসে রইল"—বুদ্ধদেব বসু

"তেঁতুল গাছের ঝিলমিল—"
"মারী কুকুরের জিভ্ দিয়ে ক্ষেত চাটা"—অমিয় চক্রবর্তী

মুখ্যত এ সকল কারণে শেষোক্ত শ্রেণীর কবিতা সাধারণ পাঠকদের চিত্ত আকর্ষণ করতে পারে নি। তবু এ নূতন কবিতাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা উচিত হবে না। নূতন যুগকে নূতনরূপে প্রকাশ করার এই চেষ্টা যে কালক্রমে বাংলা গীতিকবিতায় যথার্থ জনপ্রিয় সৌন্দর্য ও রস আনতে সমর্থ হবে না, তা জোর ক'রে বলা যায় না। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর প্রচলনের চেষ্টাও একদিন বিরুদ্ধতার উদ্রেক ক'রে ছিল।

প্রথম দলের কবিদের মধ্যে যাঁরা মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত পথে তাঁর গীতি-কবিতার ছাঁচে সর্বাঙ্গীণ অনুভূতিকে রূপদান করেছেন এমন অনেক জন আছেন। এঁদের কারুর কারুর মধ্যে আবার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাবও (বিশেষ ক'রে ছন্দ প্রয়োগের) লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের জ্ঞাতসারেই এসে থাকুক বা অজ্ঞাতসারে এসে থাকুক সেরূপ প্রভাব দেখিয়ে দেওয়া সম্ভবপর। যতীন্দ্রমোহন বাগচী, (১৮৭৮), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭); কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮),কালিদাস রায় (১৮৮৯) ইত্যাদি বর্ষীয়ান্‌গণ, এবং বহুসংখ্যক নবীন কবি প্রথমোক্ত দলের। এঁদের সকলেরই অল্পবিস্তর বৈশিষ্ট্য আছে। এঁদের কার উপর পূর্বগ বা সমসাময়িক কোন কবির প্রভাব পড়েছে, তুলনামূলক পদ্ধতিতে আলোচনা করলেই সন্ধানী পাঠক তা জানতে পারবেন। এ সত্ত্বেও এঁদের কেউই নকল-নবীশ নন। অনেকেই বিষয়নির্বাচনে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন, আর কেউ কেউ বা পূর্বপ্রচলিত পদ্ধতিকে স্বীয় ক্ষমতায় নূতনত্বের বাহন করেছেন এবং নিজ রচনার উপর বৈশিষ্ট্যের ছাপ দিয়েছেন। দ্বিতীয় দলের কবিদের সুখ্যাতি তাঁদের দলের মধ্যেই নিবদ্ধ। এঁদের রচনাকে গোঁড়ারা যদিও 'দুর্বোধ্য' ব'লে আখ্যা দেন তবু এমন অবজ্ঞার সঙ্গে তার বিচার হওয়া উচিত নয়। যাঁদের যথার্থ সাহিত্য রসের বোধ আছে তাঁরা উক্ত কবিদের রচনার স্থানে স্থানে নূতন সৌন্দর্যের ও নূতন রসের সন্ধান পেতে পারেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গীতি-কবিতা (৩)

পূর্ব অধ্যায়ে গীতিকাব্য সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হয়েছে কয়েকটি কবিতা নিয়ে সে সকলের বিচার করলে তৎসম্পর্কে ধারণা আরো সুস্পষ্ট হতে পারে। তাই নিচে (১) গীতিকবিতার গঠন, (২) গীতিকবিতার বিষয়ের সঙ্গে উক্ত

কবিতার রূপের সামঞ্জস্য, (৩) গীতিকবিতায় ব্যক্তি-মানসের প্রকাশ এ তিনটি বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্যে ছ'টি কবিতার আলোচনা করা যাচ্ছে। নিম্ন-বর্ণিত কবিতাগুলিকে এ উদ্দেশ্যে বেছে নেওয়া গেল :—

(ক) মাইকেল—আত্মবিলাপ,
(খ) রবীন্দ্রনাথ—বর্ষামঙ্গল,
(গ) " ব্যর্থযৌবন,
(ঘ) " সোনার তরী,
(ঙ) সত্যেন্দ্রনাথ—প্রথম হাসি,
(চ) " ছিন্ন-মুকুল।

বিশ্লেষণ দ্বারা কবিতাকে বুঝতে বা বোঝাতে যাওয়ার একটা বিপদ আছে; তবু তার দ্বারা কবিতার গঠনপ্রণালী আয়ত্ত ক'রে নিলে কবিতার রসাস্বাদন খানিকটে সুসাধ্য হতে পারে এ আশা নিয়ে উল্লিখিত কবিতাগুলিকে মোটামুটিভাবে বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে।

(ক) মাইকেলের 'আত্মবিলাপ' কবিতাটি সাত স্তবকে রচিত। 'আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লভিনু হায়' এই প্রথম ছত্রটিতে কবি তাঁর আসল বক্তব্যটি বলেছেন। আর প্রথম তিন স্তবকে কবি সাধারণভাবে আশা-প্রলুব্ধ চিত্তের করুণ পরিণাম এবং আশার দুর্বার আকর্ষণ জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তার পরের তিন স্তবকে তিনি ব্যক্ত করেছেন নিজের সেই দুর্দশার কথা যে দুর্দশা তিনি ভুগেছেন ক্রমান্বয়ে প্রেম, অর্থ ও যশের আকর্ষণে। সর্বশেষ স্তবকে আশায় প্রলুব্ধ হওয়ার শোচনীয় পরিণাম আবার খুব আবেগময় ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

(খ) 'বর্ষামঙ্গল' নামক কবিতাও সাতটি স্তবকে গঠিত। মেঘগর্জন-ধ্বনিত এবং বারিপাত-স্নাত বর্ষার আগমনে কবির হৃদয়ে যে আনন্দের আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তাই প্রকাশ পেয়েছে প্রথম স্তবকের বর্ষা-বর্ণনায়। তার পরের পাঁচটি স্তবকে তিনি বর্ষার যথাযোগ্য অভ্যর্থনার আহ্বান জানিয়েছেন। সর্বশেষ স্তবকে আছে বর্ষা-বর্ণনার প্রসঙ্গে কবিচিত্ত ও বর্ষার চিরন্তন নিবিড় যোগের কথা।

(গ) 'ব্যর্থ-যৌবন' কবিতাটি পাঁচটি স্তবকে গঠিত। যৌবনের প্রায়াবসান-কালে কোনো অভিসার রাত্রির ব্যর্থতায় নায়িকা যে বলছেন, "আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে" তা দিয়েই কবিতাটির আরম্ভ। সেই সঙ্গে প্রথম দু'স্তবকে তার প্রবল নির্বেদের প্রকাশ এবং প্রায় সমগ্র প্রথম ছত্রটির পুনরাবৃত্তির পর স্তবক শেষ। এই পুনরাবৃত্তি প্রত্যেক স্তবকের শেষেই ঘটেছে। তার ফলে কবিতাটির মর্মকথা বেশ দৃঢ়ভাবে শ্রোতার চিত্তে মুদ্রিত হবার সুবিধা পায়।

প্রেমাস্পদকে লাভ করবার যে প্রত্যাশা নায়িকার মনে জেগেছিল তাই প্রকাশলাভ করেছে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে। উল্লিখিত পুনরাবৃত্তি দ্বারা সেই নিষ্ফল প্রত্যাশা শ্রোতার মনে খুব করুণভাব জাগায়। সর্বশেষ স্তবকে আবার সেই নির্বেদের ভাব বেশ মনগলানো ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

(ঘ) ছ'টি স্তবকে গড়া 'সোনার তরী' কবিতা একটি চিত্রাত্মক কল্পনা যা কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে কবির মনে জেগেছিল। এতে যে মূল ভাবটির প্রতি ইঙ্গিত আছে তা হচ্ছে এই যে:—সৌন্দর্যের যে সম্পদ জীবনের ভিতর সঞ্চিত হয়েছে তাকে ভোগের গণ্ডীর ভেতর টেনে রাখবার চেষ্টা নিষ্ফল। এ নিষ্ফল প্রয়াসটি

শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি'।
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী॥

এই শেষের দুটি ছত্রে বেশ চমৎকার ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

(ঙ) 'প্রথম হাসি' কবিতাটি পাঁচ স্তবকে গড়া। এটি বর্ণনাময়। এর সব ক'টি স্তবকেই নানা ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে কবির মূল হৃদ্‌গতভাব। সব স্তবকেই প্রশ্নের ছলে তিনি শিশুর সহজ আনন্দময় হাসির রহস্যাবৃত উৎসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ওই হাসির চমৎকার বর্ণনা।

(চ) 'ছিন্ন-মুকুল' নামক কবিতাটিরও পাঁচ স্তবক। কোনো শিশুর মৃত্যুতে কবির হৃদয়ে যে শোকের আঘাত লেগেছিল তাই প্রকাশ পেয়েছে এর আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত।

উপরের অলোচনা থেকে ধ'রে নেওয়া যায় যে, সকল গীতিকবিতার একটি সাধারণ লক্ষণ এই:—যে বিশেষ অবস্থা থেকে কবির মনে ভাবাবেগের সঞ্চার হয় এবং সেই আবেগ-বাহিত ভাব যে চরম বিকাশ লাভ করে তার বর্ণনা বা ব্যঞ্জনা থাকে এতে। উল্লিখিত কবিতাগুলির প্রত্যেকটিরই পশ্চাতে আছে নিজের অনুভূত বা প্রত্যক্ষীকৃত কোনো পদার্থ সম্বন্ধে লেখকের ভাবনা। এ ভাবনাই অবশেষে রসোদ্বোধক রূপে প্রকাশ লাভ করে। লেখকের বর্ণনা তাঁর অনুভূতির গভীরতা বা ব্যাপকতা অনুসারে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃততর হয়ে থাকে। বর্ণনার মুখে যখন ভাবানুকূল অবস্থাটি ফুটিয়ে তোলা হয় তখন লেখকের হৃদয়াবেগ সাময়িকভাবে সংযত থেকে আবার অধিকতর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে প্রকাশ পেতে পারে। যেমনটি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের 'ছবি' নামক কবিতায়। আবার কখনো কখনো এমনও ঘটে থাকে যে, ভাবাবেগকে যদি লেখক সংযত না করতে পারেন তবে তা কবিতার প্রথমভাগেই

পুরোমাত্রায় প্রকাশ পায় এবং সেই হেতু তার শেষাংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার এ পদ্ধতির ও ব্যতিক্রম যে কখনো হয় না তা নয়।

গীতিকবিতা কখনো কখনো গানের আকারেও লেখা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানই এর উদাহরণ। এসব গান কোনো বিশেষ ভাবনা থেকে উদ্ভূত নয় বা ধীরে ধীরে গড়ে' ওঠা কবিমানসের বাঙ্‌ময়রূপ নয়; কেবল তাঁর সহজ আনন্দবেদনার অনিবার্য প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের 'আমার নয়ন ভুলানো এলে' বা 'আজি শারদ তপনে প্রভাত স্বপনে' আদি গান এ জাতীয় গীতিকবিতা। এতে ক্রমশ চরম কোটিতে (climax) পৌঁছাবার মতো কোনো একটি মাত্র ভাবের উচ্ছ্বাস নেই। কিন্তু একটি মাত্র ভাবের আবেগই নানা ভাষায় এদের মধ্যে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

এ ছাড়া আর এক শ্রেণীর গীতিকবিতা আছে যাতে ভাব বা হৃদয়াবেগের কোনো প্রত্যক্ষ প্রকাশ নেই, পরন্তু কবি কোনো জাগতিক বস্তুকে অবলম্বন ক'রে এক কল্পনার ছবি এঁকে তোলেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "চম্পা" এ জাতীয় কবিতার দৃষ্টান্ত।

উপরে যে নানা প্রকার গীতিকবিতার কথা উল্লেখ করা হ'ল সেগুলি ছাড়াও বাংলায় অন্যান্য রকমের গীতিকবিতা পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখানে করা বাহুল্য হবে। তবু উপস্থিত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে গাতিকবিতা এত বিভিন্ন শ্রেণীর হতে পারে যে তার কোনো নিঃশেষ গণনা সম্ভবপর নয়।

বিষয়বস্তু দ্বারা গীতিকবিতার গঠন প্রভাবিত হয়, কিন্তু কী পরিমাণে হয় সেটি নির্ভর করে কবির ওপর। যে ভাবাবেগের প্রেরণা থেকে কবিতা জন্মলাভ করে তার উৎসরূপী কবি-মানসই সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে বিষয়কে রূপগ্রহণের স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। অবশ্য সেই রূপটি কবির শিল্পকুশল হাতে পড়লে খানিকটে মাজাঘসা বা পরিবর্তন পরিবর্ধন লাভ করে মাত্র। যে লেখকেব মধ্যে ভাবাবেগ নেই ব'লে মনে হয়—অর্থাৎ যার মধ্যে আন্তরিকতা নেই—এমন লেখকের স্বরূপটি তাঁর কবিতায় ধরা পড়বেই। তাঁর লেখাতে শুধু মিলবে গতানুগতিক ভাষা অলঙ্কার ও ছন্দোবন্ধনের কৌশল। গীতিকবিতার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ব'লে আমরা ব্যক্তিত্ব-প্রসূত কবিতা রবীন্দ্রনাথের কাছেই বেশি পরিমাণে পেয়েছি। আর ব্যক্তিত্ব-স্পর্শহীন কবিতা প্রচুর-পরিমাণে মেলে তাঁর অনুকরণকারীদের রচনার মধ্যে।

গীতিকবিতার রূপ যে তার বিষয়-বস্তুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত

নিচে দেওয়া যাচ্ছে। আশা করা যায় যে, এ সকল থেকে শিক্ষার্থীরা উত্তম কাব্যের স্বরূপ নির্ণয়ের একটা ইঙ্গিত লাভ করবে।

(১) রবীন্দ্রনাথের নানা নাটকে বিশেষ ক'রে তাঁর 'ঋতুউৎসব' ও 'রাজা' আদি বইতে এমন সব গান পাওয়া যায় যে গুলিকে তাদের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলেও তারা অঙ্গহীন হ'য়ে পড়ে না। ঐ সকল গানের বিষয়বস্তু নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত, তবু এ সব গান থেকে জানতে পারা যায় যে, গীতিকবিতা কাকে বলে; যেমন, 'শারদোৎসবে'র ঠাকুর দাদার গান 'আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান'। এর মধ্যে শরৎঋতুর আগমনে স্বতউৎসারিত আনন্দ উচ্ছ্বাসের ধারাটি বেশ মূর্তিলাভ করেছে। শারদোৎসব নাটকটির মূলগত ভাবও এই আনন্দ-উচ্ছ্বাসময়। এর নানা দৃশ্যপর্যায়ের মধ্য দিয়ে এই ভাবটিই বিকাশলাভ করেছে। অতএব দেখা যায় যে এ শ্রেণীর গানগুলি নিতান্ত স্বল্প পরিসরের মধ্যে নাটকের মূলগত ভাবটিকে প্রকাশ করে। উল্লিখিত গানটির রূপের সঙ্গে তার বিষয়বস্তুর বেশ সঙ্গতি আছে। প্রাণীসুলভ সহজ আনন্দের স্ফূর্তির মধ্যে যে একটা সরল ও সবেগ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় এ গানটিতে রয়েছে তাই। এর ছন্দ, উপমা, শব্দবিন্যাস প্রভৃতি সবই বেশ সোজা-সুজি মনকে স্পর্শ করে।

(২) মাইকেল মধুসূদনের বহু সনেটের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাদের রচনারীতির বেশ একটা ঐক্য রয়েছে। 'শকুন্তলা', 'কাশীরাম দাস' আদি এর উদাহরণ।

(৩) গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'যমুনালহরী' কবিতাটির পেছনে কোনো প্রবল ভাবাবেগের তাগিদ নেই; এজন্যেই কবিতাটি উপস্থিত-ক্ষেত্রে গীতি-কবিতার কৌতুহলোদ্দীপক দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হবার মতো। এর বিষয়বস্তুর কোনো অভিনবত্ব নেই, পরন্তু এতে আলংকারিক কল্পনা-বিন্যাস আছে। তা সত্ত্বেও এর রচনারীতি বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করবার বিশেষ সহায়ক। এ কবিতার ছন্দ ও দৈর্ঘ্য নিতান্ত একঘেয়ে মনে হতে পারে কিন্তু এ রকম হওয়ার দরুণ বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় কবির এই ইঙ্গিত যে, নদীপ্রবাহ কালের প্রবাহেরই মতো সমস্ত জাগতিক পরিবর্তন সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। একটানা নদীস্রোতের সঙ্গে একটানা একঘেয়ে ত্রিপদী ছন্দের সাম্যটি বেশ সহজেই চোখে পড়ে। তার উপর সুললিত শব্দবিন্যাসও কবিতায় আঁকা নদীপ্রবাহের চিত্রকে উত্তম ব্যঞ্জনা দিয়েছে।

(৪) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বন্দরে ওই দাঁড়িয়ে জাহাজ' কবিতাটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এর চলতি-কথায় পূর্ণ শব্দবিন্যাস ও হাল্কা চালের ছন্দ এতে যে জোরালো ভাব এনে দিয়েছে তা উদ্দীপনামূলক বিষয়বস্তুরই দ্যোতক।

(৫) মোহিতলাল মজুমদারের "কালাপাহাড়" কবিতাটিতেও কাব্যরূপ এবং

বিষয়বস্তুর আশ্চর্যজনক মিল দেখতে পাওয়া যায়। চমৎকার শব্দবিন্যাস ও যতি-স্থাপনের ফলে এ কবিতাটি সামরিক পদক্ষেপের অনুবর্তী সঙ্গীতের মতো মনে হয়। এ উপাদানভূত কল্পনাসম্ভারও কবিতার বিষয়বস্তুকে বেশ অতুলনীয় ব্যঞ্জনা দিয়েছে।

গীতিকবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে গদ্য-কবিতার কথাও এসে পড়ে। এ বস্তুটি আমাদের দেশের সাহিত্যরসিকগণের মহলে বিশেষ অভ্যর্থনা লাভ করে নি; আর যে পাশ্চাত্যদেশ থেকে এ বস্তুটির আদর্শ এসেছে সেখানেও এর বিরুদ্ধবাদী আছে প্রচুর সংখ্যায়। তবু এর পক্ষে বলবার কথা রয়েছে অনেক। গদ্য কবিতার নিপুণ লেখকেরা (যাঁরা এটিকে কবি হওয়ার সহজ পন্থারূপে নিয়েছেন তাঁরা নন) বাক্যের অন্তশ্ছন্দকে যথোচিতভাবে রক্ষা ক'রে রচনায় বিষয়ানুগভাবে তাকে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেন। তাঁদের কবিতার ছত্রগুলি যে সব সমান মাপের নয় বা তাদের পরস্পর-সন্নিধি যে কোনো বিশেষ আদর্শানুযায়ী নয় সেটা তাদের রস আস্বাদনের কৃত্রিম বাধা মাত্র। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র যে কোনো একটি কথিকা পড়লেই এটা বোঝা যাবে যে তার ছত্রগুলি যতি অনুসারে পদ্যের মতো সাজানো চলে। একথা বলা হয় তো বাহুল্য যে এদের মধ্যে কোনো প্রকারের মিল বা অন্ত্যানুপ্রাস আদি থাকবে না। যদি কেউ লিপিকার 'মেঘদূত' কথিকাটি পড়েন তিনি দেখবেন যে এর ছত্রগুলি নেহাৎ যথেচ্ছভাবে সাজানো নয়। তারা কবির বিচিত্র কল্পনাকে যথাস্থানে যথাযোগ্য ভাবে প্রকাশ করার মতো। যেমন—

> এমন সময়ে নববর্ষা ছায়া-উত্তরীয় উড়িয়ে পূর্বদিগন্তে এসে উপস্থিত। উজ্জয়িনীর কবির কথা মনে পড়ে গেল। মনে হ'ল প্রিয়ার কাছে দূত পাঠাই।
>
> আমার গান চলুক উড়ে, পাশে থাকার সুদূর দুর্গম নির্বাসন পার হয়ে যাক্।
>
> কিন্তু তা হলে তাকে যেতে হবে, কালের উজান পথ বেয়ে বাঁশির ব্যথায় ভরা আমাদের প্রথম মিলনের দিনে, সেই আমাদের যে দিনটি বিশ্বের চিরবর্ষা ও চিরবসন্তের সকল গন্ধে সকল ক্রন্দনে জড়িয়ে রয়ে গেল, কেতকীবনের দীর্ঘনিশ্বাসে আর শালমঞ্জরীর উতলা আত্মনিবেদনে।
>
> নির্জন দীঘির ধারে নারিকেল বনের মর্মর-মুখরিত বর্ষার আপন কথাটিকেই আমার কথা করে নিয়ে প্রিয়ার কানে পৌঁছিয়ে দিক্, যেখানে সে তার এলো চুলে গ্রন্থি দিয়ে আঁচল কোমরে বেঁধে সংসারের কাজে ব্যস্ত।

'পুনশ্চ' 'শেষ সপ্তক' ও 'পত্রপুট' আদি বইতে রবীন্দ্রনাথের রচিত গদ্য কবিতা আছে। নিচে তাদের কয়েক ছত্র করে তুলে দিচ্ছি :—

> কাছে এল পূজোর ছুটি।
> রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপা ফুলের রঙ।

হাওয়া উঠেছে শিশিরে শির্‌-শিরিয়ে,
শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।
আকাশের কোণে কোণে
সাদা মেঘের আলস্য
দেখে মন লাগে না কাজে। (পুনশ্চ)

ওগো তরুণী,
ছিল অনেক দিনের পুরাণো বছরে
এমনি একখানি নতুন কাল
দক্ষিণ হাওয়ায় দোলায়িত,
সেই কালেরই আমি।
মুছে-আসা ঝাপ্‌সা পথ বেয়ে
এসে পড়েছি বনগন্ধের সংকেতে
তোমাদের এই আজকের দিনের নতুন কালে।
পার যদি মেনে নিয়ো আমার সখা বলে,
আর কিছু নয়, আমি গান জোগাতে পারি
তোমাদের মিলন রাতে—
সেই নিদ্রাহারা সুদূর রাতের গান;

*　　*　　*　　*

সে দিনকার বসন্তের বাঁশিতে
লেগেছিল যে প্রিয়বন্দনার তান
আজ সঙ্গে এনেছি তাই,—
সে নিয়ো তোমার অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখের পাতায়
তোমার দীর্ঘশ্বাসে॥ (পত্রপুট)

উল্লিখিত গদ্য কবিতার নমুনাগুলি থেকে দেখা যাবে যে, এ জাতীয় কবিতার প্রধান লক্ষণগুলি হচ্ছে :—

(১) এর অন্তশ্ছন্দের আশ্চর্য্যজনক বৈচিত্র্য;

(২) ছত্রান্তিক মিলের বর্জন, কিন্তু মাঝে মাঝে পাশাপাশি কদাচিৎ দু'চারটি মিলযুক্ত কথা, এবং স্বরসামঞ্জস্য (assonance)।

এই নতুনত্বের আমদানী ক'রে বাংলা কবিতার সম্পৎ বেড়েছে কি না প্রচলিত গদ্য কবিতাগুলির বিশেষ আলোচনা করলেই তা বোঝা যেতে পারে।

গীতিকবিতা প্রায়শ খুব ছোট আকারেরই হতে বাধ্য, কিন্তু কোনো কোনো সময়ে ভাবাবেগের আতিশয্য ও কল্পনার প্রাচুর্য এ উভয়ে মিলে উক্ত কবিতার

আকারকে দীর্ঘায়িত ক'রে তোলে ; খুব ছোটো কবিতায় যা সম্ভবপর কবি তার চেয়ে অধিকতর বিচিত্রভঙ্গীতে তাঁর অন্তরের ভাবপ্রবাহকে রূপায়িত করেন। এ শ্রেণীর দীর্ঘ গীতিকবিতাকে ইংরেজীতে বিষয়ানুসারে কখনো ode কখনো বা elegy নাম দেওয়া হয়ে থাকে। বাংলায় বিষয়নিরপেক্ষ ভাবে একে "দীর্ঘায়িত গীতিকবিতা" বা সংক্ষেপে "দীর্ঘায়িত গীতি" নাম দেওয়া যেতে পারে। গীতি-কবিতায় কবিমানসের কোনো এক স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগকেই ফুটিয়ে তোলা হয় কিন্তু সেই ভাবাবেগ অনায়াসেই এমন একটি বিষয়বস্তুতে পরিণতি লাভ করতে পারে যাকে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করা সুসাধ্য। দীর্ঘায়িত গীতির কাজ হচ্ছে এ ধরণের বিষয়বস্তুকে কাব্যোচিত ভাষায় ফুটিয়ে তোলা। রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' 'সমুদ্রের প্রতি', 'মানস-সুন্দরী', 'ভাষা ও ছন্দ' আদি রচনা দীর্ঘায়িত গীতির উত্তম দৃষ্টান্ত। এ সকল কবিতায় গীতিকবিতার ভাবাবেগ কোনো একটি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সমাপ্ত হয় নি ; পরন্তু কবির উচ্ছ্বাস একবার গীতিকবিতার মতো প্রকাশ পাওয়ার পর তাঁর মানস উপলব্ধি বিচারকে আশ্রয় করেছে। তারি ফলে এ সকল কবিতা একদিকে শব্দসম্পদে, বর্ণনা-চাতুর্যে ও অপর দিকে রসের প্রাচুর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

সপ্তম অধ্যায়

আখ্যান-কাব্য

ভারতের অন্য সকল প্রদেশের মতো বাংলা দেশেরও প্রাচীন সাহিত্য পদ্যময়। আপাতদৃষ্টিতে এ ঘটনাটি ইতিহাসের অদ্ভুত খেয়াল ব'লে গণ্য হতে পারে, কিন্তু ভালো ক'রে ভেবে দেখলে এর একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। যে যুগে ছাপার অক্ষরের প্রচলন ছিল না এবং হাতে লেখার সাহায্যে গ্রন্থাদির প্রচারও ছিল খুব ব্যয়সাধ্য এবং সর্বসাধারণের পক্ষে অনুপযোগী, সে যুগে স্মৃতির সাহায্যেই হ'ত সাহিত্যের সংরক্ষণ এবং প্রচার। অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার সাহায্যে জানা যায় যে, মানুষের স্মৃতি গদ্যের চেয়ে পদ্যকেই সহজে ধারণ করতে পারে। ছন্দের ছাঁচে সাজানো কথাগুলির মধ্যে এমন একটা শৃঙ্খলা ও নিয়মিত গতি আছে যার প্রভাবে মনে তাকে সহজে ধ'রে রাখা সম্ভবপর ; অপেক্ষাকৃত শিথিলভাবে সাজানো গদ্যের শব্দগুলিকে তেমন ক'রে মনে রাখা কষ্টকর।

কবিতার প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, গোড়া থেকেই এর সঙ্গে গীত এবং নৃত্যের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। গীতের সঙ্গে এই যোগের কথা আগেই বলা হয়েছে। আদিম মানবসমাজে নৃত্য-গীতের সহযোগে যে কবিতার চর্চা হ'ত এ সভ্য যুগের কবিতার চেয়ে তা একাংশে আলাদা রকমের ছিল। কারণ সে কবিতা রচনা করত গণগোষ্ঠীর সকলে মিলে এবং তার সঙ্গে নাচ গানের সম্পর্কও ছিল খুব নিকট। এ তিনটি শিল্পেরই প্রকাশের জন্য সর্বমানবসুলভ অন্তছন্দের বোধ একান্ত অত্যাবশ্যক। প্রাচীন কালের গণগোষ্ঠীতে কোনো ভাবাবেগকে প্রকাশ করবার দরকার হ'লে যুগপৎ এ তিনটি শিল্পেরই প্রয়োগ করা হ'ত। যে জিনিষটি পরে কবিতা হয়ে দাঁড়াল সেটা হয় তো গোড়াতে কেবল ছিল নাচ-গানের আনুষঙ্গিক ব্যাপার—নাচের সঙ্গে তাল রেখে পুনঃ-পুন উচ্চারিত শব্দ বা সুর ক'রে গাওয়া ধুয়া বিশেষ। এর থেকে আন্দাজ করতে পারা যায় যে, গণগোষ্ঠীতে প্রচলিত কাহিনীবিশেষকে ক্রমশ ছোটো ছোটো উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে কখনো প্রকাশ করার চেষ্টা হ'ত। তা থেকে একদিকে দেখা দিল কবিতা আর এক দিকে দেখা দিল নাটক। আমাদের দেশের মহাভারত পুরাণ তন্ত্রাদি যে সংলাপের বা সংবাদের ছাঁচে রচিত তার থেকেই উল্লিখিত ঘটনার অনুমান হয়। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদেও এ জাতীয় সংবাদসূক্ত (পুরুরবা ও উর্বশী ১০,৯৫, যম ও যমী ১০, ১০) আছে। বৌদ্ধ সাহিত্যেও এ জাতীয় সংলাপ কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' গ্রন্থেও যে এ জাতীয় উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক কবিতার সন্ধান মেলে তাও মনে হয় একটি সুপ্রাচীন ধারার অনুবৃত্তি। উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন গান যে বিভিন্ন ব্যক্তির (যথা, রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই) একক উক্তি তা নয়; কোনো এক গীতের মধ্যে দুই ব্যক্তির সংলাপও আছে। যেমন,—

> কৃষ্ণ—বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান।
>   শুন তোহ্মে আল রাধা পাঞ্জী পরমাণ॥
> রাধা—নিতি দধি বিকে জাওঁ মথুরার হাটে।
>   মিছাই কানাঞি তোঁ আগোলসি বাটে॥
> কৃষ্ণ—অতি বিতপনী রাধা পরিধান পাট।
>   আলকে তিলকে তোর শোভয়ে ললাট॥
> রাধা—বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার সভাএ।
>   কার কাঁচ আলিতে না দেওঁ মোএঁ পাএ॥
> কৃষ্ণ—বারহ বরিষের দান সুনহ মুগধী।
>   মোহোর করমেঁ তোমা আনি দিল বিধী॥

রাধা—রাখোআল কাহ্নাঞি তোর রাখোয়াল মতী।
পাঁতরে একসরী পাইলে নিমাথিতী॥

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে চাঁদ ও দৈবজ্ঞের কথোপকথনও বোধ হয় সাহিত্যের পূর্বোক্ত লুপ্ত ধারার সাক্ষী।

ঐরূপ উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক গীত-কবিতাকে আশ্রয় ক'রে একদিকে দেখা দিল আখ্যান-কবিতা, অপরদিকে গীতি-কবিতা।

উক্তি-প্রত্যুক্তির কবিতার সঙ্গে সংলাপকারিগণের এবং তাঁদের কথাবার্তার দেশ কালের বর্ণনা যখন ক্রমে ক্রমে দেখা দিল, তখনই তা হয়ে দাঁড়াল আখ্যান-কবিতা। এ জাতীয় আখ্যান-কবিতা প্রায়শ মানুষের নাচ বা পুতুল নাচের সঙ্গে সুর ক'রে আবৃত্তি করা হ'ত। পাশ্চাত্য দেশে ballad নামক যে কবিতা পাওয়া যায় তা হচ্ছে নৃত্যানুষঙ্গী কাহিনীমূলক কবিতা। আমাদের দেশেও এ জাতীয় কবিতা ছিল; তবে তার কোনো আলাদা নাম হয়ত জীবিত নেই[১]। যাক্, পুতুল নাচের সঙ্গে যে কাহিনীমূলক কবিতা সুর ক'রে আবৃত্তি করা হ'ত তারই নাম হয় ত 'পাঁচালী' ছিল। যেহেতু পুতুলের সংস্কৃত নাম হ'ল গিয়ে 'পঞ্চালিকা'। কালক্রমে পুতুল নাচের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন বর্ণনাত্মক আখ্যান-কবিতার নামও দাঁড়াল গিয়ে 'পাঁচালী' বা 'পাঁচালি' যেমন, মনসার পাঁচালী, মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী, শনির পাঁচালী, সত্যপীরের পাঁচালী ইত্যাদি। মনে হয়, পাঁচালীর এই অর্থে অনুসরণ করেই কৃত্তিবাস রামায়ণে লিখেছেন :—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
লঙ্কাকাণ্ডে গায় তার প্রথম শিকলি॥

বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গলে লিখে গেছেন :—

বিজয়গুপ্ত বলে শুন, সোনার বচন।
পদ্মার প্রসাদে হইল পাঁচালী রচন॥

আরো পরবর্তী কবি কাশীরাম দাসও লিখে গেছেন :—

ভারতপঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

(১) প্রাচীন বাংলা ছন্দ 'নাচাড়ি' বা 'লাচাড়ি' হয়ত 'নাচ'এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। যদি এ অনুমান সত্য হয় তবে নাচাড়িকে ballad বলা যেতে পারে। কিন্তু এ নাচাড়ির প্রয়োগের প্রাচীন ইতিহাস অজ্ঞাত ; তাই এ সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা যায় না।

দশম একাদশ শতাব্দী থেকেই বাংলা দেশে গানের খুব ব্যাপক প্রচলন ছিল। মনে হয় এ গান এক সময় নাচকে ছাড়িয়ে কতকটা স্বাধীন হয়েছিল; তারি ফলে পাঁচালী জাতীয় কবিতা পাঁচালি-গান বা শুধু 'গান' বলেও পরিচিত হ'ল। যেমন, গোপীচন্দ্রের গান, রামায়ণ গান। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও ময়মনসিংহ গীতিকার আখ্যান-কবিতাগুলিও এ জাতীয় রচনা। বিষয়-বস্তুর বিভিন্নতা-বশত উল্লিখিত সমস্ত রচনাকে রামায়ণ, মহাভারত ও নানা মঙ্গল-কাব্য বা পল্লীগীতিকাদি নাম দিলেও এদের পরস্পরের মধ্যে রূপগত পার্থক্য খুব বেশি নয়। তাই এদের সকলকেই 'আখ্যান-কাব্য' এই সাধারণ নাম দেওয়া চলে। বাংলা আখ্যান-কাব্য দু'শ্রেণীর :—(১) পৌরাণিক বা কল্পিত, (২) ঐতিহাসিক। তার মধ্যে কৃত্তিবাস মালাধর কাশীরামাদির রচিত রামায়ণ, ভাগবত ও মহাভারত ইত্যাদির বাংলা কাব্যরূপ এবং চণ্ডিকা, মনসা আদির ভক্তগণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলি প্রথমোক্ত পর্যায়ে পড়ে।

মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর, গোপীচন্দ্র প্রভৃতিকে নিয়ে ছোটখাট (পাঁচালি জাতীয়) উপাখ্যান গ্রন্থ (১০ম—১১শ শতকে) রচিত হয়ে থাকলেও, কৃত্তিবাসের রামায়ণই বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রাচীন সুবৃহৎ উপাখ্যান কাব্য। অন্যূন দু'হাজার বছর আগে রচিত সংস্কৃত রামায়ণে যে পারিবারিক ও রাজধর্মের আদর্শ প্রচারিত হয়েছিল তা যুগে যুগে ভারতের বিভিন্ন কবিকে সাহিত্যের প্রেরণা দিয়ে এসেছে; ভারতের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বাংলা দেশেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। কৃত্তিবাস বাংলা পদ্যে রামায়ণ রচনা ক'রে দেশবাসী সংস্কৃতানভিজ্ঞ জনসাধারণের একটা মস্ত অসুবিধা দূর করলেন। তিনি নিজে উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর বই রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ নয়। সংস্কৃত জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিল্পবোধও ছিল উচ্চশ্রেণীর। তাই তিনি রামায়ণ-কথাকে শ্রোতৃ-মণ্ডলীর উপযোগী ক'রেই বাংলা পয়ারে রূপদান করেছিলেন। তাঁর রচনার স্থানে স্থানে সংস্কৃত গ্রন্থের ছায়াপাত ঘটলেও তিনি রামায়ণের চরিত্রগুলি যেমনভাবে এঁকেছেন তাতে তাদের অল্পবিস্তর বাঙালী ক'রে তোলা হয়েছে। এরূপ পরিবর্তনের ফলে, সুদূর দেশ কালে কল্পিত রামায়ণের কথাবস্তু ঘরোয়া কাহিনীর মতোই সকল বাঙালীর হৃদয়ে সমবেদনা জাগাতে সমর্থ হয়েছিল। তার উপর যথেষ্ট বাদ-সাদ দিয়ে রামায়ণের আখ্যানটিকে কতকটা সংক্ষিপ্ত করার ফলেও কাব্যখানি সাধারণের আয়ত্তের ভিতর এসেছিল। এ সকল কারণে (মুখ্যত) পয়ার ছন্দে রচিত কৃত্তিবাসের রামায়ণগীতি থেকে বাংলা কাব্যে এক নবযুগের সঞ্চার হ'ল। বহুলেখক বাংলায় রামায়ণ লিখলেন। সংস্কৃত গ্রন্থের অবলম্বনে রচিত হলেও রামায়ণগুলির ভাষা বেশ সরল

ও শ্রুতিমধুর এবং এদের পয়ার বেশ স্বচ্ছন্দ ও লঘুগতি। নিচে এর কোনো একটির ভাষার নমুনা তুলে দেওয়া হচ্ছে :—

দিবাকর কিরণ উত্তাপে উত্তাপিতা।
চলিলা কাতর অতি জনক দুহিতা ॥
হিঙ্গুল মণ্ডিত তার পায়ের অঙ্গুলি।
আতপে মিলায় যেন ননীর পুতলী ॥
*　　*　　*　　*
জিজ্ঞাসা করিল সবে জানকীর প্রতি।
পদব্রজে কেন যাও তুমি রূপবতী ॥
অনুভব করি তুমি রাজার নন্দিনী।
সত্য পরিচয় দেহ কে বট আপনি ॥
দুর্বাদলশ্যাম অগ্রে অতি মনোহর।
আজানুলম্বিত ভুজ রক্ত ওষ্ঠাধর ॥
সুন্দর বদন দেখি অতি মনোহর।
ধনুর্বাণ করে উনি কে হন তোমার ॥
নবীন কমলমুখ ভ্রূভঙ্গরচিত।
পুলকমণ্ডিত গণ্ড অল্প-বিকসিত ॥
লাজে অধোমুখী সীতা না বলেন আর।
ইঙ্গিতে বোঝান স্বামী ইনি যে আমার ॥

উল্লিখিত স্থলটির শেষ দুই ছত্রে সলজ্জ সীতার যে চিত্র কবি এঁকেছেন তা বাঙালী ঘরের নববধূকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ রকম ছবি এঁকে বহু স্থলে তিনি তাঁর স্বদেশীয় শ্রোতৃবর্গের হৃদয়কে স্পর্শ করেছেন। উল্লিখিত অংশটিতে ব্যবহৃত উপমাগুলি প্রায়শ সংস্কৃত থেকে নেওয়া হলেও রামায়ণের কবি নিজ রচনার স্থানে স্থানে বেশ মৌলিক উপমা ব্যবহার করেছেন। যেমন—

দশ মুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্র মাসে ॥

এবং

শ্রীরামের বজ্রবাণ বজ্র সে চড়ুকে।
নির্ঘাত পড়িল দুষ্ট মারীচের বুকে ॥
বুকে বাণ বাজিয়া নাটাই যেন ঘুরে।
ডানা ভাঙ্গা পাখী যেন উড়ে ধীরে ধীরে ॥

সুমধুর ভাষা ও ছন্দ এবং সুপরিচিত উপমাদির সংযোগে রচিত বাংলা রামায়ণে হৃদয়াবেগের প্রকাশ তেমন ক'রে হয় নি, যদিও মূল রামায়ণ ছিল করুণরসের অতুলনীয় উৎস। এ দিক দিয়ে ভাগবতের দশম একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের (১৪৭৩—১৪৮০) কবি মালাধর বসু অধিকতর কৃতী। কৃত্তি-বাসের অনুসরণে লেখা তাঁর কাব্য বর্ণনাত্মক হ'লেও এর স্থানে স্থানে গীতিকবিতা-সুলভ ভাবের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। যেমন কৃষ্ণের মথুরা গমনে গোপীদের বিলাপে আছে :—

আজি শূন্য হইল মোর রসের বৃন্দাবন।
শিশু সঙ্গে কেবা আর রাখিবে গোধন॥
অনাথ হইল আজ সব ব্রজবাসী।
সব সুখ নিল বিধি দিয়া দুঃখ রাশি॥
আর না দেখিব সখি সে চাঁদ বদন।
আর না করিব সখি সে মুখ চুম্বন॥

*　　*　　*　　*

শিয়রে না দিব আর কানাইর হাথে।
নানা ফুল আর কৃষ্ণ না পরাবেন মাথে॥
কৃষ্ণ গেলে মরিব সখি তাহে কিবা কাজ।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ॥
অন্নধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখি ছাড়ি দিব কারে॥

এ রচনা পরবর্তীকালে রচিত মহাজনদের পদাবলীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু মালাধরের রচনা কেবল ভাবেই সমৃদ্ধ ছিল না; এর ছন্দ এবং ভাষাও ছিল বেশ সুললিত। উল্লিখিত দৃষ্টান্ত থেকে তা বেশ বোঝা যায়।

বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মতো কোনো সংস্কৃত-গ্রন্থের অবলম্বনে রচিত না হলেও একেবারে মৌলিক রচনা নয়। কানা হরি দত্তের রচিত গীতগুলি থেকে যে তিনি আখ্যান বস্তু সংগ্রহ ক'রে ছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু তিনি যে নিজ রচনায় যথেষ্ট মৌলিকত্ব দেখিয়ে ছিলেন তাও অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। কারণ তাঁর মনসামঙ্গল প্রচারের ফলে কানা হরি দত্তের মনসার গান লোকে এখন ভুলে গেছে। বিজয়গুপ্তের বিশেষত্ব হচ্ছে পল্লীজনোচিত রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী। এদিক দিয়ে মনে হয়, তাঁর মনসামঙ্গল সর্বপ্রাচীন খাঁটি বাংলা আখ্যান-কাব্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা

যায় না, কারণ প্রচলিত বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল যে কালক্রমে নানা গায়কের হাতে বদল হয়ে হয়ে বর্তমান রূপ পেয়েছে তার প্রমাণ আছে।

কৃত্তিবাসের অনুসরণে যে কেবল মালাধর ও বিজয় গুপ্তই বৃহৎ আখ্যান-কাব্য রচনা করেছিলেন তা নয়। অন্যূন চল্লিশ জন কবি নিজেদের মতো ক'রে রামায়ণ কথা অংশত বা সমগ্রভাবে বাংলা কবিতায় লিখেছিলেন, আর কবীন্দ্রাদির 'মহাভারত' রচনার পশ্চাতেও ছিল কৃত্তিবাসেরই প্রেরণা। বাংলা মহাভারতকারদের মধ্যে কাশীরাম দাসের রচনাই সমধিক খ্যাত এবং তাঁর কবিত্ব-ক্ষমতা সর্বাংশে কৃত্তিবাসের সঙ্গে তুলনীয়। তবে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে রচিত ব'লে এ গ্রন্থ অধিকতর রসে সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। এ গ্রন্থের স্থানে স্থানে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষাগত গাম্ভীর্য এবং অর্থগৌরব বর্তমান। যেমন—

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল-আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা ॥
* * * *
দেখ চারু যুগ্মভুরু ললাট-প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর ॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর-যুগবর জানু সুবলিত ॥
* * * *
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশু-জালে আচ্ছাদিত ॥
লয় মনে এই জনে বিদ্ধিবেক লক্ষ্য।

কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ-সংকুল বীররসদীপ্ত মহাভারতের কাহিনীটির মাঝে মাঝে কাশীরাম অপেক্ষাকৃত হালকা ভাষায় যে সুন্দর হাস্যরসের সন্নিবেশ করেছেন অংশত তার ফলে বাংলা মহাভারত একঘেয়ে ভাব কাটিয়ে উঠেছে। যেমন সত্যভামা অর্জুনকে সুভদ্রার রূপগুণাদি বর্ণনা ক'রে গান্ধর্ব বিধানে তাঁকে বিবাহ করার প্রস্তাব করলে তিনি কৃষ্ণ বলরামের অজ্ঞাতে একাজে অসম্মতি জানান। তখন—

দেবী বলিলেন ইহা করিবা কেমনে।
মন বান্ধিয়াছে কৃষ্ণা ঔষধের গুণে ॥
পাঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধ গাছ।
এক তিল পল স্বামী নাহি ছাড়ে পাছ ॥

যে লোকে নারদ বাক্য করিলা হেলন।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিতেছ বনে বন ॥
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি হয়।
কি মতে করিবা বিভা দ্রোপদীর ভয় ॥
পার্থ বলিলেন দেবী না নিন্দ দ্রোপদী।
ত্রিজগৎ জনে খ্যাত তব মহৌষধি ॥
ষোড়শ সহস্র শত অষ্ট পাটরাণী।
সবা হৈতে কোন্ গুণে তুমি সোহাগিনী ॥
অপুত্রা কি রূপহীনা হীন-কুল জাত।
রুক্মিণী প্রভৃতি অন্তা পাটরাণী সাত ॥
ঔষধের গুণে হরি তোমারে ডরান।
তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্তে নাহি চান ॥

কাশীরাম দাসের রচনার এই জনপ্রিয়তার ফলে অন্যূন ত্রিশজন লেখক (অংশত বা সমগ্রভাবে) বাংলা পদ্যে মহাভারত-কাহিনী রচনা ক'রে গেছেন। তবে এঁদের মধ্যে সকলে পাঠকদের সমান পরিচিত নন।

কাশীরাম দাসের মহাভারতের পরেই উল্লেখযোগ্য বৃহৎ বাংলা আখ্যান কাব্য মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' (১৬শ শতাব্দী)। ভাষার দিক দিয়ে এ গ্রন্থের কোনো বিশেষত্ব নেই। এ বিষয়ে গ্রন্থকার কৃত্তিবাস, মালাধর আদির অনুকরণই করেছেন; তবে ছন্দের দিক দিয়ে তাঁর একটু বৈচিত্র্য আছে, কারণ তিনি পয়ারের সঙ্গে বেশ অধিক পরিমাণে ত্রিপদী ছন্দও ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ সকল দিক দিয়ে তাঁর খুব কৃতিত্ব না থাকলেও এক বিষয়ে তিনি পূর্বগামী কবিদের উপরে স্থান পাওয়ার যোগ্য; সেটি হচ্ছে তাঁর চরিত্র-চিত্রণের ক্ষমতা। ফুল্লরা, খুল্লনা লহনা ও দুর্বলার চরিত্র নির্ম্মাণে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। উল্লিখিত নারী চরিত্র কয়েকটি এঁকে তিনি তৎকালীন সম্পন্ন বাঙালীর পারিবারিক সুখ দুঃখের যে সরস চিত্র আমাদের চোখের সামনে এনে দিয়েছেন তা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ। তাঁর রচিত পুরুষ চরিত্রও কোনো কোনো স্থানে ফুটেছে বেশ। তবে কোনো নায়কের চরিত্রেই নিরবচ্ছিন্ন পৌরুষ বর্তমান নেই। চরিত্র-চিত্রণের দক্ষতা দ্বারা মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীকাব্যকে আধুনিক উপন্যাসের সমপর্যায়ে উন্নীত করেছেন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলেও চরিত্র চিত্রণের চেষ্টা দেখা যায়। তবে এতে পরবর্তী গায়কদের হাত কত-খানি, তা না জানলে জোর ক'রে কিছু বলা যায় না।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'র পরই উল্লেখ করতে হয় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র।

এ কাব্যের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানে কবি যে স্থূল রুচির পরিচয় দিয়েছেন তা বাদ দিলে তাঁর কাব্যের প্রশংসা করতে হয়। তবে আদিরসের বাহুল্য থাকলেও তাঁর রচনায় গ্রাম্যতা দোষ নেই। সর্বপ্রথমে প্রশংসার যোগ্য তাঁর সুমার্জিত ধারালো ভাষা। তাই মুকুন্দরামের অঙ্কিত কোনো কোনো চরিত্রের প্রভাব তাঁর আঁকা কোনো কোনো চরিত্রে সুস্পষ্ট দেখা দিলেও তাঁর সরস বাক্‌পটুত্বের জন্যে সেগুলি মৌলিক সৃষ্টি ব'লে মনে হয়।

ভারতচন্দ্রের প্রশংসার দ্বিতীয় কারণ তাঁর মাত্রাজ্ঞান। নিরবচ্ছিন্ন সরল রচনা দ্বারা তিনি কাব্যকে বৈচিত্র্যহীন করেন নি। স্থানে স্থানে সংস্কৃত-সাহিত্য-সুলভ যমকাদি দু'একটি অলঙ্কার প্রয়োগ ক'রে রচনাকে তিনি চমৎকারিণী ক'রে তুলেছেন; যেমন কৃষ্ণচন্দ্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,—

চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল॥

তাঁর রচিত ব্যাজস্তুতি অলংকারের নিদর্শনটিও বেশ সুখপাঠ্য। যেমন—

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোনো গুণ নাই তার কপালে আগুণ॥
*   *   *   *
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে যে স্বামীর শিরোমণি॥

অষ্টম অধ্যায়

আখ্যান-কাব্য (অবশেষ)

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'ই প্রাচীন পদ্ধতিতে রচিত সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য আখ্যানকাব্য। তার পরে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায় মাইকেল মধুসূদন 'মেঘনাদবধ' নামে এক অভিনব আখ্যানকাব্য রচনা করেন (১৮৬০)। এ কাব্যের সঙ্গে প্রাচীন বাংলা রামায়ণ মহাভারতাদির বিশেষ সাদৃশ্য নেই বললেই হয়; তথাকথিত মঙ্গলকাব্যাদির ধারাও এতে অনুসৃত হয় নি। মাইকেলের এ কাব্যকে সাধারণত 'মহাকাব্য' নামে অভিহিত করা হয়, যদিও এ দেশের সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচলিত মহাকাব্যের সঙ্গে এর পুরোপুরি মিল নেই এবং মাইকেল এ কাব্যে পদে

পদে পুরাতন কাব্যশাস্ত্রের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করেছেন। কিন্তু এজন্তে তাঁকে দোষী করা অনুচিত, যেহেতু সংস্কৃত মহাকাব্যকে আদর্শ ক'রে তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন নি। তাঁর আদর্শ ছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যের 'এপিক্' নামধেয় বৃহৎ আখ্যান-কাব্যগুলি; যেমন, হোমারের 'ইলিয়াড্', 'ওডিসি', বার্জিলের 'ঈনিয়াড্', তাস্‌সোর 'জেরুজালেম উদ্ধার', মিল্টনের 'প্যারাডাইজ্ লস্ট্' আদি। কাজেই মাইকেলকে যথাসম্ভব পাশ্চাত্য এপিকের আদর্শে বিচার করাই উচিত হবে।

উপরে যে সব পাশ্চাত্ত্য আখ্যানকাব্যের নাম করা হ'ল তাদের মধ্যে হোমারের কাব্য দুখানিই খাঁটি এপিক; এদের রচনায় বহু অজ্ঞাতনামা কবির হাত ছিল। ঐতিহাসিকগণের মতে হোমার এদের রচয়িতা নন, পরন্তু বহু বিক্ষিপ্ত প্রাচীন কবিতা সংগ্রহ ক'রে তাদের সংশোধন ও জোড়াগাঁথা দ্বারা তিনি উক্ত বিখ্যাত এপিক দুটিকে গড়ে তুলেছেন। এ দেশের (মূল) মহাভারত সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণের মত এই যে, এ মহাগ্রন্থ ব্যাসের স্বকৃত রচনা নয়। আগের কালে একাধিক ব্যক্তির রচিত বহু আখ্যানকবিতা একত্র সংগ্রহ করেই তিনি তাঁর সেই বিরাট্ গ্রন্থ প্রস্তুত করেছেন। রামায়ণের রচনা সম্বন্ধেও ঐতিহাসিকগণের খানিকটা এরূপ ধারণা। এ সব ছাড়াও মহাভারত রামায়ণের সঙ্গে হোমারের এপিক্ দু'খানির এমন কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে যাতে সংস্কৃত মহাগ্রন্থদ্বয়কেও এক হিসাবে এপিক বলা চলতে পারে। সে যাই হোক্, পাশ্চাত্য দেশে পূর্বোক্ত খাঁটি এপিকের আদর্শে পরবর্তীকালে মহাকবি বিশেষের দ্বারা কৃত্রিম এপিক রচিত হতে আরম্ভ হয়। মিল্‌টনের 'প্যারাডাইজ্ লস্ট্' ইংরেজী সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ কৃত্রিম এপিক। 'মেঘনাদবধ' প্রণয়নের মূলে যে এ বই খানির বিশেষ প্রেরণা ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

এপিকের বর্ণনীয় বিষয় হবে কোনো বিরাট ঘটনা বা বিবিধ ঘটনাপর্যায়, যে গুলিকে আখ্যানের কেন্দ্রস্থিত কোনো মহান্ ব্যক্তি তাঁর লোকোত্তর ক্ষমতাবলে ঐক্য ও সংহতি দান করবেন। এ রকম নিয়মের বাঁধাবাঁধি সত্ত্বেও এপিকে বিস্তর আনুষঙ্গিক ও গৌণবিষয়ের (নানা দেশ কাল পাত্রের) বর্ণনা অবতারণা করার স্বাধীনতা কবির আছে। কিন্তু সে সকলকে যদি নায়কের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বেশ সুসম্বদ্ধভাবে না মিলিয়ে দেওয়া যায় তবে সমগ্র আখ্যানটির বাঁধুনি অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়ে, তাতে একটানা রসের প্রবাহ থাকে না; সমগ্র কাব্যটি কতকগুলি ছোটো ছোটো আখ্যানের সমষ্টি হয়ে দাঁড়ায়। কোনো মহীয়ান্ ব্যক্তি কী ক'রে নানা বিঘ্নবিপত্তির মধ্য দিয়ে একটি বিরাট ব্যাপার সংসাধন করেন তারি কাহিনীটিতে পাঠকবর্গের নিরবচ্ছিন্ন কৌতূহল রক্ষা ক'রে যাওয়াই হচ্ছে এপিক রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

এপিকের রচনা বর্ণনাত্মক হওয়ার ফলে নানা সুবিধার সঙ্গে অসুবিধাও আছে। এ জাতীয় কাব্যে, নিতান্ত সূক্ষ্মভাবে হ'লেও অন্তর্নিহিত আছে নাটকের বীজ; তবে উভয়বিধ রচনায় ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি পৃথক প্রকারের। নাটকের মতো এপিকেও ঘটনা সংস্থানের কৌশলেই কাহিনী অগ্রসর হতে থাকে, আর চুম্বেকেই লেখকের আলোচ্য ব্যক্তি-চরিত্র এবং তাতেই তিনি দেন মনোযোগ। কিন্তু নাটকের সময় সীমাবদ্ধ; যেহেতু, দু'তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধ'রে অভিনয় চললে তা দেখা লোকের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়। এ কারণে নাট্যকার মূল কাহিনী ছেড়ে ক্ষণকালের জন্যও অন্যদিকে যেতে পারেন না। যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে, মুখ্য ও গৌণ চরিত্রগুলিকে যথাযোগ্য স্থানে একত্রিত ক'রে সমগ্র কাহিনীটিকে তাদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তার ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলাতেই নাটককারের কৃতিত্ব। এপিকে এ রকম কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই। এতে নানা আনুষঙ্গিক ব্যাপারের—পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত, রাজপুরী প্রাসাদ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির বর্ণনা অনায়াসে স্থান পেতে পারে। তবে এপিকের গতিরও একটা সীমা আছে। এর শেষ খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে চলবে না। আর এতে নানা উপমা রূপক ও দৃষ্টান্ত (allusion) আদি থাকবে। এরূপ রচনা-পদ্ধতির সুস্পষ্ট সুবিধা থাকলেও এর প্রয়োগের বেলায় খুব নিপুণতার প্রয়োজন। অসাবধান কবি বর্ণনার উৎসাহে মাঝে মাঝে আখ্যান-বস্তুর খেই হারিয়ে ফেলতে পারেন। আর তাঁর এ দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার যে, বেশি বেশি বর্ণনা করতে গিয়ে আখ্যানের গতি যেন বাধা না পায়। অবশ্য মাঝে মাঝে কাহিনীটিকে ক্ষণকালের জন্য বন্ধ রেখে আবার সেটিকে আরম্ভ করলে পাঠকদের কৌতূহল একটু নাড়া খেয়ে তীব্রতর হতে পারে। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ পরে গল্পের পুনরারম্ভ করলে তাঁদের কৌতূহল ঝিমিয়েও পড়তে পারে।

পুরাণ ইতিহাস ঘেঁটে যে মহান্ চরিত্র ও ঘটনাবলী কবি নির্বাচন করেন সে সকল সম্বন্ধে ধীরে ধীরে এবং গভীরভাবে কৌতূহল উদ্দীপ্ত করাই হ'ল এপিকের উদ্দেশ্য। কিন্তু এর মালমসলা বিবিধ এবং বিচিত্র হ'লেও উত্তম এপিকের কবি কখনো একটি খাপছাড়া পাঁচমিশেলি চেহারার বস্তু তৈরী করেন না। নানা শ্রেণীর উপাদান তাঁর হাতে নূতন বর্ণ-সুষমা নিয়ে অভিনব ধরণে এক ঐক্যবদ্ধ মূর্তি পরিগ্রহ করে।

এখানে খাঁটি এবং কৃত্রিম এপিকের মধ্যে পার্থক্যের সম্বন্ধে একটু আলোচনা হওয়া উচিত। আগেই বলা হয়েছে যে আমাদের দেশের এপিক জাতীয় রচনা হচ্ছে মহাভারত ও রামায়ণ। 'মেঘনাদবধে'র সঙ্গে এদের তফাৎ কি তাই দেখা যাক্।

নিজের হৃদগত ভাবকে রূপ দেবার এবং পরের হৃদয়ে সঞ্চার করবার যে ঔৎসুক্য মানুষ নিতান্ত আদিকাল থেকে অনুভব ক'রে আসছে তার থেকেই সাহিত্যের আরম্ভ। এ জাতীয় চিন্তা ও ভাবাবেগের স্বাভাবিক ক্ষেত্র থেকেই 'ব্যালাড' (ballad) এবং এপিক দুইই জন্মগ্রহণ করে। এ দু'রকমের রচনাই পুরোপুরি স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হয়েছিল এবং তাদের মূলে ছিল সেই প্রাচীনকালের জনগণের অত্যন্ত বিচিত্র চিন্তা ও ভাবাবেগ। কাজেই মহাভারত, রামায়ণের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় এমন সব বিষয়বস্তু, যেগুলি তাদের শ্রোতৃমণ্ডলীর ছিল প্রাণস্বরূপ। অতএব স্পষ্ট বোঝা উচিত যে, প্রাচীন পূর্বপুরুষদের যুগে লোকের বিশ্বাস ও ব্যবহার ছিল একালের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের ; সে যুগের সাহিত্য, যে মৌলিক নীতি, রূপ-বৈচিত্র্য এবং দৃষ্টিভঙ্গী স্বীকার ক'রে গড়ে উঠেছিল তার অনুকরণে ঢের পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থগুলি, নির্মাণকৌশলে এবং বর্ণ-সুষমার দিক দিয়ে একটু পৃথক ধরণের হবে। এই যে কৃত্রিম এপিক তা কোনো সমসাময়িক জনগণের যথাযথ বর্ণনা নয়, পরন্তু তাদের মানসিক ভাবের যথাসম্ভব প্রতিবিম্ব মাত্র। অনুকরণ ব'লেই যে এ জাতীয় রচনা নিকৃষ্ট হবে তার কোনো কথা নেই। এটা হ'ল পৃথক ধরণের রচনা ; বাস্তবতার চেয়ে কল্পনাই এর নির্মাণে অধিকতর ক্রিয়াশীল।

প্রত্যেক জাতির (race) জীবনেই খাঁটি এপিক গ'ড়ে ওঠ্‌বার মতো একটা দেশকালাদিগত পরিবেশ থাকে ; সেটি একবার চ'লে গেলে যে এপিক রচিত হয় তা কৃত্রিম হতে বাধ্য। পূর্বোক্ত এপিক যুগের লক্ষণ হচ্ছে এই যে, তখনকার জীবনযাত্রা কতকটা আদিম রকমের ; তাতে আছে দুঃসহ আবহাওয়া, শত্রুমণ্ডলী এবং নিবিড় অরণ্যভূমির সঙ্গে সংগ্রাম, আর সে সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে সর্বজনমান্য নিয়মকানুন ও আচার ব্যবহারের অভাব। তাই সেকালের লোকদের মধ্যে একদিকে যেমন নির্ভীকতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি মৌলিক সদ্‌গুণগুলি দেখা যায়, অপরদিকে তেমনি তীব্র প্রতিহিংসা-বোধ ও দস্যুতা প্রভৃতি বর্বোরোচিত বৃত্তিগুলির লীলা দেখতে পাওয়া যায়। আর সেকালের লোকদের চরিত্রের এই একটি বিশেষত্ব ছিল যে, তাঁরা সকলেই ছিলেন অতিশয় সরল বিশ্বাসী ; কোনো অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক ঘটনাই তাঁদের কাছে বিশ্বাসের অযোগ্য ছিল না। কারণ তখনো মানুষের বিচার-বুদ্ধি প্রকৃতির নানা রহস্যকে ভেদ ক'রে উঠ্‌তে পারে নি। এ রকম পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই খাঁটি এপিক স্বভাবত গ'ড়ে ওঠে ; কিন্তু এর অনুকূল যুগটি একবার চ'লে গেলে, দেশে নিয়মকানুন এবং সংহতিসাধক শাসকশক্তির আবির্ভাব ঘটে এবং তার ফলে অভিনব পরিবর্তন দেখা দেয়।

মহাভারত রামায়ণের যুগে জগতের সীমা যতখানি ছিল, বর্তমান যুগে তার চেয়ে

অনেক বেড়ে গিয়েছে বলা যায়; তাই এখন এমন কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে এপিক লেখা হতে পারে না যা বিশ্ব-মানবের সকলের নিকট সমানভাবে চিত্তাকর্ষক বিবেচিত হবে; লোকের রুচি ও অভ্যাসের এত বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। নানা মতবাদ, ধর্মবিশ্বাস, প্রথা ও ব্যবসায়াদির পার্থক্যহেতু এখন আর সমস্ত জগতের ঔৎসুক্য আকর্ষণ করার মতো কোনো একটি বিষয়বস্তু খুঁজে পাওয়া ভার; অথচ তদ্রূপ কোনো বিষয়বস্তু না পেলে এপিকের কবি কাব্য আরম্ভই করতে পারেন না। এ রকম অবস্থায় পরবর্তী যুগের কৃত্রিম এপিক, আদি যুগের এপিকের চেয়ে, কেবল সাহিত্যিক রূপে নয় পরন্তু বিষয় বিস্তারে ও শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনের ব্যাপারে পৃথক হতে বাধ্য।

রামায়ণে বর্ণিত সব ঘটনা যেমন বিশ্বাস্য ও সম্ভবপর নয় তেমনি 'মেঘনাদবধে'র আখ্যানভাগও নানা অপ্রাকৃত ও অলৌকিক ব্যাপারের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু প্রবন্ধ-মহিমায় ও রসোদ্বোধনের ব্যাপারে এ কাব্যখানি খাঁটি এপিকেরই সমশ্রেণীস্থ। আগেই বলা হয়েছে যে, খাঁটি এপিকগুলি (যথা ইলিয়াড্, ওডিসি, মহাভারত, রামায়ণ আদি) যে কালে রচিত হয়েছিল সেকালের লোকের কাছে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের মধ্যে কোনো ভেদ ছিল ন; নানা পুরাণকাহিনীকে তাঁরা সোজাসুজি নির্বিচারে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু 'মেঘনাদবধে' সে দিক দিয়ে সুবিধা ছিল না। এর পাঠকবর্গের একাংশ পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় বর্ধিত। কাব্যের আখ্যানভাগটি রামায়ণ থেকে নেওয়া হলেও মাইকেল তাকে এমন সংস্কার-বিরোধীভাবে রদবদল করেছেন ও বাড়িয়েছেন যে, তাতে সেকেলে লোকদের পক্ষেও এ কাব্য রুচিবিরোধী হবার কথা।

'মেঘনাদবধে'র আর এক ত্রুটি হ'ল, স্থানে স্থানে অবান্তর ঘটনা এবং পাত্র-পাত্রীদের মনোগত ভাবের সবিস্তার বর্ণনা দ্বারা মুখ্য কাহিনীর গতিকে অযথা বিলম্বিত করে তোলা। যেমন চতুর্থ সর্গে, সরমার নিকটে সীতার পঞ্চবটী প্রবাসের সুদীর্ঘ বর্ণনা। এ অংশটি গীতিকবিতা হিসাবে মাইকেলের কবিত্ব ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলেও এর সন্নিবেশ 'মেঘনাদবধ' কাব্যের বিশেষত্বকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এপিক্-সুলভ ত্বরিতগতি অনেকটা মন্থর হয়ে পড়েছে। এ গুলি ছাড়াও 'মেঘনাদবধে' বচনভঙ্গীর ও অলংকারের সাধারণ দোষ কিছু কিছু আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও একাব্য যে সমসাময়িক শিক্ষিত সমাজের সমাদরলাভ করেছিল এবং বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ্ ব'লে বিবেচিত হয়েছে তার কারণ এ গ্রন্থের চমৎকার কাব্যরূপ। এদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য এর অভিনব ছন্দ। যে বীররস-প্রধান কাব্য লেখার কল্পনা মাইকেল করেছিলেন তার উপযুক্ত ছন্দ অমিত্রাক্ষর ও অনির্দিষ্ট-

যতিবিশিষ্ট পয়ার বা চৌদ্দ অক্ষরের ছন্দ। মিল ও নির্দিষ্ট-যতিযুক্ত পয়ারের অসুবিধা এই যে, মিলের খাতিরে এবং যতি রক্ষার জন্যে অনেক সময় ভাবপ্রবাহকে অসময়ে বা অস্থানে থামিয়ে দিতে হয়, তাতে 'এপিক'-সুলভ প্রখর ভাবাবেগ প্রকাশের ঘোর বাধা ঘটে। যেমন মেঘনাদবধের গোড়ায় কয়েক ছত্রকে যদি নিম্নলিখিতভাবে লেখা যায়,—

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরবাহু বীর।
অকালেতে গেলা যবে যমের মন্দির ॥
কহ, দেবি অমৃতভাষিণী সরস্বতি।
কোন্ রক্ষোবীরবরে করি সেনাপতি ॥
রাক্ষসাধিপতি পুনঃ পাঠাইলা রণে।
অমর ব্রহ্মার বরে হেন পুত্র ধনে ॥
কহ কি কৌশলে তারে মারিয়া লক্ষ্মণ।
নিঃশঙ্কিলা দেবেন্দ্রের সশঙ্কিত মন ॥

তবে তার ভাবপ্রবাহ কেমন আড়ষ্ট ও নির্জীব হয়ে পড়ে তা সহজেই বোঝা যায়। এ রকম আড়ষ্টভাব এপিক্ তথা যে কোনো রচনার পক্ষেই মারাত্মক। মাইকেল পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিশেষ ক'রে ইংরেজী থেকেই এ ছন্দ প্রবর্তনের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। এ ছন্দে যতি স্থাপনের জন্য বাক্যকে বা বাক্যবাহিত ভাবকে পঙ্গু করতে হয় না; পরন্তু যতিই বাক্য এবং ভাবের অনুগামী ব'লে প্রকাশভঙ্গীর সহজ-গতি রক্ষিত হয়। একটা কৃত্রিম বন্ধনে ভাষা ও ভাবকে না বেঁধে তাদের স্বাধীন-ভাবে চলতে দেওয়ার ফলে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে একঘেয়েমির সম্ভাবনা একেবারে দূর হয়েছে। অধিকন্তু তার ফলে দেখা দিয়েছে যতিস্থাপনের প্রচুর বৈচিত্র্য। এ সকল বিশেষত্বের জন্য মাইকেলের প্রবর্তিত ছন্দ প্রায়শ পয়ার-প্লাবিত বাঙালীর কানে এক নূতন সঙ্গীতের মতো প্রতিভাত হ'ল। ছন্দের পরেই উল্লেখযোগ্য মাইকেলের অপূর্ব ভাষা বা বচনভঙ্গী। যখন তিনি যে রসসৃষ্টি করতে চেয়েছেন ঠিক তার উপযোগী ভাষা ব্যবহার ক'রে তিনি ঠিক সেই রসের স্ফূর্তিসাধন করেছেন। তাঁর এই রসানুকূল বচনভঙ্গী সবচেয়ে সার্থক হয়েছে বীররসের বর্ণনায়। তাঁর আগে কোনো বাঙালী কবি বীররসের সৃষ্টিতে এমন কৃতকার্যতা লাভ করেন নি। যুক্তাক্ষর-বহুল গুরুগম্ভীর ও দুরুচ্চার্য শব্দের সমবায়ে তিনি তাঁর রচনার মধ্যে যে পরিমাণ ওজোগুণ সঞ্চার করতে পেরেছেন তা বাংলার অন্যান্য কবিতে দুর্লভ। আবার করুণাদি রসের বর্ণনায় তিনি প্রাকৃত-বহুল সুললিত মোলায়েম ভাষাও সুন্দর ভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন সহমরণকালে প্রমীলার উক্তি :—

কহিও মায়েরে মোর এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এতদিনে। যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতামাতা, চলিনু, লো আজি তাঁর সাথে ;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে ?
আর কি কহিব সখি ? ভুলো না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে।

এ ভাষা প্রায় পরবর্তী কালের নব্য গীতিকাব্যের ভাষা। আর উল্লিখিত অংশটিতে যে একটি চমৎকার হৃদয়াবেগ প্রকাশ পেয়েছে তাও খাঁটি গীতিকবিতার উপযুক্ত। এর চেয়ে সংস্কৃত-বহুল অথচ সুললিত রচনা দ্বারাও মাইকেল বিভিন্ন রচনায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছেন যেমন,—

পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী তটে
ছিনু সুখে। হায় সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তারকান্তি আমি ? সতত স্বপনে
শুনিতাম বনবীণা বনদেবী করে ;
সরসীর তীরে বসি দেখিতাম কভু
সৌরকর-রাশি-বেশে সুরবালা-কেলি
পদ্মবনে।

উল্লিখিত স্থানে একটিও শক্ত বা দুরুচ্চার্য কথা নেই, ভাষা ভাবেরই মতো সুকোমল।

ছন্দ ও ভাষার পরেই উল্লেখ করা উচিত মাইকেলের অলঙ্কারপ্রয়োগ-নৈপুণ্যের। তিনি স্থানে স্থানে বেশ সুশ্রব্য অনুপ্রাস ব্যবহার ক'রে ভাষার পারিপাট্য-সম্পাদন করেছেন, কিন্তু এ অনুপ্রাস ব্যবহারের বেলায় তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ঈশ্বর গুপ্ত আদি কবির মতো মাত্রাজ্ঞানহীন ছিলেন না। তাঁর—

'কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে'

অথবা

'লঙ্কার পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে'

ইত্যাদি ছত্রে ব্যবহৃত অনুপ্রাস বেশ স্বাভাবিক ও শ্রুতিসুখকর ব'লে মনে হয়। নানা অলঙ্কারের প্রয়োগে তিনি বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর উপমা রূপকাদিতে তিনি কখনো পূর্বতন সংস্কৃত বা বাংলা কবিদের ব্যবহৃত বস্তু অন্ধভাবে অনুসরণ

করেন নি। মাইকেলের উপমার নূতনত্বের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হ'ল। যেমন,—

> "—রহিলা দেবী সে বিজন বনে
> একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি।"

> —সেবিতাম সবে
> মহাদরে, পালিতাম পরম যতনে
> মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
> আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।"

উপরে উল্লিখিত গুণগুলি ছাড়া 'মেঘনাদবধে'র মধ্যে পাশ্চাত্য এপিকের অন্যান্য গুণও বর্তমান। সে গুলির মধ্যে একটি হচ্ছে এ কাব্যের নাটকীয় আরম্ভ। যথাযোগ্য মঙ্গলাচরণাদির পরে, কাব্যোক্ত ঘটনার অকস্মাৎ আরম্ভ হ'ল বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদে রাবণের শোকে, বীরবাহু-জননীর বিলাপে ও রাবণকে ভৎসর্নায়, এবং লক্ষ্মীর প্রেরণায় মেঘনাদের যুদ্ধোদ্যোগে। তার পরের ছ'সর্গের ভিতর দিয়ে মহাকাব্যের বর্ণনীয় ঘটনাচক্র যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছে; কেবল চতুর্থ সর্গে সীতার পঞ্চবটী প্রবাসের বর্ণনা ঘটনাস্রোতকে একটু মন্থর করেছে। তার পরের সর্গগুলিতে এ স্রোত আবার পূর্ববৎ প্রবহমান। এ সকলের মধ্যে মাঝে মাঝে বেশ সুন্দর বর্ণনা ও ব্যক্তিগত উক্তি আছে। ব্যক্তিগত উক্তিগুলি প্রায়শ গীতিকাব্যধর্মী হলেও মাইকেলের প্রবন্ধ-কৌশলে মহাকাব্যের অঙ্গীভূত হয়েও তাদের সৌন্দর্যের ক্ষতি হয় নি। তাঁর 'এপিক্' সুলভ নাটকীয় ঘটনা-সংস্থানের দ্বারা এ কাব্যের প্রায় সর্বত্র পাঠকের কৌতূহলকে সমানভাবে জাগ্রত রাখতে পেরেছেন, এবং তাঁর কাব্যের শেষের কয়টি ছত্রে এর অন্তর্নিহিত্ করুণ রসটিকে বেশ চমৎকার ভাবে ফুটিয়েছেন। ইন্দ্রজিতের সৎকারের পর তাঁর চিতায় মঠ নির্মাণ শেষ হলে—

> করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে
> ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্দ্র অশ্রুনীরে
> বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!
> সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।

যে শোকের কাহিনী নিয়ে কাব্যের আরম্ভ তার পরিসমাপ্তিতেও সে শোকের গভীরতাকেই ফুটিয়ে তোলার ফলে এ কাব্য সহৃদয় পাঠকের চিত্তে গভীর ছাপ রেখে যায়।

মাইকেলের পরে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বৃত্রসংহার' নামক নূতন ধরণের মহা-কাব্য লেখেন। এ কাব্যের বহু সর্গ মিলযুক্ত ছন্দে রচিত। কিন্তু এ ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্য কাব্যের সৌন্দর্য বাড়ে নি ; অধিকন্তু ওজোগুণের লাঘব হয়েছে। আর চরিত্র-চিত্রণে হেমচন্দ্রের দৈন্য বেশ সুপরিস্ফুট। তাঁর কাব্যের বহু স্থলে তিনি মাইকেলের অনুকরণ করেছেন। যেমন 'মেঘনাদে'র সীতা ও সরমার কথোপকথনের ধরণে রচিত বৃত্রসংহারের শচী ও চপলার আলাপ ; আর উক্ত কাব্যে রুদ্রপীড়ের পতনে তৎপত্নী ইন্দুবালাকে সহমৃতা দেখে বৃত্রের যে বিলাপ তাকে স্পষ্টই প্রমীলার সহমরণকালে রাবণের বিলাপের ছায়া ব'লে মনে হয়। কিন্তু এ উভয় স্থলেই মাইকেলের রচনা অধিকতর সুন্দর।

কথা-কাব্য

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগে 'ব্যালাড্' জাতীয় নৃত্যগীতানুষঙ্গী কবিতা ছিল কিনা তা ভালো ক'রে জানা যায় না ; যদি থেকে থাকে, তবে তার কোনো স্পষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংগৃহীত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা', ও 'গোপীচাঁদের বা ময়নামতীর গান' আদিকে তিনি বা অন্য কেউ কেউ ব্যালাড্ ব'লে স্বীকার করলেও সে সকলি হয়ত কেবল গেয় আখ্যান ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ সেগুলি গীত হওয়ার সময় যে, কোনো প্রকার নাচ হ'ত তার প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এ দেশে প্রাচীন ব্যালাড্ না থাকলেও ইংরেজী কাব্য থেকে এ সাহিত্যিক রূপটি আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এসে দেখা দিয়েছে। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম ব্যালাডের অনুকরণে বাংলায় কয়েকটি 'কথা-কাব্য' রচনা করেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রাচীন যুগেই খাঁটি ব্যালাড্ নামক কবিতার সন্ধান মেলে। এপিকের মত ব্যালাড্ও আদিমযুগের স্বাভাবিক সৃষ্টি। ঐতিহাসিকগণের মতে এ শ্রেণীর কবিতা 'এপিকে'রও আগের সৃষ্টি এবং সম্ভবত রয়েছে 'এপিকে'র উদ্ভবের মূলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরেজী-আদি পাশ্চাত্য সাহিত্যের আধুনিক যুগে এক জাতীয় কৃত্রিম ব্যালাডের রচনা দেখা যায়। বাংলা 'কথাকাব্যে'র পশ্চাতে সে গুলির প্রেরণাই কাজ করেছে ব'লে মনে হয়। হাল আমলের ব্যালাডগুলির এক প্রধান লক্ষণ এই যে, এরা নাচ গানের সঙ্গে যুক্ত নয় অর্থাৎ এ শ্রেণীর নব রচিত কবিতাগুলি সুরলয় সহকারে গাওয়া হয় না, বা আবৃত্তি করবার সময় কোনো বিষয়ানুরূপ নাচ হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সকল কৃত্রিম ব্যালাডে নৃত্যানুষঙ্গ-সহায়ক লঘুগতির ছন্দ এবং 'ধুয়া' বা পুনরাবৃত্তির ব্যাপার

অধিকাংশ স্থলে বজায় আছে। আদিম ব্যালাডের যে নাটকীয় উক্তি প্রত্যুক্তি ছিল তাও কোনো কোনো ব্যালাডে রাখতে হয়েছে। গল্প-বিশেষকে এমন ক'রে কবিতায় নিবদ্ধ করার দরুণ তা সহজেই শ্রোতৃবর্গের মনকে নাড়া দিতে পারে। পুরাণো পদ্যরূপটি রক্ষা করার এই হ'ল সার্থকতা। খাঁটি ব্যালাডের রূপটি খুব সোজা, তাই যাঁরা নূতন কবিতা লিখতে আরম্ভ করবেন তাঁদের পক্ষে খুব উপযোগী। এ শ্রেণীর কবিতায় কোনো কাহিনীর অন্তর্গত নানা কল্পিত বা সত্যি-কারের ঘটনাকে সালঙ্কারে বর্ণনা করতে হবে। বর্ণনীয় ব্যাপারগুলির আনুষঙ্গিক দেশকালের পটভূমিকা আঁকবার কোনো তাগিদ নেই এতে। শুধু গল্পটি বললেই চলবে। গল্পটিকে ধাপে ধাপে প্রকাশ ক'রে শ্রোতৃবর্গকে দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট করা ও শেষ পর্যন্ত তাদের কৌতুহলকে বজায় রাখাতেই হ'ল ব্যালাড্ রচয়িতার কৃতিত্ব। 'পণরক্ষা' এই কবিতাটিতে বেশ নাটকীয় ভাবে গল্প আরম্ভ করা হয়েছে। যখনই শোনা যায়,—

> "মারাঠা দস্যু আসিছে রে ঐ
> কর কর সবে সাজ।"
> আজমীর গড়ে কহিলা হাঁকিয়া
> দুর্গেশ দুমরাজ।

তখনই সমগ্র কবিতাটির অন্তর্নিহিত বীরোচিত রসস্ফূর্তির সম্ভাবনা পাঠকের হৃদয়ে এসে ঘা দেয় এবং গল্পের অগ্রগতি সম্বন্ধে তাকে বিশেষ কৌতুহলী ক'রে তোলে। এ ছাড়াও ব্যালাড্ আরম্ভ করবার অন্য পদ্ধতি আছে। গল্পোল্লিখিত কোনো পাত্রপাত্রীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা নিয়েও কবিতা আরম্ভ করা যেতে পারে। যেমন, 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার আরম্ভে আছে :—

> ভূতের মতন চেহারা যেমন
> নির্বোধ অতি ঘোর।
> যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন
> কেষ্টা বেটাই চোর॥

আদিম ব্যালাডের নৃত্যানুকুল ছন্দ পরবর্তী কালের রচনাগুলিতে সব সময় মেলে না। কিন্তু ছন্দের এই অনিয়ম, কি লেখক কি শ্রোতা কারুরই হয় ত নজরে পড়ে নি, কারণ এদের মুখ্য আকর্ষণ ছিল আখ্যান সম্বন্ধে অর্থাৎ কি ক'রে তাকে রূপ দিয়ে তোলা যায়। তাই ব্যালাড্ রচনা খুব কষ্টকর নয়। যদি গল্প দ্রুত এগিয়ে চলে তবে ব্যালাড্ রচয়িতা চিরাচরিত প্রথমেতে নানা ত্রুটি ঘটিয়েও তার জন্যে মার্জনার

যোগ্য বিবেচিত হন। কখনো কখনো অন্তচ্ছন্দের অনিয়ম ঘটতে পারে, কখনো বা কোনো স্তবকে যদি গল্পকে এগিয়ে দেওয়ার মতো কোনো বক্তব্য না থাকে তবে তার সমাপ্তির জন্যে পুনরাবৃত্তির শরণ নেওয়া যায় এবং অসঙ্গত মিলও ব্যবহার করা চলে। রবীন্দ্রনাথ রচিত যে দু'টি 'কথা' কবিতার উল্লেখ উপরে করা গিয়েছে, তারাই মোটামুটি খাঁটি 'ব্যালাড্'। এ রকম কবিতা রবীন্দ্রনাথের একাধিক আছে। 'সোনার তরীর' অন্তর্ভুক্ত 'বিম্ববতী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' এবং 'কথা'র অন্তর্গত অধিকাংশ কবিতাই এ জাতীয়। ব্যালাডের এ রূপটিতে দেশ কালের যথাযোগ্য বর্ণনা যোগ ক'রে এবং পাত্র-পাত্রীদের উক্তিতে গীতিকাব্যের সুর লাগিয়ে একাধিক 'কথা'জাতীয় কবিতাকে তিনি নানা বিচিত্র সৌন্দর্যের ও রসের আধার ক'রে তুলেছেন। 'মানসী' কাব্যে সন্নিবিষ্ট 'নিষ্ফল উপহার' বোধ হয় তাঁর সর্বপ্রথম রচিত এ ধরণের কবিতা। তার পরে এ শ্রেণীর কবিতা একাধিক আছে; তাদের মধ্যে 'সুপ্তোত্থিতা' ও 'পুরস্কার' 'পূজারিণী', 'অভিসার', 'পরিশোধ' ও 'সামান্য ক্ষতি' ইত্যাদি কবিতাগুলির নাম সকলের আগে মনে হয়। এ সকল কবিতার গল্পবস্তুর ব্যালাড্-সুলভ দ্রুতগতি নেই; কিন্তু তা সত্ত্বেও বচনভঙ্গীর পারিপাট্য এবং ছন্দ অলঙ্কারের কারুকার্যের জন্য শ্রোতাদের কৌতূহল কখনো শিথিল হয় না।

সংলাপ-কাব্য

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে সব নূতন কাব্যরূপের প্রবর্তন হয়েছে তার মধ্যে সংলাপ-কবিতা অন্যতম। দুজনের আলাপকে পদ্যে রূপ দেওয়ার প্রচলন যে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও ছিল তা দেখা গিয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বে বর্তমানকালের সংলাপমূলক কবিতা অনেকাংশে অভিনব। এ রকম কবিতার মধ্যে ভাবাবেগের যে অবারিত স্ফূর্তি দেখা যায় তাতে একে কিয়দংশে গীতিকবিতার পর্যায়ে ফেলা চলে। এ কবিতারও অদ্বিতীয় কৃতী স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'বিদায়-অভিশাপ', 'চিত্রাঙ্গদা', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি কবিতা সর্বজন পরিচিত। 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন', নাটকেরও কোনো কোনো অংশ এ শ্রেণীর রচনা। মোহিতলাল মজুমদার ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অনুগামী কবিদের মধ্যে এ জাতীয় কবিতা কেউ বড় একটা লেখেন নি। মোহিতলালের রচিত 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

নবম অধ্যায়

নাটক

কখনো কখনো দেখা যায় যে, ছোটো ছেলেমেয়েরা তাদের বাবার বসবার চৌকিখানাতে ব'সে নিজেকে বাবা বলে' কল্পনা করে, বা চলতে চলতে দু-পায়ের মাঝখানের লাঠিখানাকে ঘোড়া মনে করে' তাকে জোরে চলবার আদেশ করে। এ রকম ভাবে এক রূপকে কল্পনায় আর এক রূপ মনে করার প্রবৃত্তি মানুষের অনেকটা প্রকৃতিগত। কেবল ছোটো ছেলেমেয়েদের খেলাধূলো দেখলেই যে এ কথাটির প্রমাণ মেলে তা নয়, প্রৌঢ় ব্যক্তিরাও যদি অসঙ্কোচে মনের কথা বলেন তবে জানা যাবে যে এ প্রবৃত্তিটি বেশি বয়েস পর্যন্তও টি'কে থাকে। এই যে মিছামিছি একজনকে আরেক জন এবং এক বস্তুকে আরেক বস্তু বলে' কল্পনা করা হয় তার সঙ্গে কথাবার্তার কল্পনাও ক্রমে ক্রমে এসে জোটে। তখনই নাটক পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে আসে, কিন্তু কথাবার্তার ব্যাপারটি দেখা দেওয়ার আগেই আসে "চরিত্র"-বিশেষ, আর গল্পাংশের (plot) মোটামুটি পরিকল্পনা।

এই যে কল্পনা যোগে রূপ-বিশেষকে রূপান্তর হিসাবে দেখার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তা কোন্ অতীতে এ ভারতবর্ষে সুবিকশিত নাটকের আকার নিয়েছিল তা ঠিকঠাক্ জানা যায় না। তবে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের কিছু আগেই যে সে রকম নাটক বর্তমান ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই সময়ের কাছাকাছি বিখ্যাত বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষ অন্যূন একখানি নাটক রচনা করেছিলেন। এখানি ছিল প্রধান বুদ্ধশিষ্য শারিপুত্রের জীবনের কোনো ঘটনাবলী নিয়ে। বুদ্ধের উপদেশ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে জনসাধারণকে অনুরাগী করাই ছিল সম্ভবত এ নাটকখানির উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডের মধ্য যুগে (১৪শ শতকে) গির্জার সম্পর্কে যে Miracle Play শ্রেণীর নাটক গ'ড়ে উঠেছিল তার সঙ্গেই অশ্বঘোষের উল্লিখিত নাটকখানির তুলনা করা যায়। Miracle Playগুলিরও উদ্দেশ্য ছিল বাইবেলের কোনো গল্পকে জনসাধারণের উপদেশার্থে নাট্যরূপ দেওয়া। অশ্বঘোষের প্রায় সমসাময়িক অন্য একখানি নাটকের ভগ্নাংশ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সেখানি ছিল ইংলণ্ডীয় মধ্যযুগের Morality Play শ্রেণীর নাটক। এতে নানা গুণকে (যথা বুদ্ধি, কীর্তি, ধৃতি) ব্যক্তিরূপে কল্পনা করে' রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করানো হয়েছে। অশ্বঘোষের পরেই ভাস (৪র্থ শতাব্দী), কালিদাস (৫ম শতাব্দী), শূদ্রক (৬ষ্ঠ শতাব্দী), ভবভূতি (৭ম শতাব্দী) আদির নাটক পাওয়া যায়। এ সংস্কৃত নাটকের ধারা ১৬শ ১৭শ শতক পর্যান্ত কোনো

গতিকে টি'কে ছিল ভারতের নানা প্রদেশে। বাংলা দেশে চৈতন্তদেবের সময়েও সংস্কৃতে নাটক লেখা হয়েছিল। সে যাই হোক বর্তমান বাংলার, তথা বর্তমান ভারতের নাটক এ ধারার বিশেষ অনুবর্তন করে নি। ইংরেজী নাট্য-সাহিত্য থেকেই আমরা পেয়েছি আধুনিক নাটক রচনার প্রেরণা ও আদর্শ।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত যে প্রাচীন নাটকাদি পাওয়া যায় আধুনিক কালের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই opera 'অপেরা' (গীতিনাট্য) ও ballet 'ব্যালে'র (নৃত্যনাট্য) মতো। এতে সুর ও নৃত্য-গীতের প্রাচুর্ভাব ছিল যথেষ্ট। উচ্চশ্রেণীর পাত্রপাত্রীরা তাঁদের উক্তিগুলি সুর ক'রে আবৃত্তি করতেন; আর সে শ্রেণীর পাত্রীদের উক্তিতে যে সকল প্রাকৃত গাথা থাকত সেগুলি প্রায়শ সুর-লয়-সহকারে গাওয়া হত। এর উপর ছিল পাত্রপাত্রীদের ভাবপ্রধান উক্তিগুলিকে নৃত্যের দ্বারা ফুটিয়ে তোলার ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয় সকল নাটকই যে, নৃত্যগীতের আতিশয্যে ভারাক্রান্ত ছিল তা নয়; কোনো কোনো নাট্যকারের রচনায় য়ুরোপীয় রোম্যান্টিক নাটক ও সামাজিক কমেডি (Comedy of manners) আদির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক বাংলা নাটকের উৎপত্তির বেলায় সে সংস্কৃত নাটকগুলির প্রভাব অতিশয় ক্ষীণ। বাংলা দেশে 'যাত্রা' নামক যে সেকেলে নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল তার থেকে আধুনিক নাটক কোনো প্রকারে উপকৃত হয়েছে ব'লে মনে হয় না। তবে নাটকের দুয়েকটি সুপরিচিত লক্ষণ যে যাত্রা থেকে এসেছে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে।

ইংরেজী নাটক, বিশেষ ক'রে শেক্স্পীয়ারের রচনাকে সামনে রেখেই বাংলা নাটক মুখ্যত রচিত। কাজেই এ নাটকের লক্ষণ ও প্রকৃতি বুঝতে হ'লে শেক্স্পীয়ার থেকে আরম্ভ ক'রে ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্য্যন্ত ইংরেজী নাটকের নির্মাণ-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। শেক্স্পীয়ারের নাটকাবলীর আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রথম শিক্ষানবিশীর সময় থেকেই তিনি অভিনয়ের জন্তে বই লিখেছিলেন। যে কোনো 'কমেডি', ইতিহাস বা 'ট্র্যাজিডি'র গল্পই তিনি সামনে পেতেন তাকেই রঙ্গপীঠের উপযোগী রূপ দিতেন। তাদের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক বা অন্ত কোনো খুঁটিনাটি নির্ভুল হচ্ছে কি না তা দেখবার তাঁর সময় ছিল না। কারণ তখনকার থিয়েটারপিপাসু লোকেদের খুব ত্বরিত-গতিতে খুশী করবার দরকার ছিল। তাঁর নাটকগুলি পড়লে বেশ বোঝা যায় যে, লোকে কী চায় তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি তাঁর বইগুলি লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠা যতই সুদৃঢ় হ'ল এবং নিজ জীবনের দুঃখময় দিক যতই ঘনীভূত হতে লাগল তাঁর

লোকরঞ্জনের প্রয়োজন এবং অভিলাষ দুইই কমল। কাজেই শেষের দিকে তিনি যে সকল নাটক লিখলেন তা ততটা সমসাময়িক লোকদের নয় যতটা পরবর্তীকালের লোকদের জন্যে। কিন্তু তাঁর কালের লোকেরা তাতে আনন্দ তো পেয়েছেনই, এলিজাবেথের যুগের জন্যে রচিত নাটক প'ড়ে পরবর্তী যুগের লোকেরাও বহু আনন্দ লাভ করেছেন। যা সত্যিকারের উত্তম রচনা তা সকল কালের সকল অবস্থার লোককেই খুশী করতে পারে।

শেক্স্পীয়রের নাটকাবলীকে সময়ানুসারে বিভাগ করলে, নাট্যশিল্পের নানা শাখায় তাঁর শক্তির ক্রমবিকাশের ধারাটি অনুসরণ করা যায়। তাঁর নাটকীয় গল্পাংশ নির্বাচনের যে একটা অর্থ আছে সেদিকে লক্ষ্য না করলে চলবে না। যেখানে 'কমেডি' বা 'ট্র্যাজিডি'র উপাদানগুলি হাতের কাছেই পাওয়া যায়, সেখানে অপূর্ব কথাবস্তু খোঁজবার কোনো দরকারই হয় না। নাট্যকারের পক্ষে বিষয় বা কথাবস্তুর সৃষ্টি সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য। কয়েকটি আনুষঙ্গিক বৈচিত্র্য সহ যে কোনো জীবনের কাহিনীই এ কাজের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু কী পদ্ধতিতে গড়াপেটা করতে হবে তার উপরেই নির্ভর করে কাহিনীটি অমর হবে কি স্বল্পজীবী হবে।

শেক্স্পীয়রের নাটকের গড়ন থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর কোনো কোনো নাটক খুবই তাড়াতাড়িতে রচিত। Merchant of Venice নাটকে casket দৃশ্যগুলি পরে কল্পিত এবং নাটকের মামুলী দৈর্ঘ্য সৃষ্টির জন্যেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে ব'লে মনে হয়। তাঁর প্রথম পর্বের নাটকগুলি অনেকটা মামুলী পদ্ধতিতে রচিত; কিন্তু A Midsummer Night's Dream দেখে মনে হয় যে এ বই রচনাকালে তাঁর শক্তি ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশোন্মুখ হয়েছিল। কারণ এখানে রাজসভার দৃশ্যাবলীকে ভিত্তি ক'রে তিনি এক আষাঢ়ে রকমের নতুন ভাঁড়ামির নাট্য ইংরেজদের রঙ্গপীঠে উপস্থিত করলেন। তাঁর সৃষ্ট রাজসভাসংশ্রিত চরিত্রগুলি অস্পষ্ট এবং বর্ণহীন হলেও, এতে তিনি তাদের কাউকে অস্বাভাবিক রূপে বেশি স্থান দেন নি। দৃশ্যগুলিকে রাজসভাসদ্, কারু-বর্গ ও পরীদের মধ্যে অপক্ষপাতে ও সমান ভাবে বণ্টন করা হয়েছে। নতুন নাটকের দর্শকদিগকে একটা সুষমাযুক্ত বৈচিত্র্য দেখাবার জন্যেই এতে বিশেষ চেষ্টা ছিল।

শেক্স্পীয়র তাঁর দ্বিতীয় পর্বের নাটকে কথাবস্তু এবং চরিত্রগুলিকে রূপ দেওয়ার ব্যাপারে অধিকতর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। পূর্বের নাটকগুলির কোনো কোনোটিতে তিনি হাস্য ও অদ্ভুত রসের যে সুসঙ্গত মিশ্রণের ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন Twelfth Night নামক নাটকে সে ক্ষমতাকে তিনি পরিপূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করলেন। এ নাটকের কথাবস্তু তিন ছাঁচের প্রেমের দ্বারা তৈরী।

Viola বালক-ভৃত্যের ছদ্মবেশে ডিউককে ভালবাসে, এ হচ্ছে মানবীয় ভালোবাসা; Olivia ভালোবাসে Cesarioকে, এটা হচ্ছে একটা দুর্ভাগ্যের খামখেয়াল; আর Malvolio যে Oliviaকে ভালবাসে সে হচ্ছে একটা দুর্দশার হাস্যকর পরিণতি। এই তিন রকমের প্রেমকে নিয়ে নাড়াচড়া করাতেই গল্পবস্তুর উপর নাট্যকারের দখল ভালো ক'রে বোঝা যায়। গল্পের ঘোরালো প্যাঁচালো রহস্য-সূত্রগুলিকে বেশ ভালো করে' এবং সহজ ভাবে খুলে দেওয়া হয়েছে। এই নাটকেও পাত্রপাত্রীদের চরিত্রগুলি বেশ দৃঢ় ও সুস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত।

তাঁর ট্র্যাজিডিগুলিতে এই নাট্য-নির্মাণ ও চরিত্রাঙ্কনের ক্ষমতা পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করেছে। শেক্স্পীয়ারের তৃতীয় পর্বের নাটক Julius Caesar বেশ মজবুত ভাবে তৈরী; রাজার অত্যাচার, বিপ্লব, প্রতিযোগী বিপ্লব—এরকম শক্ত জিনিষ-গুলিই হ'ল এর উপাদান। Macbethএর গড়নও এরই মতো দৃঢ়; ডাইনীদের কৃত নাট্যের বীজ রোপণ, ম্যাকবেথের অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়ের ইঙ্গিত, লেডি ম্যাকবেথের দুর্দম প্রভাব, ডনকানের মৃত্যুরূপ চরম ঘটনা (climax) এ শেষোক্ত ব্যাপারের ফলে যে আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল তাতে নাটকীয় কথাবস্তুর অধিকতর পরিণতি, সর্বশেষে প্রচণ্ড ঘটনা পর্যায়ের পূর্ণতার মধ্যে ম্যাক্‌বেথের মৃত্যু, এদের সমবায়ে নাটকখানি গঠিত। এর পরবর্তী নাটক King Lear; এই সব কখানি ট্র্যাজিডিতেই সমান স্থির হস্তের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের ক্রমবিকাশের পর্যায়ে তিনি ট্র্যাজিডির রসটিকেই অধিকতর সার্থক ভাবে ফুটিয়েছেন।

এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নাটকের দৃঢ় গঠন নির্ভর করে নাটকীয় পাত্রপাত্রীদের অন্তর্গত দৃঢ় চরিত্র লোকদের উপর। তাদের অবলম্বন ক'রেই নাটক তার পরিণামের দিকে অগ্রসর হতে পারে। নর নারী এবং তাদের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব নিয়েই যখন ট্র্যাজিডির সৃষ্টি, তখন সেই নরনারীদের বেশ জীবন্ত হওয়া প্রয়োজন।

কেবল নাট্য-নির্মাণ নয়, আরো অনেক দিক দিয়ে শেক্স্পীয়ারের তৃতীয় পর্বের রচনা তাঁর কলা-কৌশলের নিদর্শন। এ কলা-কৌশল জনপ্রিয় নাট্যশালার দাবীতেই গ'ড়ে উঠেছিল। প্রায়শ, যেমন সিজারের এবং ডনকানের হত্যাকাণ্ডের ঠিক আগেই, তিনি ঘটনা-পর্যায়কে যে ক্ষণিকের জন্যে অচলপ্রায় ক'রে তোলেন তা শুধু পরবর্তী ঘটনাকে গভীর ভাবে চাঞ্চল্যদায়ক করবার উদ্দেশ্যে। ভাবী দুর্ঘটনার ইঙ্গিত দর্শকগণকে আগেই দেওয়া হয় এবং তারপর কোনো অমঙ্গলসূচক স্বগতোক্তি বা অদ্ভুত দৈব বিপৎপাতের বর্ণনা দ্বারা সে ইঙ্গিতকে আরও বলবান্ ক'রে তোলা হয়। তিনি যে মাঝে মাঝে 'পরিত্রাণে'র (relief) ব্যবহার ক'রে থাকেন তাও, দর্শকগণ যাতে কোনো একটি ব্যাপার দ্বারা অতিরিক্ত ভাবে অভিভূত না

হয়ে পড়েন সেই উদ্দেশ্যে কল্পিত। প্রেতাত্মার আবির্ভাবকে নাটকের মধ্যে ব্যবহারের বেলায় প্রযোজক হিসেবে শেক্‌স্পীয়ারের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যে সময়ে ভৌতিক দৃশ্য দেখা নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর পক্ষে খুব স্বাভাবিক তখনই কেবল সে দৃশ্য তিনি আমদানী করেন, আর প্রেতাত্মাকে বেশিক্ষণ ধ'রে রঙ্গমঞ্চে রাখবার মতো নির্বোধও তিনি নন্। এটা হচ্ছে একটা সাময়িক আতঙ্কদায়ক দৃশ্য, প্রেতলোক থেকে আকস্মিক আবির্ভাব।

শেক্‌স্পীয়ারের নাটকগুলিতে সর্বপ্রথম খানি থেকে শুরু ক'রে সর্ব শেষখানি পর্যন্ত ভাষা ও ছন্দের ক্রমবর্ধমান শক্তি বেশ ভালো করেই বোঝা যায়; সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা উপস্থিত প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন; কেবল এ সম্পর্কে একটি বিষয়ের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। তখনকার দিনে দৃশ্যপট ও বিজলী আলোর ব্যবস্থা না থাকায় সে বিষয়টি অপরিহার্য ছিল। তাঁর নাটকগুলি এমন চমৎকার দেশকালের বর্ণনায় পূর্ণ যে তখনকার দিনে চিত্রকর বা ষ্টেজ-মিস্ত্রীর অভাবের দরুণ তাঁর নাট্যকলা কিছুমাত্র অঙ্গহীন হয়নি। এ বিষয়ে এ দেশের সংস্কৃত নাটকগুলির সঙ্গে শেক্‌স্পীয়ারের রচনার বেশ সাদৃশ্য আছে।

শেক্‌স্পীয়ারের নাটক সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি কথার পরই নাটকের স্বরূপ নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ তাঁর হাতেই ইংরেজী নাটক যে পূর্ণতা লাভ করেছিল তাই হ'ল গিয়ে বাংলা-নাটকের আদর্শ। এই পরিপূর্ণ রূপকে বিশ্লেষণ করলেই আমাদের কার্য সিদ্ধ হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে এক ব্যক্তি যখন অন্য ব্যক্তি বলে' নিজকে কল্পনা করে তখনই নাটকের সম্ভাবনা ঘটে। এ প্রবৃত্তিটি যখন মূক অভিনয় বা সেরকম কিছু দ্বারা প্রকাশ লাভ করে তখনও নাটক দেখা দেয় না। নৃত্য দ্বারা অভিনয় হ'লে তা একটু এগোয় মাত্র, কিন্তু গল্পবস্তু যখন কেবল অভিনীত ঘটনা পর্যায়ের দ্বারা নয় পরন্তু কথাবার্তায় প্রকাশ-লাভ করে তখনই হয় সত্যিকারের নাটকের আরম্ভ। কেবলমাত্র গল্পটি নাটক নির্মাণে কোনো সাহায্যই করে না। এ হচ্ছে অনেকটা তাঁতির কাছে সুতো বা রাজমিস্ত্রির কাছে ইট্ সুরকির মতো, অল্পবিস্তর প্রয়োজনোপযোগী উপাদান মাত্র। গল্পটি যদি খুব ভালো নাও হয় নিপুণ শিল্পী তা দিয়ে লোকের চমক লাগিয়ে দিতে পারেন, আর যদি ভালো হয় তবে তো কথাই নেই; কিন্তু এ জন্যে গল্প কোনো মহিমার দাবী করতে পারে না।

নাটকের মুখ্য স্বরূপ দেখা দেয় গল্পাংশের (plot) নির্মাণে। এখানে গল্প (story) ও গল্পাংশ এ দুটি বস্তুর ভেদ বুঝতে হবে। নানা কারণে কোনো সমগ্র গল্পকে যথাযথ ভাবে নাটকে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই গল্পকে কাটছাঁট

করে নিতে হয়। এ সংক্ষিপ্ত গল্পকেই বলা হয় গল্পাংশ বা কথাবস্তু। এ গল্পাংশ নির্মাণের মধ্য দিয়ে নাটকের মূলীভূত কারণ—বিভিন্ন উদ্দেশ্যের দ্বন্দ্ব—পরিস্ফুট হওয়া অত্যাবশ্যক। এ সম্বন্ধে গ্রীকরা প্রাচীন কালে কিছু কিছু নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন; তাদের একটি এখনও মেনে চলা দরকার। তাদের ঐ নিয়মটি হচ্ছে এই যে, নাটকীয় ঘটনা পর্যায়ে একটি মূলগত ঐক্য (unity of action) থাকবে অর্থাৎ তারা একটি মূল উদ্দেশ্যের অনুগামী হয়ে চলবে এবং সেই উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত হবে নাটকের গোড়ার দিকে। ঘটনা অনেক রকমেরই ঘটতে পারে, কিন্তু তাদের সবগুলিই মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে। যেমন, ম্যাকবেথ উচ্চাভিলাষের ক্রীড়নক মাত্র এইটি প্রতিপাদনের উদ্দেশ্য নিয়ে নাট্যকার ম্যাকবেথের সুদীর্ঘ জীবন-আখ্যানে এমন ঘটনা পর্যায় কল্পনা করেছেন যেগুলি তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্পর্কিত। ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যদি এরূপ নিবিড় যোগ না থাকে তবে তা গল্প বা আখ্যান হতে পারে, কিন্তু নাটক হয় না।

প্রয়োজনের তাগিদে ইংরেজী নাটকে গ্রীকদের কালগত ও স্থানগত ঐক্যের নীতি (unity of time and place) পরিত্যক্ত হয়েছিল। আমাদের সংস্কৃত নাটকের গোড়া থেকেই এ দুটি ঐক্যের কোনো বালাই ছিল না, অন্ততঃ ভাস, কালিদাসাদির নাটকাবলী থেকে তাই মনে হয়। সে যাই হোক, ঘটনা পর্যায়ের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে শেক্স্পীয়ারের দর্শকদের দাবী ছিল খুব কঠোর।

নাটকের একটি উদ্দেশ্য স্থির ক'রে নিয়ে গোড়াতেই সেটিকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করার পর নাট্যকারকে ঘটনা পর্যায়ের গতি-সঞ্চার করতে হয়। কাজেই King Learএ দেখতে পাই যে প্রথম কয়েক ছত্রেই প্রতিপাদ্য বিষয়টি পরিষ্কার ক'রে বলা হয়েছে, এবং তার মধ্যেই রয়েছে পরবর্তী ঘটনা পর্যায় বিকাশের অবকাশ। Twelfth Nightএও উদ্দেশ্যটি অচিরাৎ ব্যক্ত হয়েছে, সেটি হচ্ছে পারিষদ-মণ্ডলীর মাঝে Voilaর গমন যেখানে প্রেম চর্চাই একমাত্র ব্যসন। এরূপ উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তির পরে ঘটনা-পর্যায়, না খুব তাড়াতাড়ি, না খুব ধীরে চরম পরিণতির (climax) দিকে অগ্রসর হয়। এই চরম পরিণতির প্রাক্‌কালেই নাট্যকারের যথার্থ ক্ষমতা প্রকাশ পায়। তিনি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়ে চমক লাগাতে পারেন কিন্তু এমন কিছু ঘটাবেন না যা লোকের কাছে অসম্ভব ব'লে মনে হবে। তাতে দর্শকবৃন্দ ঘটনাবস্তু সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাতে পারেন। শেক্স্পীয়ারের নাটকেও এ জাতীয় ত্রুটি একবার দেখা গেছে। তিনি যে আইনের ফাঁক বার ক'রে শেষ মুহূর্তে এ্যান্টনিওকে শাইলকের কবল থেকে উদ্ধার করলেন তাকে যেন ছেলে-মানুষী ব'লে মনে হয়। কিন্তু ব্যাপারটি খুব অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটায় এবং

শাইলক তার ফলে অভিভূত হয়ে পড়ায় এ দোষটি কেটে গেছে। নাটকীয় উদ্দেশ্যের পরিণতি ঘটাবার ব্যাপারে চাতুর্যের প্রয়োগ প্রশংসনীয় এবং অত্যাবশ্যক। কিন্তু খুব সাবধানে পা বাড়াতে হবে, একটু পদস্খলন হলেই নাটকোচিত মায়ার (illusion) অবসান ঘটে; নাট্যকারের কৃতিত্বের দাবীও হয়ে পড়ে অচল।

নাটকের প্রতিপাদ্য ভাবটিকে সার্বজনীন করবার জন্যে মাঝে মাঝে মূল গল্পবস্তুর সঙ্গে যোগ রেখে উপগল্প (sub-plot) যোগ ক'রে দেওয়া হয়। উপগল্প King Lear নাটকে আছে বলেই লীয়ারকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের দুঃখময় জীবনকাহিনী না ভেবে কোনো দুঃসময়ের সমগ্র ইতিহাস রূপে গ্রহণ করি। উক্ত নাটকে গ্লোস্টার চরিত্রটি যেন লীয়ারের প্রতিচ্ছবি। তাঁরও অকৃতজ্ঞ সন্তানদের হাতে দুর্গতি ঘটেছিল। লীয়ার থেকে লীয়ারের প্রতিচ্ছবি গ্লোস্টার এবং তার থেকে অনুরূপ প্রতিচ্ছবির পর প্রতিচ্ছবি কল্পনা ক'রে সর্বশেষে জগৎময় লীয়ারের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।

পাত্র-পাত্রীগণই নাটকের ঘটনা পর্যায়কে বহন ক'রে চলে। কাজেই তারা কখনো এমনো এমন কিছু করবে না যার থেকে তাদের সে দায়িত্ব বহনের অনুপযুক্ত মনে করবার ইঙ্গিত পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে। ঘটনা-বিশেষের জায়গায় তারা স্বাভাবিক আচরণই (অর্থাৎ যে আচরণ বাস্তব জীবনে দেখা যায়) করবে। তারা এমন কোনো কথা বলবে না যেটা তাদের কাছে আশা করা যায় না। প্রত্যেক ঘটনার বেলায়ই তারা খুব যথাযথ ভাবে চলবে; অত্যন্ত সংযত হয়েও থাকবে না আর নিতান্ত বাড়াবাড়িও করবে না। এই পদ্ধতি অবলম্বনেই শেক্স্পীয়ার বড় বড় চরিত্রগুলি এঁকেছেন। তাদের সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, তারা সকলেই সাধারণ মানুষ। যেমন, সিজার এক কানে কালা, তবু খুব শক্তিমান এক জন সেনাধ্যক্ষ। তাদের সকলেরই আচরণ সঙ্গতিপূর্ণ, তারা ঠিক মুহূর্তে বেরিয়ে যাচ্ছে ও প্রবেশ করছে, তাতে কোনো ব্যক্তিকেই দাঁড়িয়ে থেকে ঘটনা-স্রোতের বাধা জন্মাতে হচ্ছে না; ঘটনা-সংস্থানের পাল্লায় ওজন করেই যেন তাদের প্রত্যেককে গ'ড়ে তোলা হয়েছে। কাজেই কোনো চরিত্র বড়ই হোক আর ছোটই হোক প্রত্যেকে নিজের পক্ষে যে পরিমাণে অত্যাবশ্যক ঠিক সে পরিমাণেই ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলেছে।

নাটকীয় চরিত্রগুলিকে সর্বপ্রথম রঙ্গস্থলে উপস্থিত করার ধরণেও নাট্যকারের কৃতিত্ব দেখাবার অবকাশ আছে। শেক্স্পীয়ারের ম্যাকবেথ তৃণগুল্মহীন উষর প্রান্তরের মধ্যে দর্শকদের দেখা দিলেন। ফলষ্টাফ্ খলের ভেতর থেকে জিজ্ঞাসা করছে, "হ্যাঁরে কতটা বেলা হয়েছে বল দিকিন—" এ অবস্থায় তাকে নাট্য মধ্যে

প্রকাশ করা হয়েছে। আর শাইলক তার নাট্যসঙ্গত চরিত্রকে পরিচয় দেবার জন্যেই তার প্রথম দর্শনে ব'লে উঠল 'তিন হাজার মোহর'! আর, Twelfth Nightএ বিরহপীড়িত ডিউক বললেন 'বাজিয়ে চল বাজিয়ে চল, কারণ সঙ্গীতই হ'ল প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার কারণ।'

উপরে যেসব লক্ষণের কথা বলা হ'ল সেগুলি বিষাদান্ত ও মিলনান্ত দু-রকম নাটকের বেলায়ই প্রযোজ্য। কারণ উভয় শ্রেণীর রচনারই মূলগত পদ্ধতি এক; বিভিন্ন ব্যক্তির ইচ্ছার সংঘাত থেকেই নাটক রূপলাভ করে কিন্তু এদের ক্রমবিকাশের পদ্ধতি পৃথক; যদিও গাম্ভীর্যের সঙ্গে নাটকের পরিণতি বিষাদময় পথে ঘটে তবে তাকে বিষাদান্ত বলা হয়, আর যদি নাটকটি হালকা চালে চলে, এর কোনো ঘটনা কারুণ্যজনক না হয়ে কেবল সাময়িক বুদ্ধিবিকল্পের ফল বলে গণ্য হয় তবে তা হ'ল মিলনান্তক নাটক।

প্রাচীন-য়ুরোপীয় সাহিত্যে 'ট্র্যাজিডি'র অর্থ: চরিত্রের অন্তর্নিহিত কোনো বিশেষ দুর্বলতার (যথা উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অন্ধ বিশ্বাস, প্রেমোন্মত্ততা, লোভ ইত্যাদির) ফলে কোনো সমুন্নত ব্যক্তির মর্মান্তিক পতন বা বিনাশ। শেক্‌স্পীয়ার ও তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী ইংলণ্ডীয় নাট্যকারগণ এ লক্ষণটি মেনে চলেছেন; কিন্তু মিলনান্তক নাটকের বেলায় তাঁরা প্রাচীনদের পদ্ধতিকে প্রয়োজন মতো রদবদল করেছেন। শেক্‌স্পীয়ারের এ শ্রেণীর নাটকগুলিতে এত নানা রকমের উপাদান আছে যে, তাঁর মিলনান্তক নাটকগুলির কোনো লক্ষণ নির্দেশ করা কঠিন। এদের মধ্যে আছে অদ্ভুত রসপূর্ণ Midsummer Night's Dream, আছে প্রহসন Taming of the Shrew, Comedy of Errors আর অদ্ভুত রস মেশা মিলনান্ত নাটক Twelfth Night ও Merchant of Venice; এ শেষোক্ত নাটক দুখানিতে একটু করুণ রসের গন্ধও আছে, কারণ ম্যালবলিও এবং শাইলকের পরিণামটি তাদের পক্ষে দুঃখময়। তবে এই সব কখানি নাটক সম্বন্ধেই এ কথা বলা যেতে পারে যে, এদের মধ্যে চোখের জল আকর্ষণ করবার মতো কিছু নেই, আর এগুলির কোনো দৃশ্য দেখে করুণা বা ভয়ও জাগবে না। শেক্‌স্পীয়ারের মিলনান্ত নাটকের এর বেশি কোনো সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় কি না সন্দেহ।

ট্র্যাজিডির বেলায়ও শেক্‌স্পীয়ার প্রাচীন পদ্ধতির একটু-আধটু বদল করেছেন। যেমন একটানা করুণ রসের অভিনয় দর্শনে পাছে লোকে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এ জন্যে মাঝে মাঝে হাস্যরসের প্রক্ষেপ দেওয়ার বন্দোবস্ত তাঁর ট্র্যাজিডিতে আছে। একে সমালোচকবর্গ হাস্যরসের পরিত্রাণ বা comic relief নামে অভিহিত করেছেন। শেক্‌স্পীয়ার যে তাঁর দর্শকমণ্ডলীর দিকে চেয়েই এ পরিবর্তন করেছিলেন তা বলাই

বাহুল্য। কিন্তু প্রাচীন নাট্যের একটি কৌশল তিনি গ্রহণ করেছিলেন, সেটা হচ্ছে বার্তাবহের ব্যবহার। এই বার্তাবহ অবশ্য কোনো মুখ্য চরিত্র নয়। যেসব ঘটনা নাটকের মধ্যে দেখানো অসুবিধাজনক সেগুলিই তিনি ঐ চরিত্রটির মুখে ব্যক্ত করেছেন।

উপরে উল্লিখিত নাটক নির্মাণের মূলসূত্রগুলি অনুসরণ ক'রে শেক্‌স্পীয়ার এমন এক নাট্যসাহিত্য সৃষ্টি ক'রে গেছেন যাতে নিয়তির তাড়নায় পরিচালিত নানা শ্রেণীর ও নানা অবস্থার বহু নরনারীর চিত্র প্রতিবিম্বিত দেখতে পাওয়া যায়। শেক্‌স্পীয়ারের পরে একবার ইংরাজী নাটকের দৈন্যদশা উপস্থিত হয়েছিল কিন্তু তখনও মাঝে মাঝে দুএকখানা ভালো নাটকের অভাব হয় নি।

শেক্‌স্পীয়ারের সমসাময়িক বেন্ জনসন্ গোড়াতে তাঁর ভক্ত ছিলেন কিন্তু পরে তিনি অতীত বা কল্পনার জগতের কথাবস্তু নিয়ে নাটক রচনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁর মত এই যে, নাটকে বর্তমান জগতের—যে জগতের ছবি আমরা আশেপাশে দেখতে পাই তারই চিত্র থাকা উচিত। অর্থাৎ তাঁর সময়ের ইংরেজী নাটকে ১৭শ শতাব্দীর ছবিই থাকবে। এক কথায় বলতে গেলে তিনি ছিলেন কতকটা realistic বা বাস্তবপন্থী। দর্শকরা নাটক দেখে কেবল অবসর বিনোদন করবে এও ছিল বেন্ জনসনের মতবিরুদ্ধ। তাঁর মতে নাটকের কোনো একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকা চাই। সে উদ্দেশ্য, সমসাময়িক নানা নরনারীর চরিত্র চিত্রণ নয় পরন্তু তাদের দুর্বলতাগুলিকে বিদ্রূপ ক'রে সে সব দোষ সংশোধন করা।

উদ্দেশ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে বেন জন্‌সন নাটক নির্মাণের পদ্ধতিও পরিবর্তন করলেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি কয়েকটা বিশেষ আদর্শ (type) অনুসরণ ক'রেই চলল, কারণ তাতেই নাটকের সাহায্যে উপদেশ দানের কাজটি ভালো চলে। প্রায় প্রত্যেক লোকের মধ্যেই লোভ, আরামপ্রিয়তা বা শ্রমবিমুখতা আদি দুর্বলতা আছে; সেগুলিকেই প্রধান ভাবে দেখিয়ে তাকে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ করাই ছিল তাঁর কৌশল। এভাবেই তিনি অঙ্কিত চরিত্রগুলিকে স্পষ্ট ক'রে তুলতেন কিন্তু এরূপ অতিরঞ্জনের ফলে তাঁর নাটকে কোনো সত্যিকারের রক্তমাংসের লোক পাওয়া শক্ত।

বেন্ জনসনের পরেও অন্যান্য লেখকেরা নানা ইংরেজী নাটক লিখেছিলেন এবং সে সকলের মধ্যে তাঁর প্রভাব সূক্ষ্ম ভাবে হলেও বর্তমান। সে যাই হোক্, শেক্‌স্পীয়ার থেকে শুরু ক'রে বেন্ জনসন পর্যন্ত ইংরেজী নাট্য সাহিত্যের যে কলাকৌশল ও আদর্শ দাঁড়িয়েছিল তাই ছিল বাংলা নাট্যসাহিত্য

গ'ড়ে ওঠার ব্যাপারে প্রধান প্রেরণা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কলা-কৌশল এবং আদর্শ বাংলা লেখকেরা একদিনে আত্মসাৎ করতে পারেন নি এবং এখনো হয়ত সে আত্মসাৎ করার ব্যাপার শেষ হয় নি।

দশম অধ্যায়

নাটক (অবশেষ)

বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য নাটক রচনার পদ্ধতি সর্বপ্রথম আমদানী করেন তারাচরণ শিকদার। তাঁর রচিত 'ভদ্রার্জ্জুন নাটক' ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তারাচরণ পাশ্চাত্য নাটকের বাহ্যরূপটিকে এ দেশে প্রচলিত করেন। তাঁর আগে যে সকল তথা-কথিত বাংলা নাটক প্রকাশিত বা অভিনীত হয়েছিল তার অধিকাংশই সংস্কৃতের অনুবাদ; সে গুলি পাশ্চাত্য ধরণে অভিনীত হবার সম্পূর্ণ যোগ্য নয়। পাশ্চাত্য নাটকের বাহ্যরূপটি অনুকরণ করলেও এর কলাকৌশলের মর্মকথা অর্থাৎ ঘটনা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চরিত্র বিকাশের ধারাটি তারাচরণের নিকট ধরা পড়ে নি। তিনি যা রচনা করেছেন তা হয়েছে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে রচিত একটি গল্প, অর্থাৎ শিথিলভাবে যুক্ত দৃশ্য-পর্যায়ের ভিতর দিয়ে একটি গল্পকে তিনি ফুটিয়েছেন। নাটকের মধ্যে ব্যবহৃত পদ্যাংশগুলিও খুব সুসঙ্গত হয় নি। তবু ভদ্রার্জ্জুন নাটকের কিছু কিছু প্রশংসনীয় গুণ ছিল।

জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তিবিশেষের ধরণধারণ ও কথাবার্তা স্বাভাবিক ভাবে এঁকে তোলার ক্ষমতা; ভাষার সহজ-বোধ্যতা, অঙ্কিত দৃশ্যের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কল্পনা আদি যে সব গুণ তাঁর রচনায় দেখতে পাওয়া যায় তা নাট্যকারের পক্ষে অপরিহার্য। এ সকল গুণের জন্যে তিনি বাংলা নাটকের জনক হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

তারাচরণের ভদ্রার্জ্জুনের প্রায় সমকালেই হরচন্দ্র ঘোষ 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' নামে শেক্স্পীয়ারের Merchant of Veniceএর এক বাংলা ভাবানুবাদ (adaptation) রচনা করেন। এ বই ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু শেক্স্পীয়ারের রচনার ন্যায় আদর্শ সামনে থাকলেও লেখকের ভাষার ত্রুটিতে ও সংযোজিত কোনো কোনো দৃশ্যের অনৌচিত্যের জন্যে নাটকখানি সাহিত্য হিসাবে অঙ্গহীন হয়েছিল। এ সত্ত্বেও বইখানি পাশ্চাত্য নাট্যরূপকে বাংলায় পরিচিত করবার কিছু সাহায্য করেছিল ব'লে মনে হয়।

উল্লিখিত নাটকখানি প্রকাশের পর বৎসরেই (১৮৫৪) রাম নারায়ণ তর্করত্ন তাঁর সুবিখ্যাত 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটক রচনা ও প্রকাশ করেন; সর্বপ্রথম অভিনীত বাংলা নাটক ব'লে এ বইএর গ্রন্থকার তাঁর পূর্বগামী তারাচরণের যশকে অনেকখানি ম্লান করেছেন, কিন্তু নাট্য রচনার কৌশলের দিক দিয়ে তাঁর 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' 'ভদ্রার্জ্জুনে'র একটুও উপরে নয়। এতে নাটকোচিত গল্পাংশকে ঘটনা-পর্য্যায়ের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলার বা তদানুষঙ্গিক চরিত্র-বিকাশের কোনো প্রয়াস নেই। সেই হেতু একে নাটক না ব'লে তৎকালীন সমাজবিশেষের চিত্রস্বরূপ কতকগুলি সুসংলগ্ন ও অসংলগ্ন দৃশ্যের সমষ্টি বললেই এর ঠিক বর্ণনা করা হবে। বিবিধ অবান্তর বিষয়ের সমাবেশ, মতামত প্রকাশের বাহুল্য, ত্রিপদী ও পয়ারাদি ছন্দের লম্বা বর্ণনা ইত্যাদি এ গ্রন্থের নাটকত্বকে বিশেষভাবে বাধা দিয়েছে। কুলপালক, অনৃতাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্র মনোজ্ঞ-ভাবে আঁকা হলেও এদের নামকরণে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়া'দি উদ্দেশ্যমূলক সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এ সব চরিত্র নামগ্রাহ্য সদ্‌গুণ বা অসদ্‌গুণের প্রতীকরূপে কল্পিত। নাটকখানির তৃতীয়াঙ্কে দেবল ও রসিকের এবং চতুর্থাঙ্কে মহিলা-মাধবীর যে আলাপের ছবি দেওয়া হয়েছে তা বাদ দিলেও কথাবস্তুর কিছু অঙ্গহানি হত না। কিন্তু এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও সামাজিক বিষয় নিয়ে নাটক রচনার প্রথম চেষ্টা হিসাবে কুলীনকুলসর্ব্বস্ব প্রশংসার যোগ্য। আর প্রচুর হাস্যরসের প্রক্ষেপও তাঁর রচনাকে কিছুপরিমাণে আকর্ষণের বস্তু করে তুলেছে। এ গ্রন্থের প্রথমে নান্দী প্রস্তাবনা প্রভৃতি যোগ করে গ্রন্থকার সংস্কৃত নাটকের প্রভাব স্বীকার করলেও, মনে হয় 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকের আদর্শও তাঁর উপর কার্যকরী হয়েছিল। কারণ, উভয়েরই মুখ্য ত্রুটি এক দিয়ে ঘটেছে। নানা ঘটনা-পর্য্যায়ের সংঘাতের ভিতর দিয়ে গল্পবস্তুকে ফোটান' হয়নি। আর উভয় গ্রন্থকারেরই স্বভাবাঙ্কনের শক্তি, জীবনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর, পারিপার্শ্বিক ঘটনা বা লোকজনের চরিত্র আঁকার বেলায় সূক্ষ্ম দৃষ্টি, আঁকা দৃশ্যের সম্বন্ধে স্পষ্ট কল্পনা, এবং সে সব প্রকাশ করবার ক্ষমতা প্রায় সমশ্রেণীর।

রামনারায়ণ তর্করত্নের রচিত 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব' সর্বপ্রথম অভিনীত বাংলা নাটক হিসাবে খ্যাতিলাভ করলেও তাঁর কৃত সংস্কৃত নাটকের স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদই (adaptation) বাংলা নাট্যসাহিত্যের উন্নতি-বিধানে বেশি সাহায্য করেছে। কিন্তু এ স্বচ্ছন্দ অনুবাদের ইঙ্গিত রামনারায়ণ হয়ত পেয়েছিলেন হরচন্দ্র ঘোষের কৃত 'চারুমুখ চিত্তহরা' নামক Merchant of Venice এর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ থেকে। রামনারায়ণের সর্বপ্রথম অনুবাদ-নাটক 'বেণী-

সংহার'। তাঁর এ বই অভিনীত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করার ফলে তিনি 'রত্নাবলী' নামক সংস্কৃত নাটকের এক ভাবানুবাদ রচনা ও প্রকাশ করেন (১৮৫৭)। এ নাটক খানির ইংরাজী অনুবাদ করতে গিয়েই মাইকেল বাংলা নাটক রচনার প্রাথমিক ইঙ্গিত লাভ করেছিলেন।

মাইকেলের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে রচিত হলেও এর নাটকত্ব দুর্বল। এতে ঘটনা পর্যায়ের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে নাটকীয় চরিত্রগুলি বিকাশ লাভ করেনি। এরও কোনো কোনো অংশ রামনারায়ণের নাটকের মতো কতকগুলি শিথিলভাবে যুক্ত দৃশ্যের মধ্য দিয়ে কাহিনী-বিশেষের বর্ণনা। তবে মাইকেলের ভাষা রামনারায়ণের ভাষার চেয়ে বেশি মার্জিত, ঔচিত্যবোধ বেশি গভীর; তিনি যার মুখে যে ভাষা দিয়েছেন তা বেশ মানানসই। প্রত্যেক পাত্র-পাত্রীর উক্তি-গুলিতেই যথাযোগ্য অন্তচ্ছন্দ বর্তমান। তাঁর পরবর্তী নাটক দুখানিতেও এ গুণগুলি রয়েছে, কিন্তু সে দুখানি শর্মিষ্ঠার চেয়ে একটু উৎকৃষ্ট হলেও খুব নির্দোষ নাটক হয়ে ওঠেনি; চরিত্র-চিত্রণের কৃতকার্যতা দিয়ে বিচার করলে মাইকেলের এ সকল রচনাকে পুরোপুরি প্রশংসা করা যায় না। তবে দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর নাটকের আদর্শই পরবর্তী নাট্যকারদের বহুদিন ধরে প্রভাবিত করে এসেছে। নাটকের রচনায় মাইকেলের কৃতিত্ব উচ্চশ্রেণীর না হলেও প্রহসন রচনায় তাঁর স্থান খুব উচ্চে। ইংরেজী low comedyর আদর্শে রচিত তাঁর প্রহসন দুখানি খুবই সার্থক রচনা। এদের মধ্যে যে স্বভাবাঙ্কন ও নির্দোষ হাস্য এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অবতারণা আছে তা বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল ধরে' আদর লাভ করবে।

বিষয়বস্তু খুব সুপরিচিত ব'লে প্রহসন দুখানিতে মাইকেল যথার্থ নাটকীয় প্রতিভা দেখাতে পেরেছেন। রামনারায়ণের 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' নাটক নামে অভিহিত হলেও এর মধ্যে হাস্যরসের প্রাচুর্ভাব একটু বেশি, সে দিক দিয়ে একে প্রহসনও বলা যেতে পারে; কিন্তু সমগ্র পুস্তকখানি, গঠন কৌশলের দিক থেকে না হয়েছে নাটক না হয়েছে প্রহসন। মাইকেলই দেখালেন যথার্থ বাংলা প্রহসন লিখবার আদর্শ। বিষয় নির্বাচনে তাঁর অভিনবত্ব ছিল না বটে, (কারণ রামনারায়ণও সামাজিক প্রথা বা ত্রুটির উপর বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করে ছিলেন) কিন্তু যথোচিত ঘটনা-পর্যায়ের সংঘাতের মধ্য দিয়ে পাত্রপাত্রীদের চরিত্র ফুটিয়ে, কথা-বস্তুকে রূপ দেওয়ার যে ক্ষমতা মাইকেল তাঁর প্রহসন দুখানিতে দেখিয়েছেন তা বঙ্গসাহিত্যে একেবারে নূতন। মাইকেলের প্রচারিত

প্রহসনের আদর্শ ব্যর্থ হয় নি। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের দুর্বলতা স্বীকার্য হলেও প্রহসনের দিকটী উপেক্ষণীয় নয়।

মাইকেলের পরে খ্যাতনামা নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা উঁচুদরের না হলেও তিনি যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করে এসেছেন। ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়ে চরিত্র চিত্রণের চেষ্টা মাঝে মাঝে ফলবতী হয়ে উঠলেও শিল্পীজনোচিত সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাবে তাঁর নাটকের চরিত্রগুলি রসজ্ঞ পাঠককে মুগ্ধ করে না। তাঁর সৃষ্ট পুরুষ চরিত্রগুলি প্রায়শ অস্বাভাবিকতার পরিচয় দেয়। অতিমাত্র বাস্তবাঙ্কনের চেষ্টায়ও তাঁর নাটকগুলি স্থানে স্থানে রসবিরোধী হয়ে রয়েছে। যে শ্রেণীর মার্জিত রুচির ফলে উঁচুদরের সাহিত্যিক সৃষ্টি সম্ভবপর হয় দীনবন্ধুর তা ছিল না। তা সত্ত্বেও হাস্যরসমূলক নাটক বা প্রহসন রচনায় দীনবন্ধু খানিকটে কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন। এর জন্য পরবর্তী নাট্যসাহিত্যের উপর তাঁর প্রভাব খুব গভীর ও ব্যাপক।

দীনবন্ধুর কিছু পরে নাটক লিখতে শুরু করলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁর ভাষা সুপরিচ্ছন্ন এবং রুচি মার্জিত। 'পুরুবিক্রমের' কথা বাদ দিলে ঘটনা পর্যায়ের সংস্থান ও চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে তাঁর নাটকগুলি নিন্দনীয় নয়। বিষয় নির্বাচনের দিক দিয়ে তিনি বিশেষ নতুনত্ব এনেছিলেন। নাটক তাঁর হাতে দেশ-প্রেম প্রচারের সার্থক বাহন হয়ে উঠেছিল। এদিক দিয়ে তিনি পরবর্তী কালের নাট্যকার ডি, এল, রায়ের মুখ্য প্রেরণাদাতা। জ্যোতিরিন্দ্র নাথের নাটকগুলি খুব উৎকৃষ্ট না হলেও প্রহসন রচনায় তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করতে হবে। তাঁর 'বিচিত্র জলযোগ' ও 'অলীক বাবু' সুরুচি-সম্পন্ন উত্তম প্রহসনের বিশেষ প্রশংসনীয় আদর্শ। তাঁর এ প্রহসন রচনার ধারা ডি, এল, রায়কেও কিয়ৎপরিমাণে প্রভাবিত করেছে।

গিরিশচন্দ্রের নাম বাংলা নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হলেও নাটকের বাংলা সাহিত্যিক রূপটি গড়ে ওঠার ব্যাপারে তাঁর দান বেশি নয়। তাঁর নামে প্রচলিত 'গৈরিশ' ছন্দও তাঁর উদ্ভাবিত নয়, যদিও তিনিই বহুল ভাবে এ ছন্দকে কাজে লাগিয়েছেন। নূতন নাট্যরূপের স্রষ্টা না হলেও গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকাবলী দ্বারা এ দেশের দর্শক সাধারণকে বহুকাল ধরে মুগ্ধ ও তৃপ্ত করেছেন; তবু বহু সমালোচক তাঁকে কৃতী নাট্যকার বলতে রাজী নন। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন :—

"তাঁর চরিত্রগুলি রক্তমাংসের মানুষ নয়, জীবন দ্বন্দ্বে তাদের কোনো রূপান্তর হয় না, তারা লাফায়-ঝাঁপায়, কাঁদে-কাটে, যুদ্ধ করে—কোনোটাই তাদের অবশ্যম্ভাবি-

তার নির্দেশ দেয় না। আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, ঔচিত্যের সঙ্গে সম্ভাব্যতার সঙ্ঘর্ষ থেকে যে দ্বন্দ্ব তরঙ্গিত হয়ে ওঠে এবং সেই তরঙ্গের আবর্তনে বিভিন্ন চরিত্র নানা খণ্ড অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে যে এক অখণ্ড পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছায়, তাই হল নাটকের প্রাণবস্তু। এজন্যে নাটকে যে সমস্ত মুখ্য ও গৌণ চরিত্রের অবতারণা করতে হয় তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করা এবং পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে ভাবী পরিণতির বীজটিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার হয়। বহির্ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত এই প্রচ্ছন্ন বীজটিকে যখন পল্লবিত করে তোলে তখন আপাত-দৃষ্টিতে বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন মুখী কার্য-কলাপের ধারা এক এবং অদ্বিতীয় কেন্দ্রে এসেই মেলা প্রয়োজন। শেক্স্পীয়ার, মলেয়ার, গ্যেটে, শিলার, ভিক্টর হুগো, ইবসেন, পৃথিবীর এ শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের যে কোনো একজনের রচনা নিয়ে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, এই হল বনিয়াদী নাটকের কুললক্ষণ। গিরিশচন্দ্রের নাটকে নাট্যবস্তুর এই প্রাণশক্তি কোথাও নেই, তাঁর সৃষ্ট কোনো চরিত্রেই নেই বিন্দুমাত্র অনিবার্যতার পরিচয়। * * * * তারাই গল্পকে তৈরী করে না, গল্পই তাদের সৃষ্টি করে।

* * * *

বিপদ হয়েছে পদে পদে শেক্স্পীয়ারের অনুসরণ করায়। শেক্স্পীয়ার যখন নাট্য সাম্রাজ্যের শাহানশাহা, তখন তাঁর টেকনিক নিতেই হবে, আবার হিন্দু ধর্মানুমোদিত অলৌকিকতা, আস্তিক্যবুদ্ধি এবং ভক্তিপ্রবণতার মর্যাদাও রক্ষা করতে হবে। তাই দুয়ে মিলিয়ে এই জগা-খিচুড়ি বানানো ছাড়া আর উপায় কি? কিন্তু শেক্স্পীয়ারের যেখানে সত্যিকারের শক্তি তা ত আর নকলে আয়ত্ত হয় না, তাঁর দোষ গুলিকেই নকল করা সহজ। গিরিশচন্দ্র তাই করেছেন শেক্স্পীয়ারোচিত খুনখারাবত, আত্মহত্যা, উন্মত্ততা, ব্যভিচার, বজ্জাতির ছড়াছড়ি হয়েছে, কিন্তু শেক্স্পীয়ারের মতো অসামান্য কবিত্বের একবিন্দুও প্রকটিত হয় নি কোনো জায়গায়" (নন্দ গোপাল সেনগুপ্ত—'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা')।

গিরিশচন্দ্রের পরেই নাটক লেখায় হাত দিলেন অমৃতলাল বসু। নাট্যরূপের ক্ষেত্রে তাঁরও কোনো নূতন সৃষ্টি নেই। অধিকন্তু তাঁর প্রহসনগুলি মাঝে মাঝে মনকে নাড়া দেবার মতো হলেও এরা সাহিত্য হিসাবে প্রায় অচল। তিনি সমসাময়িক সমাজ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে' নিজ রচনাকে চিরন্তন বস্তু করে তুলতে পারেন নি। কুরুচির বা স্থূল রুচির জন্যেও অমৃতলালের রচনা অনেকটা মুল্যহীন হয়ে পড়েছে। এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্ট কোনো কোনো চরিত্র বেশ আনন্দদায়ক।

অমৃতলালের পরে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাট্যকার ডি, এল রায় বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর নাটকগুলির অন্য নাটকোচিত গুণ কিছু কিছু থাকলেও চরিত্রসৃষ্টি ব্যাপারে তাঁর এক বিশেষ দুর্বলতা দেখা যায়। নাটকীয় পাত্র-পাত্রীদের ব্যক্তিত্ব ভেদ করে তাঁর নিজ ব্যক্তিত্বকে প্রায়ই উঁকি মারতে দেখা যায়, সেজন্যে "কোনো চরিত্রই স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় না। কাজেই তাদের মধ্যে একের সঙ্গে অন্যের এবং সকলের সঙ্গে সকলের ভাবিক সঙ্ঘাত থেকে নাটকের কথাবস্তু যে সমস্ত পরিণতির সম্মুখীন হয় তা সত্যসম্মত পথে হয় না" (নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—পূর্বোক্ত বই)। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেও কতকগুলি কথা পুনঃপুন ব্যবহৃত হয়ে মুদ্রাদোষের আকার ধারণ করেছে। এ গুলির জন্যে তাঁর সামাজিক নাটকগুলির বহু চরিত্র একটু অস্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু তাঁর প্রহসনগুলি এ সকল দোষ থেকে মুক্ত। এগুলিতে তিনি বেশ সার্থক ভাবে চরিত্র ও হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের সমকালীন যে সকল নাট্যকার রঙ্গমঞ্চের জন্যে নাটক লিখেছিলেন (যেমন ক্ষীরোদ প্রসাদ আদি) তাঁদের সকলেই মাইকেলের অনুসৃত অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী নাট্যধারার অনুসরণ করে চলেছেন। বাংলার চিন্তায় ও কর্মে এ সময়ে নানাভাবে সমসাময়িক পাশ্চাত্য প্রভাব কাজ করলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষে পাদে য়ুরোপে আমেরিকায় যে নব নাট্যরীতি প্রবর্তিত হয়েছিল তার ধারা পেশাদার বাঙালী নাট্যকার মহলে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে নি। কেবল রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়েই এই নব্য নাট্যের আদর্শ বাংলার সাহিত্যে নূতন সৃষ্টির সহায়তা করেছে। কিন্তু তিনিও তাঁর গোড়ার দিকে লিখিত নাটক ক'খানিতে (যেমন, 'প্রায়শ্চিত্ত', 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন') প্রাক্-আধুনিক পাশ্চাত্য নাটকের গঠনকলাই প্রায়শ অনুসরণ করেছেন; আর তাঁর 'গোড়ার গলদ' ('শেষরক্ষা'), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ও 'শোধবোধ' প্রভৃতি নাটকের গঠন কৌশলও সে জাতীয়। 'চিত্রাঙ্গদা', 'মালিনী', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' আদি নাট্যকাব্যকেও এদের শ্রেণীতেই ফেলা চলে। বাংলা নাট্যরূপের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দান হল 'ডাকঘর', 'রাজা', 'তাসের দেশ', 'অচলায়তন' প্রভৃতি প্রতীক (symbolical) নাট্য। এ নাট্যের প্রেরণা তিনি পাশ্চাত্য দেশ থেকে পেলেও তাঁর সৃষ্টি অনেকাংশে অভিনব। পাশ্চাত্য প্রতীক-নাট্যের মতো পূর্বোক্ত বইগুলিতে আখ্যানাতিরিক্ত তত্ত্ব-বিশেষকে ব্যঞ্জনা দেওয়া হলেও এ সবের প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে অভিনবত্ব আছে প্রচুর। গানের যথাযোগ্য কথা ও সুরের মধ্য দিয়ে তিনি সমগ্র নাট্যবাহিত তত্ত্বের ব্যঞ্জনাটিকে যেমন ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনটি পাশ্চাত্য

প্রতীক-নাট্যে প্রায়শ পাওয়া যায় না। সুরের দিকটি অবশ্য সাহিত্যের মধ্যে পড়ে না; কিন্তু গানগুলিকে কবিতা হিসাবে নিলেও উল্লিখিত নাটক ক'খানির রস অপ্রচুর বলে মনে হবে না। সামাজিক, ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক আদি নানা জাতীয় তত্ত্বকে প্রতীক-নাট্যের সাহায্যে ব্যঞ্জনা দেওয়াতেও রবীন্দ্রনাথের অন্যতম কৃতিত্ব। এ কারণেও তাঁর নাটকগুলি রসসৃষ্টি ব্যাপারে মৌলিকত্ব দাবী করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ যে যথোপযুক্ত সংলাপ এবং গানের সাহায্যে নানা ঋতুর অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদ্‌কে নাট্যানুগতরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন তাও নাট্যরূপের নূতন সৃষ্টি বলে গণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এ সবের মধ্যে এক 'শারদোৎসব' ও 'ফাল্গুনী' ছাড়া আর কোনোটির মূলে সুস্পষ্ট গল্পাংশ নেই বলে এদের নিতান্ত সংকীর্ণ অর্থেই গীতিনাট্য বলা উচিত হবে। এ রকম গীতি-নাট্যেরও আশ্চর্যরকম বিকাশলাভ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। তবে এজন্যে তাঁর অসামান্য কবিত্বের সঙ্গে অতুলনীয় সুর-রচনার ক্ষমতার কথাও মনে করতে হবে।

১১শ অধ্যায়

গদ্য ও পদ্য

আজকাল মাঝে মাঝে দুএকটি গদ্য কবিতাও লেখা হচ্ছে বাংলা ভাষায়। এ কবিতা জনপ্রিয় হয়নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনো যে হবেই না, এ কথা জোর করে বলা উচিত নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও গদ্য কবিতা লিখেছেন শেষের দিকে। কাজেই গদ্য কবিতার ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনাকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। তবু একথা বলতে হবে যে, গদ্য কবিতা দেখলে আমাদের মনটা বেশ একটু নাড়া খায়; আমরা ভাবতে বাধ্য হই যে, গদ্য ও পদ্যের যে মৌলিক ভেদের কথা এত দিন ধরে জানা ছিল তা কি তবে নেহাৎ কাল্পনিক? আর যদি কাল্পনিক না হয়ে থাকে তবে এই পার্থক্যের স্বরূপটি কি? বর্তমান প্রবন্ধে হবে তারই আলোচনা; এ প্রসঙ্গে দেখা যাবে, কবিতা বা রসোদ্বোধক ভাব প্রকাশ করার জন্যে ছন্দোবদ্ধ রচনা প্রায়শ অপরিহার্য, আর গদ্যও নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে মাঝে মাঝে উত্তম সাহিত্যিক রস সৃষ্টি করতে পারে।

বাংলা সাহিত্য, তথা প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যেরই আরম্ভ কবিতা নিয়ে, এজন্যে অনেকের ধারণা হতে পারে যে, (১) সাহিত্যের মধ্যে মুখ্যস্থান অধিকার করে

আছে পদ্য রচনা, যা অতি আদিকাল থেকেই কবিতার বাহন এবং (২) গদ্যের স্থান পদ্যের অনেক নিচে। কিন্তু একথা সত্যি নয়, অন্তত প্রাচীন যুগে সত্যি হলেও এ যুগে সে রকম ধারণা পোষণ করার কোনো ন্যায়সঙ্গত হেতু নেই। আজকালকার সাহিত্যে গদ্যের যে নানা শিল্পসম্মত ব্যবহার হচ্ছে সে সকলের আলোচনা করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

সাধারণত লোকে কবিতা ও গদ্য এ দুটি কথার মধ্যে প্রভেদ খুঁজে পায় না, কিন্তু গদ্যের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে এ উভয়ের মৌলিক পার্থক্যটির দিকে লক্ষ্য করা একান্ত প্রয়োজন। কবিতা কথাটির দুরকম মানে আছে; তার একটি একটু বিস্তৃত আর অন্যটি হচ্ছে সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ। কখনো কখনো কোনো লোকের সম্বন্ধে বলা হয় যে, লোকটির মধ্যে 'কবিত্ব' বা 'কবিতা' নেই। এই কবিতা অর্থে বোঝায় শিল্পমাত্রেরই (এমন কি বাহ্যবস্তু তথা মানুষেরও) অন্তর্নিহিত সেই গুণ, যা কারো হৃদয়ে রসের সঞ্চার করতে পারে। যখনই কোনো সৌন্দর্যের চরম উপলব্ধির ফলে আমাদের কল্পনা জাগ্রত হয়ে ওঠে—যেমন যথাক্রমে সূর্যের উদয়, জ্যোৎস্না, নৃত্য, গীত, নাট্য, গল্প উপন্যাসাদির দর্শন, শ্রবণ বা পাঠকালে—তখনই আমরা কবিতার সাক্ষাৎকার লাভ করি। কোনো বিচিত্র ভাব বা দৃশ্য যখন যখন আমাদের কল্পনাকে সক্রিয় করে তোলে তখনি জন্মলাভ করে কবিতা। কিন্তু মানুষে যদি তা উপলব্ধি না করে তবে কবিতার কোনো অস্তিত্ব থাকে না; কারণ এ জিনিস নিজে নিজেই বেঁচে থাকতে পারে না, মানুষ কল্পনা-বলে একে হৃদয়ে ধারণ করলেই তবে এ টিঁকে যায়। সৃষ্টির খুব গোড়ার দিক থেকেই ভূলোকে এবং দ্যুলোকে ছিল রূপ ও রঙের ছড়াছড়ি, কিন্তু আদিমতম মানব জন্মলাভ করে' তাদের সৌন্দর্য দেখে' (নিতান্ত ক্ষীণভাবে হলেও) রসানুভব করবার আগে পর্যন্ত তাতে কোনো কবিতাই ছিল না। এ কবিতা জিনিসটে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত (subjective) অপর দিকে তেমনি বস্তুগত (objective) ব্যাপার। মানুষের অন্তর্দৃষ্টি বাহ্যবস্তুগুলিকে আত্মসাৎ করলেই তার থেকে উদ্ভূত হতে পারে কবিতা। সংক্ষেপে বলতে গেলে কবিতা হচ্ছে সে সৌন্দর্য, যাকে দেখা মাত্রই সহজাত সংস্কারের (instinct) দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এ জিনিস এমন বিদ্যুৎ-বিকাশের মতো লঘুদেহ ও ক্ষণস্থায়ী যে, স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে তাকে ভাষায় ফুটিয়ে তোলা বড়ই দুরূহ। যদি কবিতাকে সংকীর্ণ অর্থে নেওয়া যায় এবং একে কেবল সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেই দেখা যায় তবু এর স্বাভাবিক স্বরূপের বদল হবে না। এ যে, কেবল রসোদ্বোধক রচনামাত্র তা নয়, পরন্তু সেটিকে যথাযথ ভাবে শুনে' তার রস গ্রহণ করাও বটে। যাঁদের অন্তর থেকে এ জিনিসটি প্রকাশ

লাভ করে, আর তা শুনে যাঁদের হৃদয় সাড়া দেয় তাঁদের উভয়ের সমবেত সৃষ্টিই হ'ল কবিতা। যে শক্তি থেকে কবিতার উৎপত্তি, অসমান পরিমাণে হলেও কবি এবং শ্রোতা উভয়েই তার অংশীদার। একের সূক্ষ্ম অনুভূতির উপরই নির্ভর করে অপরের সৃষ্টি ক্ষমতার পরিপূর্ণ সার্থকতা।

কবিতা সম্বন্ধে এ সকল কথা যদিও সত্যি তবু বর্তমান আলোচনাকে সফল করতে হলে শব্দটিকে আরো সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ কবিতা বললে ধরে নিতে হবে সে নামের লিখিত কোনো রচনা; তবেই বোঝবার পক্ষে সহজ হবে। এ অর্থে কবিতা হচ্ছে ভাব-বিশেষের আবেগ-সঞ্চারী প্রকাশ যা অন্য কোনো স্থানে প্রাপ্তব্য কবিতার মতোই আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয়। এ প্রকাশ পদ্যেও হতে পারে, গদ্যেও হতে পারে। কোনো প্রচণ্ড ভাবাবেগ বা উচ্চ আদর্শের প্রেরণায় গদ্য লেখক যে-কথাগুলি লিপিবদ্ধ করেন তাদের সাহিত্যিক গুণও তদনুরূপ উচ্চশ্রেণীর হয়ে দাঁড়ায়। এ রকম উচ্চাঙ্গের গুণ ফুটে উঠেছে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত 'বর্তমান ভারতে'র সুপরিচিত উপসংহারটিতে। "হে ভারত ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী···ভুলিও না—নীচ জাতি···অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর!···সদর্পে ডাকিয়া বল···ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আর বার্দ্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ;···"

স্বামীজীর জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম ও আদর্শবাদের আবেগ হঠাৎ চরমে পৌঁছেচে এবং তারি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচনা কল্পনার গৌরবে ও অন্তচ্ছন্দের সুষমায় অভাবনীয়রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। যখনি কোনো মহদ্ভাবের আবেগ মানুষের প্রকাশ ক্ষমতাকে চরমরূপে উদ্বুদ্ধ করে তখনি কেবল লিখিত হতে পারে কবিতা। এই যে সমুন্নত প্রকাশের ক্ষেত্র তাতে লেখককে খুব সাধনার দ্বারাই পৌঁছতে হয়, কিন্তু তাঁর তৎকালীন তীব্র রসোল্লাসের ভাব খুবই ক্ষণস্থায়ী, কারণ কেউ কখনো সেই সূক্ষ্ম ভাবময় লোকে বেশিক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে না।

একান্ত বিস্তৃত অর্থে কবিতা এমন একটি গুণ যাকে নানারূপ প্রকাশ ভঙ্গীর মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে, আর সংকীর্ণ অর্থে একে সাধারণ "পদ্যের" সঙ্গেই সমার্থক মনে করা হয়। কিন্তু গদ্য ও পদ্যের যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে উপস্থিত প্রবন্ধে তার উপর জোর দেওয়া হবে না; যা গদ্য নয় তাকেই আমরা বলব কবিতা এবং গদ্য ও কবিতাকে মোটামুটিভাবে পরস্পরের প্রতিশব্দ হিসেবেই ধরা যাবে। কেবল মাত্র রচনাকৌশলের দিক থেকে দেখলে একথা বলা উচিত হবে যে, কবিতা ও গদ্য একটি সাহিত্যিক প্রকাশকার্যের দুরকম পদ্ধতি মাত্র।

পদ্য ও গদ্যের মধ্যে মুখ্যতম ভেদ হচ্ছে উভয়ের গঠনে অন্তশ্ছন্দগত (rhythmic) তারতম্য। পদ্য হচ্ছে একটি ছাঁচ বা আদর্শ—কবি যাকে নিপুণতার সঙ্গে বারবার আবৃত্তি করেন। যে ন্যূনতম অবিভাজ্য অংশকে নিয়ে উক্ত ছাঁচ কাজ করে তা হচ্ছে পর্ব বা চরণ; পদ্যের নানা বিচিত্র গতির মধ্যেও ঐ ছাঁচটির ব্যবহার থাকবে অব্যাহত। যদি ঐ ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটে তবে পদ্য প্রায়শ খোঁড়া হয়ে পড়ে। সংস্কৃত ভাষায় ছন্দবোধক যে "বৃত্ত" কথাটি আছে তার মৌলিক অর্থ পদ্যের স্বরূপটিকে বেশ সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়। 'বৃত্ত' অর্থ আবর্তিত; অর্থাৎ যার মধ্যে 'বৃৎ' (=আবর্তন ক্রিয়া, ঘুরে ঘুরে আসা) আছে তাই হ'ল বৃত্ত। এই যে আবর্তন ক্রিয়া তা হচ্ছে উল্লিখিত ছাঁচের পুনঃপুন ব্যবহার। এ দিক দিয়ে পদ্যের চেয়ে গদ্য ঢের আলাদা রকমের। গদ্যের মধ্যে কোনো ছাঁচ-বিশেষের ব্যবহার নেই। যা 'গদিত' ('গদ্' ধাতুর অর্থ 'বলা') বা 'উক্ত' হয় তারই নাম গদ্য। পদ্যে ব্যবহৃত ছাঁচটির বৈচিত্র্য সম্পাদনের কৌশলই কবির ক্ষমতার পরিচায়ক। যদি তিনি কেবল দু-এক রকমের বেশি ছাঁচ ব্যবহার না করতে পারেন (যেমন প্রাচীন বাংলা কাব্যের লেখকগণ, যাঁদের সম্বল ছিল কেবল পয়ার বা ত্রিপদী) তবে তাঁকে পদ্য লেখক বললেই ভালো হয়। কিন্তু তিনি যদি রচনার গঠনগত ঐক্য রক্ষা করে' মাঝে মাঝে উক্ত ছাঁচের অপ্রত্যাশিত বৈচিত্র্য দেখাতে পারেন তবেই এ কথা বলতে পারা যায় যে, কবিকর্মের দুরূহতম কৌশলের একাংশ তাঁর আয়ত্ত হয়েছে।

কোনো কথা বলতে গেলে বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির মধ্যে কোনো না কোনোটির উপর জোর পড়ে। এ দিক থেকেই গদ্যের অন্তশ্ছন্দ ওঠে ফুটে'। এ অন্তশ্ছন্দ কোনো পুনরাবৃত্ত ছাঁচের উপর নির্ভর করে না। অমিত্রাক্ষর বা প্রবহমান পয়ারের কোনো ছত্র, গদ্য রচনার ভিতরও দেখা যেতে পারে, কিন্তু সে রকম গদ্য নির্দোষ নয়।

ছাপাখানার প্রচলন হওয়ার আগে থেকেই—এমন কি লেখার সংকেত আবিষ্কারেরও আগে থেকে—পদ্যরচনায় মানুষের শিল্পসৃষ্টির বৃত্তি চরিতার্থ হয়ে এসেছে; এবং কবিতার অন্তর্নিহিত গীতধর্মী অন্তশ্ছন্দ এক বিশেষ রূপ গ্রহণ করেছে। এই রূপকে তার অপরিহার্য লক্ষণ বলে' গণনা করা হয়। ছাপাখানা আবিষ্কারের পূর্ববর্তী কালে পদ্য যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তার কারণ, এ রচনা সহজেই স্মৃতিতে ধারণ করার যোগ্য। কাজেই পদ্যে ভালো কিছু লিখতে পারলে লোকের মুখে মুখে তার প্রচার ঘটত। গদ্যের বেলায় সে রকম সুবিধা ছিল না বলে' ছাপার ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত গদ্যের সাহিত্যিক ব্যবহার খুব সীমাবদ্ধ ছিল।

কিন্তু গদ্যে সাহিত্যচর্চার অনেক আগে থেকেই পদ্য রচনার আরম্ভ হয়েছিল ব'লেই যে, পদ্যে মানুষের বিচিত্র ভাবাবেগ অধিকতর তীব্রভাবে প্রকাশিত হতে পারে তা নয়। এর সত্যিকারের কারণ হচ্ছে পদ্য ও গদ্যের মধ্যে সুরের তারতম্য। পদ্য হচ্ছে গীতধর্মী এবং সে কারণে গভীর রূপে ভাবোদ্দীপক, আর গদ্য স্বাভাবিক কারণে গীতধর্মী নয়; তাই ভাবোদ্রেক করবার এর কোনো নিজস্ব শক্তি নেই।

গদ্য যখন পদ্যের চেয়ে ভাবোদ্দীপনের ক্ষমতায় হীন তখন এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, গদ্যের গতিতে কোনো ত্বরা নেই অথবা এর দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কোনো বাঁধাবাধি নেই। যখন কোনো বিষয়কে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করবার প্রয়োজন পরন্তু গভীরভাবে নয়, তখনই দরকার হয় গদ্যের। সুমধুর যে সংগীত তা খুব দীর্ঘ হয় না এবং সে সংগীত মানুষের তীব্র অনুভূতির ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তগুলিকেই প্রকাশ করে। যে সকল ঘটনা অপেক্ষাকৃত শান্ত সংযত অনুভূতির বিষয় সেগুলিকে প্রকাশ করাই হচ্ছে গদ্যের মুখ্য কাজ। দিবালোকের অবসানে সন্ধ্যার আবির্ভাবে মনে যে সকল চিন্তার উদয় হয় গদ্য প্রবন্ধের লেখক সেগুলিকে শান্তভাবে ও বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করবেন। কিন্তু সন্ধ্যার সমগ্র রূপ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে যে প্রবল আবেগ সৃষ্টি করেছিল তা প্রকাশ করতে গিয়ে উদাত্ত সুরে তিনি গেয়েছেন:

"অয়ি সন্ধ্যে,
অনন্ত আকাশতলে বসি' একাকিনী
কেশ এলাইয়া,
নত করি স্নেহময় মোহময় মুখ
জগতেরে কোলেতে লইয়া,
মৃদু মৃদু ও কি কথা কহিস আপন মনে
মৃদু মৃদু গান গেয়ে গেয়ে
জগতের মুখপানে চেয়ে।"

সুদীর্ঘ পদ্য রচনায় (যেমন মাইকেল, হেম, নবীন আদির মহাকাব্যে) ভাবাবেগের তীব্রতা বেশিক্ষণ ধ'রে রাখা যায় না। বেশ কয়েক চরণ বা ছত্র ধরে' স্বচ্ছন্দ বর্ণনা বা বিবৃতির পরে ভাবের আবেগ উচ্চ কোটিতে আরোহণ করে। গদ্যে ভাবকে উচ্চ কোটিতে পৌঁছাবার জন্যে এতটা কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। কারণ তা অনেকটা ধীরগতিতে ও শান্তপদক্ষেপে চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন গদ্য রচনা পাওয়া যায় যার কোনো কোনো অংশে ভাবাবেগ হঠাৎ তীব্রভাবে দেখা দেয় এবং সে সময় গদ্য সংগীতসুলভ আকাশ-সঞ্চারী গতি প্রাপ্ত হয়, আর তাতে দেখা দেয় পদ্যের মতো গভীর ভাবোল্লাস।

গদ্য ও পদ্যের মৌলিক ভেদ হচ্ছে অন্তশ্ছন্দ ও সুরের গ্রাম নিয়ে। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো অংশে, পদ্যের মতো গদ্যেও গীতধর্ম বর্তমান। রচনার কোনো বিশেষত্ব যা এক সময়ে কেবল পদ্যেই দেখা যেত, এখন তা গদ্যেও দেখা যায়; যেমন স্বর-সুষমা (vowel music) এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দ-বিন্যাস (onomatopoeia)। রচনায় গীতধর্ম সঞ্চারের অন্যতম কৌশল হচ্ছে মিল (rhyme), কিন্তু এতে পদ্যসুলভ শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটে ব'লে গদ্যে তা অচল।

ভাষার উপর যে সংগীতের প্রভাব পড়েছে তার একটি সহজবোধ্য প্রমাণ হচ্ছে পদ্যে শব্দবিন্যাসের অভিনব পরিপাটী। একথা অনায়াসেই বোঝা যায় যে, বাক্য-সমূহের স্বাভাবিক পদবিন্যাস সংগীতের দাবী মেটাতে পারে না। তাই অতি আদি কাল থেকে কবিতা রচনায় গদ্যের চেয়ে পৃথক পদ্ধতিতে পদগুলিকে সাজানোর প্রথা চ'লে আসছে। যেমন:

> নিভৃত ঘরে ধূপের বাস রতন দীপ জ্বালা,
> জাগিয়া উঠি শয্যাতলে শুধাল রাজবালা—
> কে পরালে মালা॥

এ কবিতাংশটিতে পদগুলির স্বাভাবিক স্থান একটু পরিবর্তন ক'রে বসানোর ফলে তিনটি ধ্বনির সুমধুর মিল দেখা দিয়েছে। বাক্যে গীতধর্ম সঞ্চারের জন্যে, স্বাভাবিক পদ-বিন্যাসের পদ্ধতিকে এরূপভাবে বর্জন করা প্রায়শ একান্ত দরকার।

গদ্যের সঙ্গে গীতধর্মের কোনো স্বাভাবিক সম্পর্ক নেই। কারণ গদ্য বাক্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থপ্রকাশ মাত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে সকল সংস্কৃতনবীশ বা তাঁদের অনুকরণকারী, বাংলা গদ্য লিখছিলেন তাঁদের কেউ কেউ এ সোজা কথাটির প্রতি লক্ষ্য না রেখে মিল অনুপ্রাস যমকাদির প্রয়োগ ক'রে গদ্যকে অদ্ভুত করে তুলছিলেন। যেমন: '…৺বাবু নীলমণি হালদার মহাশয় ২৪ শ্রাবণ সোমবাসরে…ত্রৈলোক্যতারিণী তপনতনয়তাপিনী ত্রিদশতরঙ্গিণীতীরে নীরে স্বজ্ঞানে পরম প্রেমানন্দান্তঃকরণে সরসরসনে মুক্তাননে…ঈশ্বরের নামোচ্চারণপূর্ব্বক… লোকান্তর যাত্রা করিয়াছেন। ইতি।" (সমাচার দর্পণ, ১৮৩৭)। স্বনামখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গদ্য রচনাও প্রায়শ এরকমের অদ্ভুত ছিল। এদের সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের নানা লেখকের সাধনায় বাংলা গদ্য এ ধরণের দুর্লক্ষণ থেকে মুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য উপায়ে আধুনিক গদ্যের মধ্যে শ্রুতিমাধুর্য সঞ্চারের চেষ্টা চলছে। এ জিনিসগুলি এখন কেবল পদ্যেরই একচেটে সম্পত্তি নয়। অর্থকে যতদূরসম্ভব শ্রুতিসুখকর বা গীতধর্মী ভাষায় প্রকাশ করাই হচ্ছে আধুনিক গদ্যের উদ্দেশ্য। এই শ্রুতিমাধুর্য আনবার জন্যে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয় অন্তশ্ছন্দের প্রতি;

আর দরকারমতো ক্রিয়াকারকাদি পদের স্থানও বিপর্যস্ত করতে হয়। তারি ফলে পদ্যের ধ্বনিপ্রবাহ লীলায়িত হয়ে ওঠে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে গদ্য, পদ্যেরই মতো একটি শিল্পরূপ। এখানে মনে রাখা উচিত যে, সাহিত্যের গদ্য সাধারণ কথাবার্তার ভাষা থেকে একটু আলাদা; কারণ শিল্পের স্বাভাবিক দাবীর জন্যে এর নির্মাণে এসেছে কৃত্রিমতা।

আগেকার দিনে গদ্যের যে কেবল সাহিত্যিক অনুশীলন ছিল না তা নয়। এর উন্নতির সম্ভাবনাও ছিল না যথেষ্ট পরিমাণে। কারণ গদ্যের ব্যবহার ছিল নিতান্ত সাময়িক। যে রচনা স্থায়ী করবার ইচ্ছা থাকত লেখকের মনে, তাকে দিতেন তিনি পদ্যময়রূপ, যেটা লোকের স্মৃতিকে অবলম্বন করে সহজেই প্রচারিত হতে পারত। আজকাল ছাপাখানার প্রভাবে এ অসুবিধাটি কেটে গেছে। এখনকার দিনে গদ্যে কিছু রচনা ক'রেও লেখক সমানভাবে তার প্রচারের আশা করতে পারেন যদি তাতে লোকের চিত্তাকর্ষণযোগ্য কিছু থাকে এ কারণে সাহিত্যিক গদ্য সাধারণ আটপৌরে গদ্য থেকে (যা নিয়ত শোনা যায় হাটে বাটে সভা সমিতিতে) নিজেকে পৃথক করবার চেষ্টায় আছে। আর এ পার্থক্য আনবার প্রধান সহায় হচ্ছে কবিতায় গীতধর্ম সঞ্চারের কৌশলগুলি। এগুলি যিনি আয়ত্ত করতে পারেন তাঁরই গদ্য মুগ্ধ করে' থাকে রসজ্ঞ পাঠকবর্গকে।

পদ্য রচনায় হৃদয়াবেগ ও গীতধর্মের প্রভাব স্বীকার করে' নেওয়া হয় বলে' তার বচনভঙ্গী গদ্যের চেয়ে আলাদা হতে বাধ্য। হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে (যে প্রাবল্য শোক বা ক্রোধ প্রকাশের সময় বিশেষভাবে প্রকাশ পায়) বক্তার ভাষা যে-রূপ পরিগ্রহ করে তা সাধারণ আটপৌরে ভাষা থেকে অনেকটা পৃথক। তার শব্দসমূহ ভাবাবেগকেই একান্তভাবে আশ্রয় করে। তাই তাতে দেখা দেয় অনুপ্রাস, মিল, উপমা, রূপকাদি অলংকার। এজন্যে কবিতার ভাষায় এক বিশেষত্ব দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এর পেছনে যে মূলগত নীতি আছে কবিরা প্রায়ই তা ভুলে যান। যেমন, ভারতচন্দ্রের পর বহু বৎসর যাবৎ বাংলা কবিতার ভাষা হয়ে পড়ছিল প্রায়শ কতকগুলি মুদ্রাদোষের সমবায়। অনুপ্রাস-যমকের বাহুল্যে এবং বহু ব্যবহৃত উপমারূপকের ব্যবহারে ভারাক্রান্ত এ সকল কবিতায় রসসৃষ্টির ক্ষমতা ছিল নিতান্ত নগণ্য। এ কবিতাসমূহের ভাষায় যে বিশেষত্বগুলি আছে সে সকল কোনো ভাবাবেগের তাগিদে এসে পড়েনি; গতানুগতিকভাবেই তাদের লেখকেরা এ বিশেষত্বগুলিকে মেনে নিয়েছেন; যেহেতু আগেকার কবিদের রচনায়ও রয়েছে ঐ সব ভাষাগত সাজসজ্জা। পদ্যকে চলতি গদ্যের চেয়ে আলাদা রকমের হতে হবে, তাই তাঁরা সুপ্রাচীন মাল-মশলার সাহায্যে

কবিতাকে বিভিন্নরূপে সাজিয়েছেন। কাজেই এ সকল কবিতায় এমন অনায়াসলভ্য সৌন্দর্য নেই যা রসজ্ঞ ব্যক্তিকে সহজে আকর্ষণ করতে পারে। এদের সৌন্দর্য হচ্ছে সৌন্দর্যের আভাসমাত্র যার মূলে আছে কৃত্রিম বচনভঙ্গী, মিল, অনুপ্রাস বা তত্তুল্য গতানুগতিক অলংকারাদির ব্যবহার"। বাংলা কাব্যকে এ কৃত্রিমতা থেকে বাঁচাবার পথ দেখালেন মাইকেল ও বিহারীলাল; আর রবীন্দ্রনাথের হাতেই ঘটল এ কৃত্রিমতার অবসান। কিন্তু খুব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কবিগুরু নিজে যে কাব্যধারার প্রবর্তক এবং যে ধারা তাঁর হাতে চরম বিকাশ লাভ করেছে তার কলাকৌশলের বিরুদ্ধেও দেখা দিয়েছে প্রতিক্রিয়া। অতি আধুনিক একদল লেখক রবীন্দ্রনাথের ধরণে অন্ত্যচ্ছন্দ বিন্যাস করে' কবিতা লেখাকে কৃত্রিমতা বলে' পরিহার করবার পক্ষপাতী; মিলের সম্বন্ধে তাঁদের মমত্ব অনেক পরিমাণে শিথিল। অবশ্য এ প্রতিক্রিয়ার জন্যে মহাকবি নিজেও কিয়ৎপরিমাণে দায়ী; তাঁর গদ্য কবিতাগুলিই এর প্রমাণ। কিন্তু গদ্য ও পদ্যকে এই এক পংক্তিতে বসাবার চেষ্টা কখনো সফল হবে কিনা তাতে ঘোর সংশয় আছে। নিচে এর কারণগুলি দেওয়া যাচ্ছে:

(ক) ভাবাবেগের যে উচ্চগ্রামে কবিতার সুর বাঁধা হয়ে থাকে তার জন্যে দরকার শব্দশক্তির যতদূর সম্ভব নিঃশেষে ব্যবহার। উত্তম কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ-বিশেষ প্রায়শ তার 'অভিধা' বা মৌলিক অর্থের সঙ্গে সঙ্গে এমন বিপুল অর্থের ব্যঞ্জনা দেয় যা প্রকাশ করতে গদ্যে দশ বারোটিরও বেশী শব্দ দরকার হতে পারে। এজন্যে কবিকে খুব দেখে-শুনে ভেবে-চিন্তে শব্দ প্রয়োগ করতে হয়। তারি ফলে দেখা দেয় গদ্যরচনার চেয়ে পৃথক রকমের বচনভঙ্গী। কবি যে লিখেছেন: "জাগিয়া উঠি শয্যাতলে শুধাল রাজবালা", এখানে 'রাজবালা'র বদলে 'রাজকন্যা', 'রাজকুমারী', 'নরেন্দ্রনন্দিনী' আদি কোনো কথাই খাটবে না। শব্দ ব্যবহারের এই অ-পরিবর্তনসহত্ব বা অপরিবর্তনীয়তা, কাব্যের উৎকর্ষের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

(খ) পদ্য গদ্যের চেয়ে বেশি পরিমাণে গীতধর্মী। কাজেই কবি এমনভাবে শব্দ চয়ন করেন যেন তা শুধু অর্থের বা ভাবের দ্যোতক না হয় পরন্তু তাতে রচনায় গীতধর্ম সঞ্চারেরও সাহায্য করে; আর কেবল যথাযথ ভাবে অর্থ বোঝালেই সার্থক হয় গদ্য রচনা।

(গ) কবিতার সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যে কবিকে কেবল যে হৃদয়াবেগ এবং গীতধর্ম প্রকাশ করতে হবে তা নয়, পরন্তু তাতে থাকবে রঙের বিচিত্রতা। এক একটি কথায় আঁকা হবে এক একটি ছবির ইঙ্গিত। এ সকল কারণে কবিতায় গদ্যের চেয়ে সাবধানে শব্দচয়ন করতে হয়। উল্লিখিত কারণগুলির জন্যে কবিতার একটি

নিজস্ব বচনভঙ্গী থাকা দরকার ; কিন্তু একথা যেন কেউ মনে না করেন যে, ভালো গদ্য লিখতে হ'লে শব্দচয়নের কোনো বালাই নেই। আধুনিক লেখকেরা গদ্যকে যতই শিল্পোচিত রূপ দিতে চেষ্টা করছেন ততই তাতে গীতধর্মী ভাষা এসে পড়ছে তাই রবীন্দ্রনাথের মতো গদ্য লেখকগণের রচনাভঙ্গীতে বেশ সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতা আনবার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে একদল নব্য লেখক কবিতা রচনার বেলায় পদ্য নির্মাণের স্বাভাবিক ধারাকে একেবারে অস্বীকার করতে চান্। পদ্য ও গদ্যের ভেদকে দূর করার এ চেষ্টা কখনো কৃতকার্য হবে কিনা সে সম্বন্ধে সহজেই মনে সন্দেহ হয়।

যে দিন থেকে গদ্যের ব্যবহার আর শুধু বর্ণনামূলক রচনায় সীমাবদ্ধ নেই, তখন থেকেই একে কল্পনার ছবি দিয়ে সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে। উপমা ও রূপকাদির যথাযোগ্য প্রয়োগে যে ব্যঞ্জনা ও আবেগ সৃষ্ট হতে পারে তা পদ্য গদ্য উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে, গদ্যের পক্ষে অলংকার প্রয়োগ কবিতার মতো অত্যাবশ্যক নয় ; কারণ কবির হৃদয়াবেগ খুব ক্ষণস্থায়ী হয় বলে', শ্রোতাদের কল্পনাকে সে সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে অর্থালংকারের দরকার হয়। কবিকে উপমা-রূপকাদির সাহায্যে ছবির এমন রেখাবিন্যাস করতে হবে যে-রেখাগুলিকে শ্রোতাগণ কল্পনার সাহায্যে অনায়াসে পূর্ণ রূপ দিতে সমর্থ হন। আর গদ্যের মধ্যে যে মাঝে মাঝে উপমা-রূপকাদির ব্যবহার করতে হয়, সে হচ্ছে তাতে বৈচিত্র্য সঞ্চারের জন্যে। ধীরসঞ্চারী গদ্য যাতে একঘেয়ে না হয়ে পড়ে সে জন্যে অবলম্বিত কৌশলগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে মাঝে মাঝে অর্থালংকারের ব্যবহার।

গদ্য ও পদ্যের বিভিন্নতা বোঝবার পরে আলোচ্য, ভালো গদ্যের লক্ষণ। নিম্নোক্ত গুণগুলি বর্তমান থাকলেই গদ্যকে উচ্চশ্রেণীর ব'লে গণ্য করা যায় :

(১) প্রসাদ-গুণ বা প্রাঞ্জলতা—যে গুণ থাকলে লেখকের বক্তব্য অনায়াসেই বুঝতে পারা যায় এবং অর্থ ভাল ক'রে না বোঝবার বা একাধিক অর্থ বোঝবার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

(২) ভাষাগত ঔচিত্য—এমন ভাষার ব্যবহার করা যেটা বক্তব্য বিষয়ের ও বক্তার মনোভাবের সঙ্গে বেশ খাপ খায় অর্থাৎ গুরুগম্ভীর বিষয়কে ভারিক্কি চালে বলা এবং লঘুতর বিষয়কে হালকা চালে সরস করে' বলার কৌশল।

(৩) বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে শব্দসমূহের ধ্বনিগত সামঞ্জস্য—শব্দ ব্যবহার করবার সময় অর্থের সঙ্গে সঙ্গে তার ধ্বনির প্রতিও লক্ষ্য রাখা। উল্লিখিত দ্বিতীয় গুণটির অন্তর্গত এই গুণ।

(৪) বাক্য প্রয়োগের বৈচিত্র্য—নানা দৈর্ঘ্যের বাক্য ব্যবহার। কখনো বা ক্রিয়া এবং কারকের স্থান-বিপর্যাস, কখনো বা কোনো কোনো পদের পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি।

(৫) যথাসম্ভব প্রয়োগসিদ্ধ শব্দ প্রয়োগ—কোনো রকমের 'দোঁআশলা' শব্দ অর্থাৎ সংস্কৃত-প্রাকৃত বা দেশী বিদেশী শব্দের সন্ধি বা সমাস যথাসম্ভব বর্জনীয়। যেমন শব-পোড়ানো, ট্রামারোহণ ইত্যাদির মতো শব্দ প্রয়োগ।

(৬) ভাব প্রকাশের শৃঙ্খলা—পারম্পর্য অনুসারে ভাবসমূহকে সাজানো। এক একটি ভাব প্রকাশে এক একটি বাক্যের ব্যবহার। আর পরস্পর-সংশ্লিষ্ট ভাবগুলিকে একটি অনুচ্ছেদে (paragraph) প্রকাশ। তর্কবিধিসঙ্গত (logical) রচনার এই হ'ল মূলসূত্র। কিন্তু গদ্য যে, কোনো সময় তর্কবিধির উল্লঙ্ঘন করে না তা নয়। পাঁচমিশেলি অসংলগ্ন চিন্তাকে একত্র মিলিয়ে রূপ দেওয়ার ব্যাপারও আধুনিক গদ্যে কখনো কখনো দেখা যায়।

গদ্য ও পদ্য সম্বন্ধে উপরে যে আলোচনা করা হ'ল তা মনে রাখলে এ উভয়বিধ সাহিত্য রচনা ও উপভোগের ব্যাপার কিছুটা সহজসাধ্য হতে পারে।

১২শ অধ্যায়

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত বাংলা গদ্যের আদর্শ একদিনে দাঁড়ায় নি। আধুনিক কালে একশ বছরের উপর ধরে' গদ্য সাহিত্য সৃষ্টির যে সজ্ঞান চেষ্টা চলেছে তার ফলেই ক্রমশ এ আদর্শে উপস্থিত হওয়া গিয়েছে। কাজেই একে ভালো করে' বুঝতে হ'লে সংক্ষেপে সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করার দরকার আছে। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে আধুনিক গদ্য রচনার আরম্ভ ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে। সেই আরম্ভ সম্বন্ধে একটি খুব লক্ষ্য করবার মতো ব্যাপার এই যে, তখন মৌলিক রচনার চেয়ে অনুবাদের দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। কেরী প্রবর্তিত "ফোর্ট উইলিয়ম" গ্রন্থমালার অধিকাংশই অনুবাদ বা অনুবাদমূলক। কারণ তখনো রচনারীতির আদর্শ ও ব্যবহার্য শব্দ-সম্পদ্ ছিল অজ্ঞাত। অনুবাদের কাজে ভাষাকে লাগানো ছাড়া কোনো ভাষায় এ ত্রুটিকে আবিষ্কার করার সহজতর উপায় নেই। অনুবাদের বেলায় বিষয়বস্তু আগে থেকেই উপস্থিত, কাজেই লেখকের সমস্ত

শক্তি এক ভাষাকে আর এক ভাষায় বদল করবার কাজে লাগতে পারে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' ও হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ-পরীক্ষা' এ জাতীয় রচনার দুটি মুখ্য নিদর্শন। রামমোহন রায়েরও সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ অনুবাদ। কিন্তু তিনি বহু মৌলিক পুস্তক এবং পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন এবং এসকলের ভিতর দিয়েই দেখা দিয়েছিল ভালো বাংলা গদ্যের প্রথম লক্ষণ, প্রাঞ্জলতা, এবং কিয়ৎপরিমাণ লালিত্য। সর্বপ্রথম প্রকাশিত মৌলিক রচনা হিসাবে রাম রাম বসুর গ্রন্থও কিঞ্চিৎ প্রশংসার যোগ্য; তাঁর গদ্য আজকাল অদ্ভুত মনে হলেও 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ও 'লিপিমালা'র অধিকাংশ স্থল বেশ সহজবোধ্য স্বাভাবিক বাংলা; এ দিক দিয়ে তাঁর কৃতিত্ব সমসাময়িক সংস্কৃতনবীশদের চেয়ে বেশি বলে' মনে হয়। সে যাই হোক্, বাংলা গদ্যের সর্বোত্তম আদর্শ প্রবর্তন করলেন রামমোহন। মৃত্যুঞ্জয়াদির লেখায় যে বড় বড় সংস্কৃত সমাসের প্রয়োগ ছিল সে সব তাঁর লেখায় দেখা গেল না। আর তাঁর পূর্ববর্তী গদ্য লেখক রাম রাম বসুর লেখায় যে আরবী পারশী কথার প্রক্ষেপ ছিল তাও তিনি পরিহার করলেন। এজন্যে তাঁর হাতেই আধুনিক বাংলা গদ্যের গোড়া পত্তন হ'ল। কিন্তু এ গদ্য তখনো সাহিত্যিক ব্যবহারের সম্যক যোগ্যতা লাভ করে নি। রামমোহনের রচনাগুলি প্রায়শ বিচার-বিতর্কমূলক; কাজেই সে জাতীয় গদ্য বড় জোর তথ্য ও তত্ত্বের বাহন প্রবন্ধ রচনার পক্ষে উপযুক্ত ছিল। রামরাম বসু যে বর্ণনামূলক গদ্য লিখতে চেষ্টা করেছিলেন পরবর্তী কোনো লেখক সে সম্বন্ধে মনোযোগ দেন নি, নইলে হয়ত উপন্যাসের উপযোগী বাংলা বর্ণনার গদ্য অল্পকাল পরেই গ'ড়ে উঠ্‌তে পারত; সে জন্যে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আরম্ভ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত না।

রামমোহন যে গদ্য রচনার ধারা প্রবর্তন করলেন, তাঁর সময়ের বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকাদিতে, তথা সাময়িক পত্রিকাদিতেও অল্পবিস্তর তাই অনুসৃত হ'ল। কিন্তু এ সত্ত্বেও মৃত্যুঞ্জয়াদির প্রবর্তিত সংস্কৃত-প্রধান ও সমাসভারাক্রান্ত গদ্যও সমানভাবে প্রচলিত রইল। 'পণ্ডিতী গদ্য' নামে পরিচিত এ গদ্যের প্রধান দোষ ছিল অন্তচ্ছন্দের দুর্বলতা। বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক অন্তচ্ছন্দ-প্রবাহ এতে প্রায়শ অনুপস্থিত। সেই হেতু, কি বর্ণনার জন্যে কি মনোভাব বা হৃদয়াবেগ প্রকাশের জন্যে এ গদ্য ছিল নিতান্ত অনুপযোগী। মৃত্যুঞ্জয়ের নামে প্রচারিত 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' এ জাতীয় গদ্যের সুবিখ্যাত নমুনা। কিন্তু 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র গদ্যে নানা দোষ ত্রুটি থাকলেও এর লেখকের এক বিষয়ে প্রশংসা করতে হয়; কারণ তিনিই সর্বপ্রথমে (হয় ত নিজের অজ্ঞাতসারে) বাংলা গদ্যকে বিশুদ্ধ সাহিত্যের বাহনরূপে ব্যবহারের প্রয়াস করেছিলেন এবং তাঁর ভুল-ত্রুটিগুলি

সংশোধন ক'রেই পরবর্তী কালের বর্ণনায় ব্যবহার্য সুললিত সাধুভাষার সৃষ্টি হয়েছিল।

বাংলা পণ্ডিতী গদ্য যখন নানা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদের ভিতর দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করছিল, সে সময়ে গদ্যলেখক হিসাবে দেখা দিলেন কবিরূপে সুপরিচিত ঈশ্বর গুপ্ত। তাঁর গদ্যে কখনো কখনো অনুপ্রাস যমকাদি সংস্কৃত-গদ্যসুলভ শব্দালঙ্কারের প্রয়োগ থাকলেও তা পণ্ডিতী গদ্যের মতো ভারিক্কি চালের রচনা ছিল না। তাঁর সম্পাদিত সাময়িক কাগজ 'প্রভাকর' বা 'সংবাদ-প্রভাকর'ই ছিল এ জাতীয় গদ্যের মুখ্য বাহন। শব্দালঙ্কারের কথা বাদ দিলে এ গদ্য অনেকাংশে রামমোহন প্রবর্তিত গদ্যের অনুগামী; তবে সে গদ্যের চেয়ে ঈশ্বর গুপ্তের লেখার লেখার প্রাঞ্জলতা একটু বেশি। ঈশ্বর গুপ্তের সমকালীন 'ভাস্কর' পত্রিকা সম্পাদক পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশও আর একজন প্রসিদ্ধ গদ্য লেখক; তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হয়েও রামমোহন রায়ের অনুরাগী এবং কিয়ৎ পরিমাণে তাঁর প্রবর্তিত গদ্য রচনার ধারার অনুসরণকারী ছিলেন। পণ্ডিতী রীতিতে তিনি যে প্রথম গদ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাতেই কদাচিৎ দেখা গেল খাঁটি বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক অন্তশ্ছন্দ। এ অন্তশ্ছন্দ-বোধের পূর্বাভাস আছে রামমোহনের রচনায়। কিন্তু সে রচনার চেয়ে এক অংশে গৌরীশঙ্করের গদ্য ছিল আলাদা রকমের। তাতে হৃদয়-মনের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে গুরুগম্ভীর রকমের পদার্থ বর্ণনার শক্তিও কিয়ৎপরিমাণে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও গদ্য, রামমোহন রায় এবং তাঁর অনুগামীদের (যেমন ঈশ্বর গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর) হাতে সাহিত্যের বাহন হওয়ায় পরিপূর্ণ যোগ্যতা লাভ করে নি; তাতে নিম্নলিখিতরূপ গুণাগুণ দাঁড়িয়েছিল মাত্র :—

(১) অনেকটা সরল বচনভঙ্গী,
(২) ঘটনা ও বস্তু বর্ণনের ক্ষমতা,
(৩) বাক্য নির্মাণে সুষমাহীনতা,
(৪) অন্তশ্ছন্দের ন্যূনতা।

আরও কঠিনতর ক্ষেত্রে বাংলা গদ্যের ক্ষমতার পরীক্ষা বাকী রইল। এতদিন যাবৎ সহজলভ্য বিষয়বস্তু নিয়েই কাজ চলেছিল; হয় অনুবাদযোগ্য গ্রন্থ, নয় গল্প বা সমসাময়িক খবর বা সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক বিতণ্ডা এসকলই ছিল গদ্যের অবলম্বন। কিন্তু মৌলিক চিন্তার বাহন বা হৃদয়াবেগের প্রকাশ হিসাবে গদ্যের ব্যবহার তখনো করা হয় নি। কিন্তু কেবল সহজসাধ্য বর্ণনাদি ব্যাপারে ব্যবহৃত হ'ল, এবং পূর্বোক্ত ধরণের শক্ত কাজে না লাগলে গদ্য কখনো সহজ ও সচ্ছন্দ গতি লাভ করতে পারে না। কোনো কিছু ঘটনার বা চরিত্রের বর্ণনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু

ভাব-সমূহকে সুস্পষ্ট ও যথাযথ রূপে প্রকাশ করা বিশেষ সুসাধ্য নয়। এ শেষোক্ত ক্ষেত্রে গদ্যের বিশেষ ব্যবহারে হ'ল তত্ত্ববোধিনীর যুগে (১৮৪১—১৮৬৫)। এ যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক চার জন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও প্যারীচাঁদ মিত্র। এঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের বিশেষত্ব দু'কারণে:—(১) এঁরা যদিও ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন (একজন হিন্দু কলেজের আর একজন ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ছাত্র) তবু সেকালের নব্য ইংরেজী শিক্ষিতদের মতো ইংরেজী রচনা করবার মোহে পড়েন নি। তাঁদের দু'জনেরই মাতৃভাষা ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগ ছিল অসামান্য। সৌভাগ্য-বশত ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত হওয়ার ফলে তাঁদের রচনায় উত্তম ইংরেজী গদ্যের গুণ—স্পষ্টতা ও সরলতা ভলো ভাবে দেখা দিল। সে জন্যেই হয়েছে সত্যিকারের গদ্যরীতির উদ্ভব। (২) এঁরা দুজনেই অপেক্ষাকৃত শক্ত বিষয়বস্তু নিয়ে লিখলেন। দেবেন্দ্রনাথ করলেন ধর্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যা ও ধর্ম-সাধনার উপদেশ, এবং অক্ষয়কুমার ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ ও সমাজের বিবিধ সমস্যা এবং নানা বিজ্ঞানের আলোচনা। এঁরা দুজনেই বেশ সোজাসুজি ও সরল ভাষায় লিখে গেছেন এবং তাঁদের রচনা মৃত্যুঞ্জয়াদির মতো অন্তচ্ছন্দ-বর্জিত নয়; আর বক্তব্য বিষয়কে ত্বরিত ও যথাযথ ভাবে প্রকাশ করার ফলে তাঁদের গদ্যে এক নূতন সুষমা ও সৌন্দর্য দেখা গেল। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার ফলে তিনি যে বাংলা গদ্য লিখলেন তা অনেকটা পণ্ডিতী ধরণের গদ্য হলেও পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের রচনার মতো সে লেখা অন্তচ্ছন্দ-বর্জিত নয়। তাঁর "বেতাল পঞ্চবিংশতি" যদিও হিন্দী "বৈতাল পচ্চিসী" অবলম্বনে রচিত তবু এর ভাষায় এমন লালিত্য ও স্বাভাবিক ছন্দপ্রবাহ দেখা গেল যা পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থেই তেমন ক'রে দেখা যায় নি। এ বইএর ধরণে, কালিদাসের গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি যে 'শকুন্তলা'র উপাখ্যান রচনা করেছিলেন তাতেও গদ্য এরূপ মধুর এবং সুললিত। এ সকল বইএর গদ্যে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ ও দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ থাকলেও কোনো কোনো বিষয়ের বর্ণনায় এবং হৃদয়াবেগ প্রকাশের পক্ষে এ গদ্য নিজের উপযোগিতা প্রমাণিত ক'রল। তারি ফলে বাংলা গদ্যে উপন্যাস ও সরস প্রবন্ধ রচনার উপযুক্ত শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে দেখা দিল।

দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর এ তিন জনের হাতে বাংলা গদ্য অন্য সব দিকে পূর্ণতা লাভ করলেও তাঁদের শব্দপ্রয়োগ ব্যাপারে যে অতিরিক্ত সংস্কৃত-পক্ষপাত ছিল তার ফলে বাংলা গদ্যের স্বাভাবিকতা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ন হয়েছিল।

এ জাতীয় ভাষার প্রতিবাদ-কল্পে লিখতে আরম্ভ করলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। কিন্তু তাঁর 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র (১৮৫১) গদ্যও তেমন সর্বজনবোধ্য বা চলতি ভাষার অনুগামী হ'ল না, যদিও একথা স্বীকার করতে হবে যে তিনি বিদ্যাসাগর প্রভৃতির চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ভাবে লিখেছিলেন। গদ্যকে সরল করার দিক্ দিয়ে বিপ্লব আনলেন প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর সম্পাদিত 'মাসিক' পত্রিকায় (১৮৫৪)। এ কাগজেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গল্প। বাংলা গদ্যের উপর এ গ্রন্থের প্রভাব খুব গভীর ও সুদূরব্যাপী। তৎকালে প্রচলিত সাধুভাষা নানা তথ্য ও গুরুগম্ভীর কাহিনী প্রকাশ করবার উপযোগী হলেও, সাধারণ আটপৌরে জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-অশ্রু প্রকাশের পক্ষে তা ছিল একান্ত অনুপযুক্ত; সে জন্যেই 'আলালে' ব্যবহৃত হাল্‌কা ভাষা বাংলা গদ্যকে এক নূতন ও অপরিমিত সমৃদ্ধি দান ক'রল। সোজা কথায় বাংলা গদ্যে ভাষাগত ঔচিত্যের রাস্তা সুগমতর হ'ল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, সংস্কৃত-বহুল গদ্য রীতির মোহ এত প্রবল ছিল যে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এর আকর্ষণ থেকে পুরোপুরি অব্যাহতি পান নি। আর তাঁর প্রথম উপন্যাস তিনখানি সংস্কৃতবহুল ভারিক্কি গদ্যেই রচিত।

অনেকের ধারণা যে, চলতি ভাষাকে সাহিত্যের বাহন করাতেই প্যারীচাঁদের গৌরব, কিন্তু ব্যাপার তা নয়। সাধু ভাষাকে বাহুল্য-বর্জ্জিত ক'রে তার মধ্যে যে পরিমাণ রস ও বৈচিত্র্য তিনি এনেছেন তাঁর আগে সেটি কেউ করতে পারেন নি। বাংলা সাধু ভাষার গদ্য যে এমন সতেজ সুন্দর ও প্রাণবান্ হতে পারে তা তাঁর আগের কোনো লেখকের রচনা থেকে জানা যায় নি। তাঁর 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫) নামক গ্রন্থ খানিই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত। ঠিক এই বইখানির ভঙ্গীতে তিনি 'অভেদী' (১৮৭১) নামক যে লেখা লিখেছিলেন তাতেই রয়েছে আধুনিক উপন্যাসের ভাষার পূর্বসূচনা। 'বঙ্গ-দর্শনে'র (১৮৭২) আরম্ভকাল থেকে বঙ্কিমের গদ্যরীতি যে এ বইএর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তা স্থানান্তরে আলোচিত হয়েছে। এর ভাষা আজও পুরাণো হয় নি; খাঁটি সংস্কৃত শব্দকে দেশী ও তদ্ভব (প্রাকৃত) এবং দু'চারটে বিদেশী (আরবী পারশী বা ইংরেজী) শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে কিরূপ সুললিত অথচ জোরালো গদ্য লেখা যায় প্যারীচাঁদের ভাষা তার দৃষ্টান্ত। তাঁর প্রতিভার দ্বারাই বাংলা সাহিত্য পণ্ডিতী গদ্যের নাগপাশ থেকে মুক্তি অর্জনের প্রেরণা পেয়েছে।

প্যারীচাঁদের পরবর্তীকালে লিখতে আরম্ভ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনায় সর্বোচ্চ খ্যাতি লাভ করলেও রচনাভঙ্গীর উদ্ভাবক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব খুব অসাধারণ নয়। এক দিকে অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরাদির গদ্য, অপর দিকে প্যারী-

চাঁদের গদ্য তাঁর বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এ বিষয়ে পূর্বগামীদের কাছে তাঁর ঋণের কথা তিনি নিজেই স্বীকার ক'রে গেছেন। কিন্তু ঋণ সত্ত্বেও প্রতিভার গুণে লিপিভঙ্গী দ্বারা তিনি নিজের বিশেষত্বকে প্রকটিত ক'রে গেছেন। ঐতিহাসিক, ইতিহাসগন্ধী, সামাজিক আদি নানা শ্রেণীর উপন্যাসে এবং ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা সাহিত্যাদি বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধ রচনায় তিনি বাংলা গদ্যকে বহু পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন এবং তাঁর শিল্পকৌশলে ও বিদ্যাবত্তার জন্যে বাংলা গদ্য যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টির কাজে উত্তীর্ণ হ'ল। তাঁর গদ্যের মুখ্য গুণগুলি এই :—

(১) প্রকাশক্ষমতার বৈচিত্র্য ও বিপুলতা : বিভিন্ন দেশ, কাল, পাত্র ও তত্তৎ-সম্পর্কিত নানা অবস্থা, হৃদয়াবেগ ও যুক্তিতর্কাদির বর্ণনায় সমান দক্ষতা ;

(২) শব্দসম্পদের প্রাচুর্য : সংস্কৃত, তথা খাঁটি বাংলা (প্রাকৃত ও দেশী) ও বিদেশী শব্দের ব্যবহার ;

(৩) অনুচ্ছেদ-বন্ধের পারিপাট্য : অনুচ্ছেদকে (paragraph) বহুমুখী ভাবের বাহন ক'রেও তার ঐক্য বজায় রাখা, অথবা কোনো ভাবকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পল্লবিত ক'রেও অনুচ্ছেদের গঠনগত সুষমা বজায় রাখা।

(৪) ভাষা ব্যবহারের ঔচিত্যবোধ ; রসানুকুল ভাষা প্রয়োগ (যথা, গুরুগম্ভীর বিষয়ে গুরুগম্ভীর ভাষা আর হালকা বিষয়ে হালকা ভাষা ইত্যাদি)।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বাংলা গদ্যরীতিতে নবীন ঐশ্বর্য এনেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অসামান্য কবিত্ব-প্রতিভা ও সঙ্গীতাদিতে যশের বাহুল্যবশত এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব সাধারণের চোখে তেমন ক'রে পড়ে নি। তাঁর অবলম্বিত গদ্য রীতিতে যে পরিমাণ বৈচিত্র্য দেখা যায় তা কোনো লেখকের মধ্যে এ পর্যন্ত দেখা যায় নি। যদিও তাঁর গদ্য রীতির দুই মুখ্য রূপ নানা খুঁটিনাটি ধ'রে বিচার করলে এ দু'য়ের অবান্তর ভেদ অনেক। কিন্তু সে সকল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা উপস্থিত ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে। তাঁর লিখিত সাধু ভাষার গদ্যের রূপটিই সর্বাগ্রে আলোচ্য। এর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, অতিদীর্ঘ সমাসের বর্জন, শব্দ প্রয়োগের লালিত্য, অনুচ্ছেদ-মধ্যস্থ বাক্য-প্রবাহের স্বাভাবিক গতি, শ্রুতিমাধুর্য (অন্তশ্ছন্দমূলক)। তার উপর অলঙ্কার প্রয়োগের নৈপুণ্যে তিনি তাঁর গদ্যকে মাঝে মাঝে কবিতার মতো হৃদয়-গ্রাহী ক'রে তুলেছেন। এ বিষয়েও দৃষ্টান্ত সহকারে অন্যত্র আলোচনা করা গিয়েছে। কৌতূহলী পাঠক সে সব দেখে নেবেন। আধুনিক বাংলা গদ্য লেখকগণের এক প্রধান দল কবিগুরুর প্রবর্তিত এ রীতিটিকেই ভেঙ্গে-চুরে চালাচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প উপন্যাসের গদ্যে যে বিবিধ ও বিচিত্র রীতির ঐশ্বর্য দেখিয়ে ছিলেন তাঁর প্রবন্ধাদিতেও তা যথাসম্ভব সমানভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তার ফলে

বাংলা ভাষায় ঘটেছে এক অভিনব প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিকাশ। কিন্তু সাধুভাষার গদ্য রবীন্দ্রনাথের হাতে সাহিত্য-সৃষ্টির অনুকূল সাধন হিসাবে চরম পরিণতি লাভ করলেও তাঁর গদ্য রচনার প্রতিভা এখানেই থেমে রইল না। তিনি চলতি ভাষাকে অবলম্বন ক'রে আর এক শক্তিশালী গদ্যরীতির প্রবর্তন করলেন। এ রীতিতে যে কেবল চলতি ভাষার ক্রিয়া ও সর্বনামাদি পদই সর্বস্ব তা নয়। বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে এতে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয় না, আবার সাহিত্যিক সৌন্দর্য আনবার জন্যে কখনো কখনো সুপ্রচলিত নয় এমন সংস্কৃত শব্দও ব্যবহার করা হয়। আর এতে উপমা রূপকাদিরও কোনো বাহুল্য নেই; যথাসম্ভব সাদাসিধে কথার সঙ্গে মানান-সই সাদাসিধে উপমাদিই ব্যবহৃত হয়। বাক্য-বৈচিত্র্যের জন্যে এতে ক্রিয়া ও কারকের স্থান-বিপর্যাস হয়ে থাকে।

এ নূতন গদ্যরীতি প্রবর্তনের ফলে বাংলা গদ্যের শক্তিতে নূতন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। সাধু ভাষার অন্য যে কোনো গুণ থাক না কেন, চলতি ভাষার চেয়ে এ ভাষা একদিক দিয়ে একটু দুর্বল। মুখের কথার মধ্যে মানুষের প্রাণের যে একটা সচ্ছন্দ ও অকৃত্রিম লীলা প্রকাশ পায় সাধুভাষায় তা প্রায়শ দুর্লভ। আধুনিক বাংলা গদ্যের একাধিক লেখক খুব সার্থকভাবে এ রীতিতে রচনা ক'রে যাচ্ছেন। তবে যাঁরা গদ্য লেখায় নূতন হাত দিতে চান তাঁদের পক্ষে সাধুভাষা নিয়ে আরম্ভ করাই নিরাপদ। সাধুভাষার শ্রেষ্ঠ আদর্শটিকে অনুসরণ করে' গেলেই ক্রমে ক্রমে চলিত ভাষার গদ্য রচনা করা সহজসাধ্য হয়ে পড়বে।

১৩শ অধ্যায়

প্রবন্ধ

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবন্ধ জাতীয় রচনা বর্তমান থাকলেও essay অর্থে 'প্রবন্ধ' কথাটি কখনো ব্যবহৃত হয় নি। পতঞ্জলিকৃত 'মহাভাষ্যে'র ভূমিকা, শঙ্করের বেদান্ত ভাষ্যের মুখবন্ধ ও সায়নের ঋগ্বেদ-ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাত আদিতে আধুনিক সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধের পদ্ধতি অনুসৃত হ'লেও এজাতীয় রচনাকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাই essay বোঝাবার মত শব্দ সংস্কৃতে তথা ভারতের কোনো পুরাণো প্রাদেশিক ভাষায়ই হয়ত নেই। প্রবন্ধ শব্দের নতুন অর্থটি বোধ হয় প্রচলিত করেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর কয়েকটি রচনাই সর্বপ্রথম 'বিবিধ-প্রবন্ধ' নামে ছাপা হয়। সংস্কৃত 'প্রবন্ধ' শব্দের দ্বারা যে কোনো রচনাকে

বোঝাতে পারা যায়, প্রাগ-আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও এ ব্যবহার বজায় ছিল। যেমন বাংলা মহাভারতে আছে—'পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস'। কাজেই অনুমান করতে হবে যে, প্রবন্ধ নামক সাহিত্য-রূপটি ও তার নাম উপন্যাসাদির মতো ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবেই বাংলায় দেখা দিয়েছে। আধুনিক বাংলা গদ্যের পিতৃকল্প রামমোহনই বাংলা প্রবন্ধ-রচনারও আদিগুরু। তাঁর 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫) ও 'ঈশোপনিষদের' (১৮১৬) ও 'মাণ্ডুক্যোপনিষদে'র (১৮১৭) ভূমিকা এবং 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' (১৮২১) এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত। তবে রামমোহনের এসকল রচনা সংকীর্ণ অর্থে সাহিত্য নয়, অপেক্ষাকৃত রসহীন উপদেশাত্মক প্রবন্ধ। এগুলির উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ধর্ম-সম্পর্কিত মতবাদের প্রচার। কিন্তু কখনও কখনও কল্পিত ব্যক্তিদ্বয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তিচ্ছলেও তিনি মতবাদ প্রচারের জন্ম পুস্তকাদি লিখে গেছেন। এ রচনাগুচ্ছকেও তাঁর প্রবন্ধ ব'লে ধরা যেতে পারে। কারণ উপদেশমূলক প্রবন্ধ যে হিসাবে সার্থক, এগুলিও সে হিসাবেই প্রয়োজন-সাধক। কাজেই দেখা যায়, রামমোহনের প্রবর্তিত গদ্য প্রবন্ধের দুটি রূপ: (১) একোক্তিমূলক, (২) সংলাপাত্মক বা উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক। প্রবন্ধের শেষোক্ত রূপটি বাংলা সাহিত্যে তাঁর পরবর্তী কালেও একাধিক লেখকের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে। আগেই বলেছি যে, রামমোহন বিশুদ্ধ সাহিত্য রচনা করেন নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সংলাপাত্মক প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'পাদরি ও শিষ্য সংবাদ' নামক রচনায় উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক রস পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ সাহিত্যিক প্রবন্ধ বা রসাত্মক প্রবন্ধ রচনা করবার মতো শক্তি বাংলা গদ্যে ঊনবিংশ শতকের আগে তেমন ক'রে দেখা দেয় নি, কিন্তু উত্তম উপদেশাত্মক প্রবন্ধ রচনার মতো গদ্য ১৮৪০ সালের দিকেই দেখা গিয়েছিল। ১৮৪১ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক উৎসবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত যে দুটি বক্তৃতা করেন সেগুলিই এ বিষয়ে প্রমাণ। এ দুজনের সমবেত চেষ্টায় ও অক্ষয়কুমারের সম্পাদকতায় যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকেই বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের যথার্থ উন্নতি আরম্ভ হয়। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশে এ পত্রিকার দান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

দেবেন্দ্রনাথ সংকীর্ণ অর্থে কোনো সাহিত্যিক প্রবন্ধ না লিখলেও ধর্মবিষয়ক তাঁর বক্তৃতা ও উপদেশগুলিতে সাহিত্যিক রসের অসদ্ভাব নেই। নিতান্ত সংযতভাবে হ'লেও এসকলের মধ্যে মনোজ্ঞ কল্পনা ও রচনা-ভঙ্গীর মাধুর্য বর্তমান। উপদেশাত্মক প্রবন্ধ হিসাবে এগুলি বেশ প্রশংসার যোগ্য। দেবেন্দ্রনাথের সুযোগ্য সহকর্মী অক্ষয়কুমারের যে সব প্রবন্ধের জন্তে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম-সাময়িক শিক্ষিত

জনগণের অসাধারণ প্রিয় হয়েছিল, সেগুলিও উপদেশাত্মক প্রবন্ধের প্রশংসার্হ নিদর্শন। তাঁর রচনা দেবেন্দ্রনাথের মতো সুললিত না হ'লেও ভাষা ও যুক্তির স্বচ্ছতা এবং প্রকাশভঙ্গীর বলিষ্ঠতার জন্যে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য ব'লে গণ্য হওয়ার যোগ্য। তাঁর 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ও 'ধর্ম্মনীতি' প্রভৃতি রচনা এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত। বেশির ভাগই উপদেশাত্মক প্রবন্ধ রচনা করলেও অক্ষয়কুমার রসাত্মক রচনা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। 'চারুপাঠে'র অন্তর্গত 'স্বপ্নদর্শন' নামে প্রবন্ধ তিনটী এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এই প্রবন্ধ কয়টি পরোক্ষভাবে উপদেশাত্মক হ'লেও কিছু পরিমাণে রসোদ্বোধকও বটে। তবে এর গঠন প্রণালী কোনো কোনো অংশে তাঁর বিশুদ্ধ উপদেশাত্মক প্রবন্ধগুলিরই মতো, আর এতে ভাষার গাম্ভীর্য এবং সুবোধ্যতাও যুগপৎ বর্তমান। অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধরীতি তাঁর পরবর্তী অনেক লেখককে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর পরেই প্রবন্ধকার হিসাবে প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম করা উচিত। কিন্তু একোক্তিমূলক প্রবন্ধ তিনি খুব কমই লিখেছেন। তাঁর 'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত' (১৮৭৮) এর একমাত্র উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। তাঁর প্রবন্ধগুলি সংলাপাত্মক। উপদেশাত্মক প্রবন্ধের এ রূপটি রামমোহন রায়ের রচনায়ই প্রথম লক্ষ্য করা গিয়েছে। দুজনের উক্তি প্রত্যুক্তির ভিতর দিয়ে বক্তব্য বিষয়কে বোঝাতে গেলে প্রবন্ধের গঠনে একটু শিথিলতা আসে বটে, তবে তার ফলে রচনায় যে বাস্তবতার আভাস পড়ে, সেটি প্রবন্ধকে সহজবোধ্য ক'রে তোলে। তাঁর 'রামা-রঞ্জিকা' (১৮৬০) নামক গ্রন্থের প্রথম ষোলোটি প্রবন্ধ কোনো স্বামী-স্ত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি রূপে রচিত। কিন্তু এক সহজবোধ্যতা ছাড়া এসব প্রবন্ধে আর কোনো গুণ বড় একটা নেই। এগুলি বাদে প্যারীচাঁদ মিত্র 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১) আদি যে সকল উপদেশাত্মক আখ্যান লিখে গেছেন তাদেরও এক রকমের প্রবন্ধ ব'লে ধরা যেতে পারে। কারণ সেগুলিতে উপন্যাস-সুলভ চরিত্র-চিত্রণ বা আধুনিক গল্পের ঘটনাশ্রয়ী জমাটভাব নেই ; উপদেশ বা তত্ত্বকথাই সেগুলির একমাত্র লক্ষ্য, তবে আনুষঙ্গিক-ভাবে এতে দেশকালের এমন সুন্দর ও সুললিত বর্ণনা আছে যা উপন্যাসের রচনায় ও শোভা-বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও বাংলা প্রবন্ধের ক্রমবিকাশে সাহায্য করেছেন। তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশিত বই 'শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬) একটি সুবৃহৎ প্রবন্ধ ; তবে এ প্রবন্ধ উপদেশাত্মক বা তথ্য-প্রতিপাদক। অক্ষয়কুমারের প্রবর্তিত উপদেশাত্মক প্রবন্ধ রচনার পদ্ধতি তাঁর হাতে অনেকটা পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর গদ্যের মধ্যে যে পরিমাণ সহজ গতি ও সুস্পষ্টতা দেখা যায় তা পূর্ববর্তীদের লেখায়

তেমন ক'রে আমরা পাই নি। কিন্তু এগুলিকে বিশুদ্ধ সাহিত্যের শ্রেণীতে ফেলা যায় কি না সন্দেহ। তবু ইতিহাস বিজ্ঞান আদির আলোচনার জন্য তাঁর গদ্য যে আদর্শ তা অস্বীকার করা যায় না। 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদক হিসেবে এ রকম গদ্য লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যের মহদুপকার ক'রে গেছেন।

বাংলা প্রবন্ধে নূতনতর সমৃদ্ধি যোগালেন বঙ্কিমচন্দ্র। একোক্তিমূলক এবং সংলাপাত্মক দুরকম প্রবন্ধই তিনি লিখে গেছেন। তাঁর 'অনুশীলন' বা 'ধর্মতত্ত্ব' এবং 'গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি' নামক প্রবন্ধ-পর্যায় উপদেশমূলক ও সংলাপাকারে রচিত। এ দুটি রচনায় তিনি রামমোহন প্রবর্তিত দ্বয়োক্তিমূলক প্রবন্ধের ধারা অনুসরণ করেছেন। বক্তব্য বিষয় বোঝাবার পক্ষে প্রবন্ধের এ রূপটি বিশেষ উপযোগী হ'লেও এতে সাহিত্যিক সৌন্দর্য সঞ্চার একটু কষ্টকর হয়ে পড়ে; তবে জায়গায় জায়গায় হাস্যরসের প্রক্ষেপ দিয়ে রচনাকে একটু চিত্তাকর্ষক করা যায়। সংলাপাত্মক রচনা যে হাস্যরস সৃষ্টির পক্ষে উপযোগী তা বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। 'লোকরহস্যের' অন্তর্গত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর', 'নিউ ইয়ার্স ডে', 'গ্রাম্যকথা' আদির ভাষা এর প্রমাণ।

তথ্য-প্রচার এবং রস-সৃষ্টির জন্যে দ্বয়োক্তিমূলক গদ্য লিখলেও বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ প্রবন্ধই একোক্তিমূলক। এ জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে অধিকাংশই উপদেশাত্মক বা তথ্য-প্রতিপাদক, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সমস্ত রচনার স্থানে স্থানে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যরস পাওয়া যায়। তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'বিবিধ প্রবন্ধে'র অন্তর্গত অনেক রচনা এ কথার দৃষ্টান্তস্থল। বিজ্ঞানের মতো অপেক্ষাকৃত নীরস জিনিসও লিপিকৌশলে কেমন সরস হ'য়ে উঠ্তে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞান-রহস্য' ইত্যাদি রচনা তার প্রমাণ। তবু এ সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রই একোক্তিমূলক বিশুদ্ধ সাহিত্যিক বা রসাত্মক প্রবন্ধের প্রবর্তক। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' তিনি যে সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করলেন তা ভারতীয় সাহিত্যে অপূর্ব। নাটকের বাইরে কল্পিত ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়ে নানা পারিপার্শ্বিক ব্যাপার সম্বন্ধে সরস সমালোচনার পদ্ধতি আমাদের দেশে আগে কখনো ছিল না। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র তা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর 'গদ্য পদ্য' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মেঘ বৃষ্টি', এবং 'খদ্যোৎ'ও এক নতুন ধরণের রচনা। এর উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ রসসৃষ্টি। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে রূপগত উন্নতি ও রসগত মাধুর্য সৃষ্টি দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যকে কী পরিমাণ এগিয়ে দিয়েছেন তাঁর ও তাঁর পরবর্তী সাহিত্যের দিকে সতর্কভাবে তাকালেই তা ভালো ক'রে বোঝা যাবে। বঙ্কিমের সমকালীন কালীপ্রসন্ন ঘোষও বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে মৌলিকত্ব দেখিয়ে গেছেন; এঁর রচনায় একাধারে যে পরিমাণ ভাষাগত পারিপাট্য, কল্পনা-

বিলাস ও গাম্ভীর্য রয়েছে তা প্রায় আর কোন বাঙালী লেখকের রচনায়ই পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ এক সময় খুব সমাদৃত হ'লেও বেশি ভারিক্কি চালে লেখা ব'লে আজকালকার লোকে সে সম্বন্ধে প্রায়শ উদাসীন ; তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, যাঁরা ভালো বাংলা গদ্য রচনার ভঙ্গী আয়ত্ত ক'রতে চান, কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধাবলী পড়লে তাঁরা নানা মূল্যবান্ ইঙ্গিত পাবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্নের পরে বাংলা প্রবন্ধে নূতনত্ব আন্‌লেন রবীন্দ্রনাথ। যথেষ্ট গদ্য (প্রবন্ধ, উপন্যাস ও গল্প) রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি। সেজন্যে তাঁর লিখিত গদ্য প্রায়শ কাব্যের মতোই সরস। তাঁর প্রবন্ধের প্রধান গুণ সুমার্জিত অথচ যথাসম্ভব সরল ভাষায় কিঞ্চিৎ সালঙ্কারে বক্তব্য বিষয়কে প্রকাশ। এতে একদিকে যেমন আছে প্রকাশভঙ্গীর পারিপাট্য, অপর দিকে আছে বক্তব্য বিষয়ের সুস্পষ্টতা। কেবল প্রবন্ধের সাধারণ গঠন-ব্যাপারে নয়, রসাত্মক প্রবন্ধের নানা নতুন রূপের উদ্ভাবন দ্বারাও তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এসব রূপের নূতনত্ব অনেকটা বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তুর জন্যে ঘটেছে। কাজেই তাদের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ক'রতে হ'লে বিষয়বস্তুর দিকে নজর দিতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনী-সংশ্লিষ্ট। তা সত্ত্বেও এগুলি কেবল ভ্রমণ-কাহিনী নয়, অর্থাৎ সাল, তারিখ ও ঘণ্টা মিনিটের হিসাব ধ'রে জায়গা বদলানো এবং সেই সম্পর্কিত বাহ্যদৃশ্যাদির বর্ণনা-মাত্র নয়। কবি তাঁর ভ্রমণকালে যেমন বাইরের জগতের রূপধারার দিকে তাকাতে তাকাতে চলেন, মানস-চক্ষে নিজ অন্তরের চিন্তাধারা ভাবধারার দিকেও তেমন দৃষ্টি দিতে দিতে চলতে থাকেন। মুখ্যত বাইরে দৃষ্ট রূপধারা তাঁর মনে যে বিবিধ ও বিচিত্র ভাবরাজিকে জাগিয়ে তোলে সে সবই তিনি সরসভাবে লিপিবদ্ধ করেন তাঁর ভ্রমণ সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীতে। এতে কেবল কবিসুলভ কল্পনাবিলাস এবং রচনা-পারিপাট্য নয়, পরন্তু ধর্ম, দর্শন, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প আদি যাবতীয় বিষয়ের আলোচনাই অনায়াসে ভিড় ক'রে আসে অথচ তাঁর লেখার কৌশলে নিতান্ত স্বাভাবিক ব'লে বোধ হয়। কেবল মাঝে মাঝে ভ্রমণ-পথের বা স্থান-বিশেষের বা কোনো ঘটনার বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, লেখকের প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনী-সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ ভ্রমণের কালে রচিত। এ রকম প্রবন্ধের একটি বিশেষ গুণ এই যে, মামুলী তথ্য-প্রতিপাদক বা উপদেশক প্রবন্ধের মতো এর দীর্ঘতা ক্লান্তিদায়ক নয়। পরন্তু কালগত ও বিষয়গত পরিবর্তন নিতান্ত সহজভাবে এসে পড়ায় পাঠকের মনোযোগ এবং কৌতূহল বহুক্ষণ ধ'রে বেশ নিরবচ্ছিন্ন গতিতে ও অক্লান্তভাবে প্রবন্ধকে অনুসরণ ক'রে চলতে পারে ; যেমন বাষ্পযানযোগে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে কোনো আধুনিক বন্দরে পৌঁছে' যখন সে জায়গাটির কুশ্রীতা তাঁর কবি-

সুলভ সৌন্দর্যবোধকে আঘাত করে তখনই তাঁর মন ছুটে যায় আধুনিক বণিক-ব্যবস্থায় যন্ত্রসংকুল আক্রমণে বিগতশ্রী ভাগীরথীর তটভূমির দিকে ; তার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ তিনি তুলনা করেন আধুনিক বণিক সভ্যতার প্রতীকরূপী ম্যানচেষ্টারের সঙ্গে প্রাচীন বণিক সভ্যতার প্রতীকরূপী ইতালির ভেনিস (Venice) সহরের। রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রাবলীও প্রায় এ ধরণের রচনা। এখানে উল্লেখ থাকা উচিত যে, তাঁর ভ্রমণ-সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিও পত্রাকারেই রচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'যাত্রী' নামক বইটিতে সংগৃহীত প্রবন্ধগুলির সঙ্গে তাঁর লেখা চিঠিপত্রের বেশীর ভাগেরই খানিকটা পার্থক্য আছে। পত্রগুলিতে ব্যক্তি-বিশেষকে উপদেশ দেওয়ার বা আনন্দ দেওয়ার একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, সেজন্যে তাদের মধ্যে প্রায়শ কল্পনা-বৈচিত্র্য এবং চিন্তার ঐশ্বর্য তেমন অজস্রভাবে ফুটতে পারে নি। কিন্তু তাই ব'লে তাঁর পত্রগুচ্ছ প্রবন্ধ হিসাবে অঙ্গহীন হয় নি, বরং তাঁর সুবিশাল ও বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের সাময়িক ও স্বল্পায়তন প্রকাশ হিসাবে রসজ্ঞ পাঠককে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। স্বামী বিবেকানন্দের কোনো কোনো পত্রও এ হিসাবে উপাদেয়, কিন্তু তাতে শিল্প-সৃষ্টির প্রয়াস না থাকায় সে সব প্রায়শ সাহিত্য-পর্যায়ে উন্নীত হ'তে পারেনি। তবে তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'পরিব্রাজকে' সজ্ঞান চেষ্টা না থাকা সত্ত্বেও বেশ সাহিত্য-রস ফুটে উঠেছে।

ভ্রমণ -সাহিত্যও পত্র-সাহিত্যের পরেই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্য। এ সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি দু'শ্রেণীর : (১) গ্রন্থ বিশেষের বা লেখকের গুণাগুণ আলোচনা (২) কোনো গ্রন্থের রসাস্বাদন। প্রথমোক্ত প্রবন্ধগুলি অনেকটা তথ্যমূলক। তাই তাতে সাহিত্য-রস সৃষ্টির অবকাশ অল্প। এ কারণে সেগুলিকে বিশুদ্ধ প্রবন্ধের পর্যায়ে ফেলা যায় না। কিন্তু উত্তম গ্রন্থ-বিশেষ (যেমন মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা আদি) পাঠ ক'রে কবি যে তৃপ্তি, যে জ্ঞান লাভ করেছেন তাকে তিনি যখন আনন্দের আবেগে সুললিত ও পরিপাটি ভঙ্গীতে প্রকাশ করেন তখন তা' এক নূতন সাহিত্যিক সৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়। এ জাতীয় প্রবন্ধ, গ্রন্থ-বিশেষ ও তার লেখক সম্বন্ধে যে সরস কৌতূহল উদ্রেক করে কেবল তা সাহিত্যের নয়, জাতীয় সংস্কৃতির পক্ষেও অসীম উপকারের উৎস। এ সমস্ত প্রবন্ধে তথ্যের অজস্রতা ও বিপুলতা না থাক্‌লেও যে দু'একটি ভাব আলোচিত হয় তাদের প্রকাশ-ভঙ্গী তথা আন্তরিকতা পাঠককে মুগ্ধ না ক'রে পারে না। এ রকম রচনা বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আগে কখনো ছিল না ; তাঁর ভ্রমণ-সাহিত্য ও পত্র-সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা।

১৪শ অধ্যায়

উপন্যাস

আধুনিক কালে গল্প-সাহিত্য যে, জনপ্রিয়তায় পদ্যকে হার মানিয়েছে তার কারণ গল্প উপন্যাসের অজস্র প্রসার। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাকর' পত্রিকার সময় পর্যান্তও পদ্য রচনার প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমাদর ছিল; দেশের অধিকাংশ লোক এ কাগজে প্রকাশিত পদ্য পড়বার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকত, কিন্তু এখনকার দিনে কবিতার পাঠক-সংখ্যা খুব বেশি নয়। সাধারণ পাঠককে যে জিনিষ বিশেষভাবে আকর্ষণ করে, তা হচ্ছে গল্প ও উপন্যাস। কিন্তু এ জন্য আক্ষেপ করবার কোনো কারণ নেই। পাঠকদের চাহিদা বুঝে লেখকেরা গল্প-উপন্যাসের রচনায় যতই মনোযোগ দিচ্ছেন এবং তাঁদের সর্বোত্তম শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছেন, ততই এ জাতীয় সাহিত্য নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠবার কারণ ঘটছে।

গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে একটা মৌলিক সম্পর্ক থাক্‌লেও এ দুটি কথা পূরোপূরি সমার্থক নয়। উপন্যাস হচ্ছে কোনো এক বিশেষ ধরণে বর্ণিত গল্প। গল্প উপাদান, আর উপন্যাস হচ্ছে সেটিকে বলবার বিশেষ পদ্ধতি। লোকে যখন সত্য ঘটনাকে খানিক অতিরঞ্জিত ক'রে বা একটু বাদ-সাদ দিয়ে বিকৃত ক'রে বলে, তখনই তা হয়ে দাঁড়ায় গল্প। সে যাই হোক, মানব-সভ্যতার অতি প্রাচীন যুগে যে গল্প উপকথাদি প্রচলিত ছিল, তার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় উপন্যাসের বীজ। সেকালের আখ্যান-গীতি অথবা দেবমহিমার গান (তথাকথিত মঙ্গলকাব্য) যাঁরা রচনা করতেন, তাঁরাই ছিলেন বাংলা-সাহিত্যের আদি গল্প-লেখক। মুখ্যত ইতিহাসের নানা ভাঙা টুকরো টাক্‌রাকে একত্রে জুড়ে গেঁথে তৈরী হয় গল্প। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আদি অন্ত দুইই দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু গল্পেতে দুটিকেই জানা চাই। ইতিহাসের বিবিধ ও বিচিত্র ঘটনাপর্যায়ের সবগুলিকে গুছিয়ে ব'লে শ্রোতাদের খুসী ক'রে তোলা কারুর পক্ষেই সুসাধ্য নয়। কাজেই গল্প-রচক বিরাট দেশকালে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ও চরিত্রগুলি থেকে উপাদান নির্বাচন ক'রে সেগুলিকে স্বল্পপরিসরে এবং সহজবোধ্য পরিবেশের মধ্যে গল্পরূপে ফুটিয়ে তোলেন। অলংকার-শিল্পী যেমন গয়না গড়তে গিয়ে জহরতাদির কাট-ছাঁট ও মাজাঘসা করে, তেমনি লেখকও ঘটনাগুলির এক-আধ অংশ বাদ দেন বা চরিত্রগুলিকে খানিক খানিক নূতন রূপ দেন—যাতে তারা কল্পিত পরিবেশের মধ্যে মানানসই ভাবে বসে। এই ছিল আদি যুগের গল্প।

গোপীচন্দ্রের গান এ জাতীয় গল্পের একটি প্রাচীন দৃষ্টান্ত। এ গল্পের কোনো কোনো অংশ, যেমন রাজার ছেলে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-গ্রহণ এবং তাঁর মাতার গুরুভক্তি—এগুলি খুব সম্ভব ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু এগুলিকে একত্র মিলিয়ে তার উপর কল্পনার রঙ্ চড়িয়ে রচয়িতা সমস্ত জিনিষটিকে নূতন রূপ দিয়েছেন। বাংলা-সাহিত্যের আদি যুগে আখ্যান-গীতি (তথাকথিত 'ব্যালাড' বা গীতিকা) রচকেরা প্রায়শ ঐতিহাসিক মাল-মশলা নিয়েই কাজ চালাতেন এবং মহাপ্রভু চৈতন্যের কাল পর্যন্ত তাঁদের রচনার সমাদর ছিল। বৃন্দাবন দাসের উল্লিখিত যোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপালের গীতগুলিই তার প্রমাণ। এ সকল গীত হয়ত চিরতরে লুপ্ত হয়েছে, তাই তাদের রূপসম্বন্ধে এখন কোনো স্পষ্ট ধারণা করা যায় না। তবে পরবর্তী কালে রচিত রামায়ণ, মহাভারত ও নানা মঙ্গলকাব্য এবং গীতিকা যে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল একথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এ সকল কাব্যের রচনায় আধুনিক গল্পসাহিত্যের সম্ভাব্যতার আভাস পাওয়া যায়। কারণ, শ্রোতাদের ক্লান্তিপরিহারের জন্য এ সব কাব্যের রচয়িতারা তাঁদের অত্যাশ্চর্য ঘটনা-সংবলিত আখ্যানের মাঝে মাঝে সমসাময়িক জীবনের আচার ব্যবহারাদির বর্ণনা ঢুকিয়ে দিতেন, যদিও সেগুলি সর্বত্র আরব্ধ গল্পের সঙ্গে পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যযুক্ত নয়। স্থানে স্থানে রন্ধনের এবং ভোজনের বর্ণনা এ জাতীয় চেষ্টার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ ছাড়াও, যে চরিত্র-চিত্রণ আধুনিক গল্প-সাহিত্যের এক প্রধান অঙ্গ, তাও মাঝে মাঝে বেশ সুন্দররূপে মঙ্গলকাব্যে দেখা দিয়েছে। যেমন কবিকঙ্কণের ভাঁড়ু দত্ত, মুরারি শীল, দুর্বলা দাসী এবং ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনীকে চরিত্র-নির্মাণের দৃষ্টান্ত হিসাবে মোটেই নিন্দনীয় বলা যায় না।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলা দেশেও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গদ্য-রচনার প্রসার বেড়ে গেছে, আর বাংলা গদ্যের পুষ্টিসাধনে গল্প-উপন্যাসের কৃতিত্ব খুবই বেশী। কিন্তু উপন্যাসের বীজ এদেশের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে আবিষ্কার করা গেলেও আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জন্ম মুখ্যত ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে, এবং এর পুষ্টি সাধনের ব্যাপারেও সহায়ক ইংরেজী উপন্যাসের আদর্শ। এজন্য বাংলা উপন্যাসের সাহিত্যরূপটির ক্রমবিকাশ বুঝতে হ'লে সংক্ষেপে ইংরেজী উপন্যাসের গোড়ার ইতিহাসটির আলোচনা করতে হয়।

ইংরেজী উপন্যাস-সাহিত্যের বয়সও আড়াইশ' বছরের চেয়ে খুব বেশী নয়। সেখানেও প্রেরণা এসেছিল বিদেশী (ইতালীয়) সাহিত্য থেকে। Lyly রচিত Euphues নামক গল্পগ্রন্থে দেখা দেয় উপন্যাসের সর্বপ্রথম সূচনা। কারণ

এ পুস্তকেই গ্রন্থকার সেকেলে অদ্ভুত কাহিনী বা রোম্যান্স না লিখে ইতালীয় নভেলের অনুকরণে সমসাময়িক লোকচরিত্র ও আচার-ব্যবহারের ছবি এঁকে-ছিলেন। এতে নায়কের কার্যক্ষেত্র ছিল আশপাশের সমাজ, বিদেশ বা স্বদেশের যুদ্ধক্ষেত্র নয়। তাঁর আগেকার দিনের য়ুরোপে গল্পের নায়কমাত্রই ছিলেন যোদ্ধা, যেমন প্রাচীন বাংলা মঙ্গলকাব্যের অধিকাংশ নায়ক ছিলেন দেবভক্ত বা দেবতা বিদ্বেষী সওদাগর বা যোদ্ধা। Lylyর গ্রন্থে দেখা গেল যে তিনি সেকালে যুদ্ধ-বিগ্রহ বা তারই মতো চমকপ্রদ বিষয়ের বর্ণনা ছেড়ে সমসাময়িক জগৎ সম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহল জাগাতে চেষ্টা করেছেন। বর্তমান সামাজিক রীতি-নীতির যে সমালোচনা, একালের উপন্যাসের অপরিহার্য অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হচ্ছে, তারও সূচনা রয়েছে তাঁর গ্রন্থে। কিন্তু এ পুস্তকের কতকগুলি মারাত্মক দোষ ছিল; যথা বিরক্তিকর অনুপ্রাস ও অন্য অলংকারের বাহুল্য এবং গল্পের মাঝে মাঝে বহু পৌরাণিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ।

এঁর পরে যিনি ইংরেজী উপন্যাস-সাহিত্যের ক্রমিক বিকাশে সাহায্য করেছেন তাঁর নাম Daniel Defoe। তাঁর সুপরিচিত Robinson Crusoe উক্ত সাহিত্যের ক্রমবিকাশে প্রথম ধাপ। উপন্যাস হিসাবে এর ত্রুটি আছে, কারণ পাঠকদের কাছে ঔপন্যাসিক কেবল গল্পের স্রষ্টা-মাত্র নন, পরন্তু সর্বজ্ঞ স্রষ্টা। যেহেতু তিনি যে, পাত্র-পাত্রীদের সৃষ্টি ক'রে কেবল তাদের রূপ-গুণ, আচার-ব্যবহারের বর্ণনামাত্র দেবেন তা নয়, পরন্তু তারা কি ভাবছে বা কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে চলছে, এ সকলও তাঁকে জানতে হবে। বাস্তবপন্থীদের পুরোবর্তী Defoe যদিও পারিপার্শ্বিক বস্তুগুলি সহ মানুষকে আঁকতে নিপুণতার পরিচয় দিয়ে গেছেন, তবু সে মানুষের অন্তর্নিহিত চিন্তা বা হৃদয়াবেগকে বিশ্লেষণ করবার কোনো প্রয়াস তিনি করেন নি। এদিকে চেষ্টা না করলে মানবচরিত্রের বর্ণনা সম্পূর্ণ বা তৃপ্তিদায়ক কদাপি হয় না।

নিছক গল্পের চেয়ে উপন্যাস পৃথক; এখানে গল্প তো আছেই, তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরো কিছু আছে। গল্পোক্ত ঘটনাপর্যায়ের আবর্তনের মধ্যে যে সমস্ত চরিত্র এসে পড়ে, তাদের মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ও নিয়তির বিধান সম্পর্কে তাদের অন্তর্লোকের প্রতিক্রিয়া, এ সকলকে ভাষায় ফুটিয়ে তোলাই হ'ল সে আনুষঙ্গিক বস্তু। এ আনুষঙ্গিক বস্তুর সঙ্গে গল্পের সম্বন্ধ অনেকটা গানের সুরের সঙ্গে কথার সম্পর্কের মতো। গল্পের সংখ্যাও গানের কথার মতোই সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাতে নানা রকমের আনুষঙ্গিক বস্তু যোজনা করা যায়। এজন্যেই দেখা যায় যে, একই গল্পবস্তু নিয়ে দুজনে গ্রন্থ

রচনা করেছেন এবং তাঁদের গ্রন্থদ্বয়ে রসের তারতম্য থাকলেও মৌলিকতার অভাব নেই।

Defoeর রচনায় যে ত্রুটি আছে, সে ত্রুটি তাঁর পরবর্তী বিখ্যাত লেখক Fieldingএর রচনায়ও বর্তমান। Defoeর সৃষ্ট Crusoeর জীবন একটানা বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার কোনো আন্তরিক প্রতিক্রিয়া নেই। Fieldingও তাঁর পাত্রপাত্রীদের বর্ণনা ক'রে যান কিন্তু তাঁর কল্পনা কখনো সে ঊর্ধ্ব লোকে পৌঁছয় না যেখান থেকে ঈশ্বরের ন্যায় লেখক তাঁর হাতে-গড়া পাত্র-পাত্রীদের সুখ-দুঃখকে পূর্ণ জ্ঞান এবং করুণার সঙ্গে অবলোকন করতে পারেন। কিন্তু Crusoeতে বাস্তবতা অনুসরণ ক'রে যে সুস্পষ্ট নিখুঁত ছবি আঁকা হয়েছে তা লোককে মুগ্ধ করবার মতো। তবে Defoeর পুস্তক প'ড়ে একটি প্রশ্ন মনে জাগে—গল্পটি কার নামে বলা উচিত? নিখুঁত বর্ণনা করতে হ'লে তাঁর অবলম্বিত পন্থাই (অর্থাৎ নায়কের দ্বারা গল্প বলানো) উত্তম। কিন্তু এতে কতকগুলি অসুবিধাও আছে। গল্পের নায়কের মুখে সমস্ত কাহিনী ব্যক্ত করবার ব্যবস্থা করলে অনেক কথার বর্ণনা বাদ পড়তে বাধ্য; কারণ গ্রন্থকার তৃতীয় ব্যক্তি রূপে বক্তার আসন নিলে তিনি যেমন সর্বজ্ঞের মতো সকল ঘটনা বলতে পারেন, নিতান্ত সর্বগুণসম্পন্ন গল্পের নায়কও সে রকম সর্বজ্ঞতার দাবী করতে পারেন না। নায়কের জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচরে যে সকল ঘটনা ঘটতে পারে এবং বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর হৃদয়-মনে যে সকল বিচিত্র ভাবোদয় হয়, সেগুলি যথাযোগ্য ভাবে বর্ণনা করতে পারেন কেবল গ্রন্থকারই। তার উপর মাঝে মাঝে যথোচিত মন্তব্য যোগ করেও তিনি বর্ণনাকে অধিকতর উপভোগ্য ক'র তুলতে পারেন।

যদি নায়কের মুখে গল্প বিবৃত হয় তবে সেটি প্রামাণিক ইতিহাসের মতো বিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হতে পারে। এ বিশ্বাসযোগ্যতা গল্পের একটি বিশেষ গুণ। লেখক নিজে বর্ণনা করলেও গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতার হানি হয় না, যদি তিনি খুব সতর্কভাবে লেখনী চালনা করেন। তবে তর্কের খাতিরে তাঁকে যে সর্বজ্ঞ ব'লে মেনে নিতে হবে এখানেই এসে যেতে পারে অবিশ্বাস্যতা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সাহিত্য-সৃষ্টির বেলায় মানুষ নিজ সৃষ্টিকর্তার সমশ্রেণীস্থ। এ স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি স্বীকার না করলে কোনো সাহিত্যেরই রসাস্বাদন সম্ভবপর নয়।

Defoeর পরবর্তী লেখক Richardson (যাঁকে বলা হয় ইংরেজী উপন্যাসের জন্মদাতা) তাঁর পূর্ববর্তীর অনুসৃত পথ ছেড়ে দিলেন। গদ্য গল্প তাঁর হাতে দেখা দিল এক নূতন রূপ নিয়ে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল Defoeর চেয়ে আলাদা

রকমের। যে কোনো রকমের বাস্তব ঘটনাই Defoeকে আকর্ষণ করত, কিন্তু Richardson-এর কৌতূহল ছিল কেবল লোকজনের চাল-চলন, অভ্যাস, চরিত্র আদির সম্বন্ধে। তাঁর এ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সমসাময়িক (১৮শ শতাব্দীর) প্রায় সকল গদ্যলেখককেই প্রভাবিত করেছিল; যেহেতু Defoeর গল্প ছিল বাস্তবতামূলক চমৎকৃতি উৎপাদক (romantic) উপন্যাস আর Richardsonএর সৃষ্টি ছিল রসবহুল (sentimental) উপন্যাস। প্রথম গ্রন্থকারের দৃষ্টি পারিপার্শ্বিক ও সমসাময়িক জগৎ থেকে দূরে, আর দ্বিতীয়ের দৃষ্টি নিকটতর দেশকালে নিবদ্ধ। প্রথমোক্ত গ্রন্থকারের রচনায় ছিল প্রাচীন যুগের অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত কাহিনীর (romance) প্রভাব, কারণ তাঁর বর্ণিত গল্পাদি সে সব কাহিনীর মতোই পাঠক-পাঠিকাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা বা হৃদয়াবেগ থেকে ছিল বেশ দূরবর্তী। কিন্তু Richardson এমন গল্প বললেন যা তাঁর পাঠকমণ্ডলীর হৃদয় সহজেই স্পর্শ করল। তাঁর বর্ণিত দৃশ্যগুলি ছিল প্রায় সকলেরই পরিচিত, আর পাত্র-পাত্রীরা তাঁর নিজের সময়েরই লোকজন। তিনি যে জগতের দিকে দৃষ্টি দিলেন, তা হ'ল অল্প-পরিসর কিন্তু বিচিত্র ভাবময় মানবহৃদয়। মানুষের দৈনিক জীবন-যাত্রার ও কর্মকোলাহলের ভিতর দিয়ে তাদের ভাবনা, অনুভূতি ও সংকল্প কিরূপে মূর্তিপরিগ্রহ করে সে সব এঁকে তোলাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। Richardson উপন্যাস রচনায় যেটুকু সাফল্য লাভ করলেন তার ফলে স্পষ্ট জানা গেল যে, চমৎকৃতি-উৎপাদক অত্যাশ্চর্য কাহিনী গুলি হয়ে গেছে একান্ত পুরোণো ও অচল, এবং তাদের স্থানে দেখা দিয়েছে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ সম্বন্ধে সত্যিকারের সর্বজনীন কৌতূহল।

কিন্তু মানুষের হৃদয়-মনের বিশ্লেষণ খুব কঠিন কাজ। Richardson এতে কখনো পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নি। একাজের জন্যে তিনি এত খুঁটিনাটি ও সুদীর্ঘ বর্ণনা উপস্থিত করতেন যে, পাঠকদের মনোযোগ স্থানে স্থানে শিথিল হয়ে পড়ত। তা সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাস-রচনার প্রতিভা স্বীকার করতে হবে। তিনি যে কেবল বিষয়গত বৈচিত্র্য আনলেন তা নয়, তাঁর গল্প বলার ভঙ্গীটিও নূতন। পাত্রপাত্রীদের লেখা নানা চিঠিপত্রের ভিতর দিয়েই তাঁর গল্পগুলি বিবৃত। এ পদ্ধতির এক সুবিধা এই যে, প্রত্যেক পাত্রপাত্রীর মনের নিগূঢ় কথা বেশ সহজ ভাবে জানা যায় এবং সেটি জানানোই এ জাতীয় উপন্যাসের প্রাণবস্তু। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ পদ্ধতির কিছু গুরুতর অসুবিধাও আছে। এতে উপন্যাসটির স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়; কারণ সাধারণ ব্যক্তিগত জীবনের কোনো চিঠি-পত্রে কেউ নিজ চিন্তা ও কর্মের এমন নিখুঁত খতিয়ান প্রকাশ করেন কিনা সন্দেহ।

Richardson এর বিশ্লেষণাত্মক গল্পবর্ণন-পদ্ধতিতে নানা ত্রুটি থাকলেও তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিতে আঙ্গিক ঐক্য বেশ বজায় রেখেছেন। এই আঙ্গিক ঐক্য কেবল প্রথম শ্রেণীর রচনাতেই পাওয়া যায়। বর্ণিত গল্পের মধ্যে একটা ঐক্য থাকবে, প্রত্যেক অবান্তর ঘটনা একটি কেন্দ্রাভিসারী স্রোতপথ বয়ে চলবে; চরিত্রাঙ্কন ব্যাপারেও থাকবে ঐক্যবোধ। গল্পের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত একটি ব্যক্তি বা কয়েকটি ব্যক্তি গল্পের রঙ্গমঞ্চে কেন্দ্রস্থল অধিকার ক'রে থাকবে বা তদনুরূপ আচরণ করবে। গল্পোক্ত ঘটনাগুলির মূলে রয়েছে পাত্র-পাত্রীদের নিজ নিজ স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য; কাজেই যে জগতে তারা বিচরণ করবে, নিজেদের আনন্দ-বেদনা প্রকাশ করবে, সেটি সৃষ্টি করবার আগে তাদেরই বিশেষভাবে গ'ড়ে তোলা ঔপন্যাসিকের কাজ। একবার তাদের যে-রূপ যে-চরিত্র স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়, তাদের কোনো আচরণে যেন তার সঙ্গে কোনো অসঙ্গতি না ঘটে; তারা সর্বত্র বুদ্ধিমানের মতো আচরণ না করলেও এমন কিছু যেন না করে, যা তাদের পক্ষে অসম্ভব ব'লে বিবেচিত হবে। গল্পের পাত্রপাত্রীকে যদি খুব নিপুণ ভাবে রূপ দেওয়া হয় তবে তারা ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায় অনুসারে বিশেষ বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়েও নিজেদের ব্যক্তিত্বকে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। মোট কথা চরিত্রসৃষ্টি ও চরিত্র-বিকাশের মধ্যে ঔপন্যাসিককে একটা ঐক্য রক্ষা ক'রে চলতে হয়। সেরূপ ঐক্য বজায় থাক্‌লেই তাঁর সৃষ্ট পাত্র-পাত্রীদের বাস্তব জগতের মানুষ ব'লে মনে হতে পারে। Richardson যদিও Defoeর চেয়ে ভিন্ন পদ্ধতিতে লিখেছিলেন, তবু তাঁর উপন্যাসগুলিতে উল্লিখিত রকমের ঐক্য ছিল। এজন্যে এবং তাঁর বিষয়বস্তু তথা বর্ণন-পদ্ধতির জন্যে তাঁকে খুব শক্তিশালী লেখক ব'লে গণ্য করতে হবে।

তাঁর পরে উপন্যাস লিখলেন Fielding; তিনিও বাস্তব জীবনের চিত্র আঁকলেন। তাঁরও লেখায় ফুটে উঠল সমাজের দশজনের সুখদুঃখময় ভাবনা ও আচরণের কাহিনী। কিন্তু তিনি সমাজকে Richardson-এর মনোভাব নিয়ে দেখলেন না। তাঁর মতে Richardson-এর দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অস্বাভাবিক রূপে গম্ভীর। সাহিত্য-শিল্পের, বিশেষ ক'রে নাটক-উপন্যাসের আলোচনায়, লেখকের মনোভাবের কথাটি খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ, এসব ক্ষেত্রে চরিত্র-সৃষ্টির উপরেই সব কিছু নির্ভর করে। যদি লেখক সূক্ষ্মদৃষ্টি না নিয়ে তাঁর পারিপার্শ্বিক জগতের দিকে তাকান, তবে তাঁর সৃষ্ট পাত্র-পাত্রীগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে না, তাদের কার্যকলাপের বিশ্বাস্যতাও হয়ে ওঠে দুর্ঘট, এক কথায়, সে সব চরিত্রের সম্বন্ধে কেউ আকর্ষণ অনুভব করেন না। Richardson এই মনোভাব

নিয়ে আরম্ভ করেছিলেন যে, এ জগতে সব সৎকাজেরই পুরস্কার মেলে। এ কথাটি যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, তা বলাই বাহুল্য। Fielding তার চেয়ে স্বাভাবিক মনোভাব নিয়ে লিখেছিলেন। Richardsonএর প্রথম উপন্যাসের বিষয় ছিল Pamela নামে চাকরাণীর আখ্যান—সে কী ক'রে তার মনিবের প্রলোভন এড়িয়ে বুদ্ধি-কৌশলে তার বিবাহিতা পত্নী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। Fielding এই গল্পকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করার জন্যে Joseph Andrews নামে তাঁর প্রথম উপন্যাস লিখলেন। এ বইতে তিনি দেখিয়েছেন যে Andrews খুব সাধু চরিত্রের ভৃত্য হয়েও কী করে' শেষ পর্যন্ত তার নষ্টচরিত্রা এবং কূটবুদ্ধি-সম্পন্না প্রভুপত্নীর প্রেমে জড়িত হয়েছিল।

Fielding সমাজকে দেখেছিলেন এই হাস্যময় দৃষ্টিতে। এ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই ছিল Richardsonএর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। Fielding এর আর এক বিশেষত্ব ছিল সমাজের উপর এক সামগ্রিক দৃষ্টি। তাঁর দৃষ্টি প্রায় কাউকে এড়াত না। এজন্যে তাঁর উপন্যাসে এত পাত্র-পাত্রীর বাহুল্য এবং ঘটনা-বিন্যাসের অজস্র বৈচিত্র্য। তার ফলে তাঁর এক একখানি উপন্যাস যেন এক একখানি ছোটখাটো মহাভারত। ছোট-বড়-মাঝারি নানা চরিত্রে পরিপূর্ণ তাঁর উপন্যাস অনেকাংশে বাস্তব জীবনের নিখুঁত চিত্র ব'লে গণ্য হতে পারে। এর থেকেই বোঝা যায় যে, Fieldingএর চরিত্র-চিত্রণের ক্ষমতা খুব উঁচুদরের। তাঁর চরিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি Richardson থেকে আলাদা রকমের এবং বেশী ফলপ্রসূ। মনস্তত্ত্ববিদের মতো পাত্র-পাত্রীদের মানসিক গঠন ও প্রবণতা আদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়াতে তাঁর কোনো উৎসাহই নেই। গল্পের যে স্থানে তারা প্রথম দেখা দেয় সেখানেই তিনি তাদের চিন্তা-প্রণালী ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। তার পর স্থান কাল-পাত্র অনুসারে তারা নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দিয়ে চলে।

Fieldingএর বর্ণনাপদ্ধতিও তাঁর কৃত চরিত্র-চিত্রণকে সার্থক করেছে। নানা চিঠি-পত্রের মধ্য দিয়ে গল্প বলতে গেলে তাতে ঘটনা-পর্যায়কে ঠিকঠাক রূপ দেওয়া ততটা সম্ভবপর হয় না। আর ঘটনা-পর্যায় বিবৃত হলেই পাত্র-পাত্রীরা তার মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বরূপ নিখুঁত ভাবে না হলেও বেশ সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ ক'রে যেতে পারে। Fielding নিজেই গল্পের বক্তা, কাজেই তিনি সে সকল ব্যাপারকে বেছে নিতে পেরেছেন যেগুলির বর্ণনার দ্বারা চরিত্রবিশেষকে অপেক্ষাকৃত ভালো ভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। কোনো লোকের লেখা এক রাশি চিঠি দ্বারা বা 'ডায়েরী' দ্বারা তার মনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ততটা সম্ভবপর না হতে পারে।

Fieldingএর পরে নাম করবার মতো ঔপন্যাসিক Smollet ; বিশেষ শক্তিমান্

লেখক না হ'লেও উপন্যাস নির্ম্মাণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুব সুস্পষ্ট ছিল। তিনি বলতেন যে, উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাগুলিকে ঐক্য দান করবার মতো একজন উচ্চশ্রেণীর নায়ক থাকা দরকার। উপন্যাস রচনা বা উপন্যাস সমালোচনা প্রসঙ্গে এ কথাটি সর্বত্র স্মরণীয়। চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন Fieldingএর অনুগামী। আর তিনি নিজ অভিজ্ঞতা থেকে চরিত্র-সৃষ্টির উপযোগী মাল-মশলা সংগ্রহ করতেন। তিনি নিজ চোখে যে সকল স্থান, কাল বা পাত্র দেখেছেন উপন্যাসে যথাযোগ্য ভাবে তাদেরই সন্নিবেশ করতেন। তারই ফলে তাঁর উপন্যাসগুলি হচ্ছে অনেকটা জীবন্ত বর্ণনায় পূর্ণ এবং সে কারণে চিত্তাকর্ষক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে উপন্যাস সম্পর্কে ইংরেজ পাঠকদের রুচিতে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল; রুচির পরিবর্তন বিশেষভাবে প্রকট হ'ল কাব্য-সাহিত্যে 'রোম্যান্টিকতা'র (Romaticism) পুনরভ্যুত্থানে। এ রোম্যানটিকতার অর্থ হচ্ছে—যা কিছু অভ্যস্ত, প্রথাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট, তাকে অতিক্রম ক'রে চলা। কোন্ ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজী সাহিত্য এ যুগবিবর্তনের পথে অগ্রসর হ'ল, তা সংক্ষেপে বলা শক্ত, কিন্তু এ সত্ত্বেও উক্ত পরিবর্তনের মূলনীতি দুর্বোধ্য নয়। সাহিত্য যে পরিমাণে জীবনের প্রকাশক্ষেত্র, পরিবর্তন সে পরিমাণে তার পক্ষে অপরিহার্য। ক্রমাগত বাস্তব জীবনের কাহিনী পড়ে' পড়ে' ক্লান্ত জনসাধারণের পাঠস্পৃহা পরিতৃপ্তির নূতনতর ক্ষেত্র খুঁজল। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজী সাহিত্যে আবার অত্যাশ্চর্য ঘটনামূলক কাহিনী দেখা দিল। একেও উপন্যাস ব'লে গণ্য করতে হবে, কিন্তু একটা বিশেষণ দিয়ে। এ গল্পে বিশ্বাস উৎপাদনের কোনো চেষ্টা নেই। এর সমস্ত শক্তি হচ্ছে অবিশ্বাস্য ব্যাপারের বর্ণনাকে সরস ও চিত্তাকর্ষক ক'রে তোলায়। যে সব পাঠক ক্রমাগত সুপরিচিত সাধারণ জীবনের গল্প পড়ে' ক্লান্ত হবার পর অত্যদ্ভুত কাহিনী থেকে উত্তেজনা সংগ্রহের জন্যে উৎসুক, মুরুব্বিয়ানা চালে তাঁদের মনোভাব এবং রুচি সম্বন্ধে সমালোচনা করা সহজ, কিন্তু তাঁদের দাবীর ন্যায্যতা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি চলে না। এরূপ উত্তেজনাদায়ক কাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচনা করলেন Walpole, Mrs. Radcliffe আদি লেখক-লেখিকাগণ। কিন্তু এঁদের রচনায় কলা-কৌশল উচ্চাঙ্গের ছিল না ব'লে সেগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। তবে তাঁরা প্রায় সকলেই তাঁদের গল্পে ভয়মূলক রসকে ফোটাতে চেয়েছিলেন এবং এ জন্যে অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের বর্ণনাকে আশ্রয় করেছিলেন; কিন্তু এ কার্যে সফল হতে হ'লে যে পরিমাণ ভাবাবেগকে রূপ দেওয়া দরকার, গদ্যের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভবপর নয়। Coleridge এর Ancient Marinerএর মতো অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য গল্প রচনায়

ক্ষমতা আছে শুধু পদ্যেরই, কারণ পদ্য ছন্দের উপর ভর ক'রে উড়ে চল্‌তে পারে এবং এতে যে পরিমাণ ভাবাবেগ চাপানো যায় তাতে গল্পটি হয়ে পড়ে অবান্তর। কিন্তু এরূপ গল্প যদি গদ্যের উপর ভর দিয়ে চলতে যায় তবে নিতান্ত অসম্ভব কিছু বলবার মুহূর্তে গদ্য তার কর্তব্য পালন করতে অক্ষম হয়।

সে যাই হোক, ইংরেজী উপন্যাস চমৎকৃতি-উৎপাদনের সোজা রাস্তা খুঁজে পেল ইতিহাসের ভিতর দিয়ে। তার ফলে এমন এক জগৎ সৃষ্টি করতে পারল, যার বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য অথচ চোখের উপর বর্তমান নয়। এ ঐতিহাসিক পদ্ধতির উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন Sir Walter Scott, আর Waverly হল তাঁর প্রথম বই।

Scott যে তাঁর নিজ দেশের কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন এ ঘটনাটি বেশ অর্থপূর্ণ। তিনি Fielding বা Smollet এর মতো নিজের জানাশোনা অন্তরঙ্গ লোকদের জীবনকথা বর্ণনা করতে না পারলেও প্রায় তারি মতো ভাল কাজটি ক'রে গেছেন; তিনি বর্ণনা করেছেন সে সব ঘটনা ও নরনারীর যাঁরা ইতিহাস-পাঠের ভিতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। আর স্কটল্যাণ্ডের নানা দৃশ্য ও চরিত্রাদর্শ সম্বন্ধে তাঁর যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাকে ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিকে নিজের দেখা ও অনুভব করা জিনিষের মতো ক'রে তুলেছিলেন।

কিন্তু স্কটল্যাণ্ডেরই বা অন্য যে দেশেরই ইতিহাস নিয়ে তিনি লিখেছিলেন, সে লেখাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারাকে সৃষ্টি করল এবং এ বিষয়ে তাঁর প্রদর্শিত পদ্ধতিই একমাত্র ফলপ্রদ পদ্ধতি। তিনি কখনো ইতিহাসের মৃত কঙ্কালকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তাকে ঐতিহাসিক বাস্তবতা দানের দুঃসাধ্য চেষ্টা করেন নি। চেষ্টা-চরিত্র ক'রে জোড়াতাড়া দিয়ে প্রাচীন যুগের কোনো স্থাপত্য কীর্তিকে পুনর্নির্মাণ বা সংস্কার করা যায় কিন্তু Elizabeth তাঁর কালে যে ভাষায় কথা কইতেন আধুনিক উপন্যাসে যদি তাঁর মুখে সে কথা বসানো যায় তবে তার ফল হবে মারাত্মক। মানুষের চরিত্র যে, যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বদলায় না, এ সত্যটি জানতেন ব'লে Scott তাঁর নিজের জানাশোনা লোকদের আদর্শ নিয়ে এমন নিপুণ ভাবে প্রাচীন কালের নানা দৃশ্য এঁকেছেন যাদের মধ্যে আমরা বহু জীবন্ত নরনারীকে বিচরণশীল দেখতে পাই।

ইংরাজী উপন্যাস Scottএর যুগ পর্যন্ত যতখানি অগ্রসর হয়েছিল, তারই আদর্শ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখতে আরম্ভ করলেন বাংলা উপন্যাস। তাই তাঁর রচনার কৌশল এবং অন্তর্নিহিত মনোভাব আদিতে Scottপ্রভৃতি ঔপন্যাসিকের প্রভাব

আবিষ্কার করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যিক ছিলেন ব'লে এ প্রভাব সহজে সাধারণ পাঠকের লক্ষ্য-গোচর হয় না, তবু তা অস্বীকার করা অন্যায় হবে। এদিক দিয়ে ইংরেজী সাহিত্য ও ইংরেজ জাতির কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম।

১৫শ অধ্যায়

উপন্যাস (অবশেষ)

প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম উপন্যাস লিখলেও কোনো কোনো লেখক এ কথাটি স্বীকার করতে চান না। তাঁদের মতে, বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস-সৃষ্টির ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ প্রশংসার ন্যায্য দাবীদার হচ্ছেন 'নব বাবুবিলাসে'র লেখক। কিন্তু এরূপ মত খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। অঙ্কিত চরিত্রগুলি ও তাদের কার্যকলাপ কথাবস্তুর মধ্যে যথাযোগ্য ভাবে বর্ণনা করা এবং চরিত্রগুলির কথোপকথনের দ্বারা সুসম্বদ্ধ ভাবে ফুটিয়ে তোলাই হচ্ছে উপন্যাসের উদ্দেশ্য। কাজেই দেখা যায় উপন্যাসের মোটামুটি চারটি অঙ্গ :—(১) গল্পাংশ (২) চরিত্র-চিত্রণ, (৩) পরিবেশ-বর্ণনা, (৪) দ্বয়োক্তি বা সংলাপ। এ চারটির মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ চরিত্রাঙ্কন বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগেও কিছু পরিমাণে বর্তমান ছিল। মুকুন্দরামের ভাঁড়ু দত্ত, দুর্বলা দাসী, ফুল্লরা এবং ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী আদি চরিত্রাঙ্কনের দৃষ্টান্ত হিসাবে নিন্দনীয় নয়। কাজেই 'নববাবুবিলাসে' বাবু চরিত্রের যে নকশা দেখতে পাওয়া যায়, তাকে নব উদ্ভাবনের গৌরব দান করলে অন্যায় হবে। শেষোক্ত বইতে কিছু কিছু সরস বর্ণনা আছে, এটুকুই এর কৃতিত্ব। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় গদ্যের সঙ্গে পদ্যের মিশ্রণ ঘটিয়েও লেখক উপন্যাস হিসাবে এর প্রবন্ধ-গৌরব নষ্ট করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে একাধিক গদ্যপদ্য মিশ্রিত চম্পূকাব্য আছে বটে, তবে সে সব কখনও প্রথম শ্রেণীর রচনা ব'লে গণ্য হয় নি। উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীদের সংলাপের জন্য যে কথাবার্তার ভাষার প্রয়োজন, তার প্রথম নমুনা প্রকাশ করেন উইলিয়ম কেরী তাঁর সঙ্কলিত 'কথোপকথনে', কিন্তু এ বইকে উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া যায় না। এতে কোনো গল্পাংশ নেই। নানা বিষয়ের কথোপকথন গুলিকে সমসাময়িক সমাজ-চিত্রের ছোটো ছোটো অংশ ব'লে গণ্য করা যায় মাত্র। প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলালে' উপন্যাস রচনার যে আদর্শ

প্রবর্তন করলেন, তার মধ্যে উপন্যাসের চারটি মুখ্য অঙ্গই অল্প বিস্তর বর্তমান। এ জন্যই স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ঔপন্যাসিকের গৌরব দান ক'রে গেছেন। চরিত্র-সৃষ্টি ব্যাপারে নতুন উদ্‌ভাবক না হয়েও তাঁর সৃষ্ট ছোটবড়ো চরিত্রগুলির সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের জন্য প্যারীচাঁদ বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। 'আলালে' কোনো স্ত্রীচরিত্র তেমন ক'রে ফোটে নি, কিন্তু এ জন্যে প্যারীচাঁদকে দায়ী না ক'রে সমসাময়িক সমাজকেই দায়ী করা উচিত। 'আলালে'র অন্তর্গত সংলাপগুলি চরিত্র-বিকাশের অঙ্গ হিসাবে বিশেষ উপযোগী, তবে কখনও কখনও উপদেশকথার কিঞ্চিৎ বাহুল্য-বশত সেগুলি একটু নীরস হয়েছে। মাঝে মাঝে 'নববাবু বিলাসে'র ধরণে দুটি একটি পদ্য বর্ণনা থাকায়ও বইখানি একটু অদ্ভুত হয়ে পড়েছে। তবু সব দিক থেকে দেখলে প্রথম উপন্যাস হিসাবে 'আলাল' খুব নিন্দনীয় নয়।

কলিকাতা ও মফঃস্বলের তৎকালীন বাঙালী সমাজের যে নানা সরস প্রাঞ্জল ও চিত্রলিখিতবৎ বর্ণনায় 'আলাল' পরিপূর্ণ, তৎপূর্বে রচিত কোনো বাংলা গ্রন্থে সে সকলের সন্ধান মেলে না। এ গ্রন্থের রুচিগত বিশুদ্ধিও লক্ষ্য করবার মতো। 'নববাবুবিলাস' একেবারে নগণ্য রচনা না হলেও এতে ছিল নিতান্ত কদর্য রুচির পরিচয়। এদিক দিয়েও প্যারীচাঁদ নূতন আদর্শের প্রবর্তন করলেন। তিনি 'যৎকিঞ্চিৎ' এবং 'অভেদী' নামক যে দু'টি উপদেশাত্মক আখ্যান লিখেছিলেন, সে গুলি উপদেশ-কথার বাহুল্য-বশত, সুন্দর বর্ণনা এবং সুলিখিত সংলাপ থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসের পর্যায়ে দাঁড়াতে পারে নি।

প্যারীচাঁদের 'আলাল'কে সর্বপ্রথম লিখিত বাংলা উপন্যাস বলা গেলেও এ-বইতে কোনো উচ্চ শ্রেণীর মুখ্য চরিত্র আখ্যানবর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাপর্যায়কে ঐক্য দান করে নি। সেদিক দিয়ে 'আলাল'কে শিথিল-ভাবে গ্রথিত কতকগুলি নক্‌শার সমষ্টি ব'লে মনে হয়। আর এর প্রায় চরিত্রই পুতুলের মতো বৈচিত্র্যহীন নির্জীব ছবি-মাত্র। তবু তাঁর এই পরীক্ষামূলক গ্রন্থ যে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার পথকে খুব সুগম করেছিল, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। এ পথে অগ্রসর হয়েই বঙ্কিমচন্দ্র নিজ প্রতিভাগুণে কৃতিত্বলাভ করতে পেরেছিলেন। অবশ্য তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস Rajmohan's Wife শিল্পকৌশলের দিক দিয়ে 'আলালে'র বেশি ওপরে যেতে পারে নি। ইংরেজীতে রচিত হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমের প্রবর্তিত উপন্যাস-শিল্পের আলোচনায় এ বইটিকে বাদ দেওয়া চলে না। গঠন-কলার দিক দিয়ে বইখানি বড়ই কাঁচা। এর পাত্র-পাত্রীগুলি পুতুলের মতো নির্জীবপ্রায়; কারো ব্যক্তিত্বে বৈচিত্র্য-লেশ নেই, আখ্যানে যারা একবার সাধু হিসাবে দেখা দিয়েছে তারা শেষ পর্যন্ত অটল অচল সাধুত্বের ছবি, আর যাদের

প্রথম সাক্ষাৎ পাই দুর্ক্মার মূর্তিতে, তারা উত্তরোত্তর পাপের পথেই অগ্রসর। এরূপ একটানা ভালো বা মন্দ চরিত্র আঁকার ফলে গল্পাংশে নানা বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ সত্ত্বেও বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাসখানি নিতান্ত অঙ্গহীন হয়ে ছিল। উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য, যথাযুক্ত পটভূমিকার আশ্রয়ে আখ্যানগত পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র বিশ্লেষণ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাপর্যায়ের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করা। এ দুটি জিনিষ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসে একেবারে অনুপস্থিত। এ গ্রন্থের আর এক দোষ এই যে, এতেও ('আলালে'রই মতো) এমন কোনো মুখ্য চরিত্র নেই যে বর্ণিত ঘটনানিচয়কে ঐক্য দান করতে পারে। সাময়িক পত্রিকায় গ্রন্থখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত এর গুণাগুণ বুঝতে পেরে ছিলেন। তাই তিনি একে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন নি।

সে যাই হোক, এ পরীক্ষামূলক লেখাটি সাফল্য লাভ না করলেও বঙ্কিমচন্দ্র তারপরে যে কয়খানি উপন্যাস ক্রমাগত লিখলেন তার মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের অভাবনীয় পরিণতি ঘটল। তাঁর কোনো কোনো বইতে গঠনগত সামান্য ত্রুটি থাকলেও উপন্যাসশিল্পের মূলতত্ত্বগুলি তাঁর বইগুলিতে প্রায় নিঃশেষে দৃষ্টান্ত লাভ করেছে। এ বিষয়টি বুঝতে হ'লে বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যানবস্তু নির্বাচন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। কোনো কোনো লেখক এ নির্বাচনের মধ্যে বঙ্কিমের শ্রেণীগত মনোবৃত্তি ও পক্ষপাতের প্রত্যক্ষ খেলা দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু ভালো ক'রে ভেবে দেখলে এ রকম ধারণার সমর্থন করা যায় না। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' আদি প্রচারমূলক উপন্যাসগুলির কথা বাদ দিলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানভাবে ছিলেন সাহিত্য-শিল্পী। তিনি তাঁর সময়ের প্রভাবশালী শ্রেণীর বাঙালী হলেও তাঁর উৎকট শ্রেণীগত অভিমান ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য-দেশাগত উদার মনোভাবই ছিল তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল। চরিত্র-চিত্রণে ও আখ্যানবস্তুর সংগঠনে যদি কোনো প্রভাব তাঁর রচনায় কাজ ক'রে থাকে, তবে সে হচ্ছে তাঁর সহজাত শিল্পিসুলভ দৃষ্টি।

চরিত্র-চিত্রণ উপন্যাসের এক প্রধান অঙ্গ। যে সকল নরনারীর সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার কাহিনীকে আশ্রয় ক'রে উপন্যাস রচিত হবে, তাদের জীবন্ত রূপে চিত্রিত করা লেখকের অবশ্য কর্তব্য। এ জীবন্ত চরিত্রের অর্থ এই যে, প্রত্যেক চরিত্র তার নিজের দেশ ও কালের পক্ষে এবং সাধারণ মনুষ্য চরিত্রের হিসাবে স্বাভাবিক হবে। বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই রাজা-রাজোড়া, ধনী ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মাঝ থেকে পাত্র-পাত্রী কল্পনা করেছেন, তার মূলে ছিল স্বাভাবিকতার দাবী। প্রত্যেক সার্থক উপন্যাসেই দেখা যায় যে, এমন দুয়েকটি পাত্র-পাত্রী

আছে যাদের চরিত্রের গতি ও বিকাশ বহুমুখী এবং জটিল। বঙ্কিম যে সময় উপন্যাস লিখতে শুরু করেন, তখনকার বাঙালী সমাজে ও চরিত্রে সবেমাত্র বৈচিত্র্য বিকশিত হতে আরম্ভ করেছে। সে বিকাশ তখনো সম্পূর্ণ হবার বিলম্ব ছিল। নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে ব্যক্তি তখনো সমাজের প্রাচীন দুর্নিবার নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে স্বাধীনতা পায় নি; কাজেই তেমন সমাজের প্রাণীদের নিয়ে জীবন্ত চরিত্র আঁকা একটু দুঃসাধ্য ছিল। এ দুরূহত্ব আবার বিশেষ ভাবে প্রকট হয়েছিল নারী-চরিত্র অঙ্কনে। উপন্যাসের এক মুখ্য উপজীব্য নরনারীর ভালবাসা। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে এই ভালবাসার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে কোনো নায়িকার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার এক বিষম বাধা ছিল; কারণ, একান্ত দরিদ্র ও দরিদ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নারীগণ নিজেদের জীবন-সংগ্রামে ও সমাজের চাপে প্রায় ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিলেন। সমাজের চাপ ধনী সম্প্রদায়ের উপরও খুব কম ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও সময় সময় অর্থবলের মহিমা যে সামাজিক বাধাকে অতিক্রম বা অগ্রাহ্য করেছে, তার দৃষ্টান্ত বিশেষ বিরল নয়। এজন্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকটা বাধ্য হয়েই অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান সম্প্রদায়ের লোকদের মাঝ থেকে নিজ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী বাছতে হয়েছে। অতি প্রাচীন কালে যৌবন-বিবাহ ও গান্ধর্ব-বিবাহের কথা শুনতে পাওয়া গেলেও উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিবাহপূর্ব বা বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম এ দেশের সমাজে অত্যন্ত নিন্দার্হ ছিল। কিন্তু বিবাহ-সিদ্ধ প্রেম আদর্শ হিসাবে যতই ভালো হোক, তাকে একান্তভাবে আশ্রয় ক'রে নাটক উপন্যাসের বিবিধ ও বিচিত্র স্বভাবানুগ চরিত্র-সৃষ্টি সম্ভবপর নয়। মানুষের অন্তরে যে দুর্নিবার প্রবৃত্তি-নিচয় আছে, সেগুলির গতি বহুধা বিচিত্র, আর সমাজ শাসনেরও বিধিনিষেধের প্রকৃতিই হচ্ছে ঐ গতিকে বাধা দেওয়া। এ দুয়ের দ্বন্দ্বে কোনো সমাজের শক্তি যদি নিরন্তর জয়ী হয়, তবে সে সমাজের কোনো নরনারীর জীবন নিয়ে সৃষ্ট নাটক বা উপন্যাস হয়ে ওঠে নিতান্ত একঘেয়ে ও অস্বাভাবিক। সংস্কৃত নাটকগুলির অধিকাংশই এর প্রধান দৃষ্টান্ত। স্বাভাবিক কারণে তাতে নরনারীর চরিত্রগত বৈচিত্র্য সুলভ নয়। কাজেই, সার্থক উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে বঙ্কিম-চন্দ্রকে অতি সাবধানে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করতে হয়েছে। তখনকার সমাজে কেন, পূর্ববর্তী দু'পাঁচশ বছরের মধ্যেও বাংলা দেশের সনাতন-প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজে উপন্যাসের নায়িকা হওয়ার মতো প্রাপ্ত-যৌবনা কন্যা খুঁজে পাওয়া ভার ছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনা করলেন তিলোত্তমার। এর জননী ছিলেন স্বীয় মাতার অবৈধ সন্তান। বীরেন্দ্রসিংহ স্বেচ্ছাচারী সমৃদ্ধ ভূস্বামী ছিলেন ব'লেই তিলোত্তমার মাতাকে বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পেরেছিলেন। এরকম দম্পতির সন্তান ব'লেই

প্রাপ্তযৌবনা হয়েও তিলোত্তমার কুমারী থাকা সম্ভব হয়েছিল। জগৎসিংহের সঙ্গে তাঁর প্রণয়কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে স্বাভাবিক করবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে এত কল্পনা-বাহুল্যও করতে হয়েছিল। তিলোত্তমার বিমাতা বিমলাও ছিলেন নিজ মাতার অবৈধ সন্তান। এজন্য তাকে প্রগলভারূপে আঁকা হলেও তার চিত্র নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে সমসাময়িক পাঠকের অভ্যস্ত ধারণাকে আঘাত করে নি বা অস্বাভাবিক বিবেচিত হয় নি। আয়েষা পাঠান রাজের নিতান্ত আদরের মেয়ে, তাই তার আচরণের স্বাধীনতাকে খুব সম্ভবপর মনে না হলেও অদ্ভুত মনে হয় না।

পরবর্তী উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'র নায়িকা লোকসমাজ থেকে দূরবর্তী স্থলে কেবল প্রৌঢ় বয়স্ক দুটি পুরুষের মধ্যে পালিতা; তাই তার উপন্যাস-কথিত যৌবনাবস্থা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের মধ্যে কোনো অসম্ভাব্যতা দেখা দেয় নি। ধর্মভ্রষ্টা মতিবিবিকে দিল্লীর রঙমহলের আশ্রয়ে রেখেই বঙ্কিমচন্দ্র তার চরিত্রের উপন্যাস-বর্ণিত বিকাশকে স্বাভাবিকতা দিয়েছেন। মৃণালিনী বাংলার মেয়েই নন এবং বঙ্কিমের কালেরও নন। তাই তাঁর স্বাধীন প্রেম অস্বাভাবিক লাগে না। আর পশুপতি মনোরমার যে প্রেম তা প্রথমত বিধি-বহির্ভূত হলেও গ্রন্থকার দুজনের বিবাহের রহস্য উদ্‌ঘাটন ক'রে সে বিষয়ে দৃষ্টিকটুতা আরোপের সম্ভাবনা লঘু করেছেন। এরকম 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' আদি উপন্যাসগুলির সমালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রাপ্তযৌবনা রমণীকে তিনি যে যে জায়গায় আখ্যানবস্তুতে প্রবেশ করিয়েছেন সেখানেই তারা, হয় ভিন্ন দেশের নয় ভিন্ন কালের, নয়তো দুইই, অথবা তারা দৈব দুর্বিপাকে বা দুর্ভাগ্যের জন্য সমাজচ্যুত।

'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি যে সব উপন্যাসে বঙ্কিম প্রায় সমসাময়িক বাঙালী সমাজের ছবি এঁকেছেন, সেখানেও অত্যাবশ্যক প্রাপ্তযৌবনা নারীচরিত্রগুলির—যাদের দ্বারা আখ্যানের ঘটনাবলি অপরিহার্য রূপে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে—যৌবনাবস্থা কল্পনার বেলায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্যে নানা কৌশল অবলম্বন করেছেন। যেমন কুন্দনন্দিনী ভাগ্যদোষে যৌবনে মাতা-পিতাহীন এবং পরে বালবিধবা, ইন্দিরা পিতার আর্থিক-দম্ভ বশত দীর্ঘকাল বিরহিণী ও পিত্রালয়বাসিনী; রজনী দরিদ্র ও জন্মান্ধ, রোহিণী এবং হীরা দরিদ্র গৃহস্থ-কন্যা, বালবিধবা ও উপযুক্ত অভিভাবকহীনা, এসব কারণে যৌবন-সমাগমে এদের সমাজ-দুর্লভ প্রেমোন্মত্ততায় স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয় নি।

যথোপযুক্ত বয়সের পরেই লোকের চরিত্রকে বৈচিত্র্য দান করতে পারে তার শিক্ষা-দীক্ষা। বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস লিখতে শুরু করেন, তখন এ-দেশে সবে

মাত্র স্ত্রী-শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছে। কোনও প্রকারে অল্প-বিস্তর শিক্ষা পেয়েছে এমন নারী তখনো নিতান্ত দুর্লভ। তাই 'বিষবৃক্ষে'র সূর্যমুখী ও কমলমণির বেলায় বঙ্কিমচন্দ্রকে মিস্ টেম্পল নাম্নী মেম শিক্ষয়িত্রীর অবতারণা করতে হয়েছিল। রজনী জন্মান্ধ ব'লে লেখাপড়ায় অজ্ঞ, সাধারণ চিঠিপত্র লেখার বেশি বিদ্যা যে ভ্রমরের ছিল তা' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পড়লে মনে হয় না। রোহিণী বা হীরা নিম্নশ্রেণীর চরিত্ররূপে কল্পিত, কাজেই তাদের শিক্ষার কথা ছেড়ে দেওয়া যায়। এই যে সমস্ত চরিত্রের কথা বলা গেল, তাদের মধ্যে সূর্যমুখী ও কমলমণির চরিত্র সব চেয়ে উজ্জ্বল ও মহিমাময়। সমসাময়িক সমাজে এ রকম চরিত্র সৃষ্টির উপাদান সুলভ ছিল না ব'লেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ও ভারতের অতীত ইতিহাসের ভিতর থেকে ও সেই সঙ্গে রাজপুতানায় এবং উত্তর-ভারতের মোগল রাজঅন্তঃপুরাদিতে পাত্রপাত্রীর কল্পনা ক'রে গেছেন। নিজের দেশ-কাল থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ব'লে এসব চরিত্রের স্বাভাবিকতার দাবী খানিকটা গৌণ হ'য়ে পড়েছে। যে দেশ বা কাল সম্বন্ধে পাঠকদের তথা লেখকের জ্ঞান সুপরিস্ফুট বা সম্পূর্ণ নয়, সে দেশ-কালের কোনো অবস্থা বা চরিত্রকে নিতান্ত অস্বাভাবিক মনে হওয়ার কারণ অল্পই ঘটতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র পাত্রপাত্রীদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ছিলেন। তাঁর প্রচার-মূলক উপন্যাসগুলি বাদ দিলে তাঁর সৃষ্ট কোনো চরিত্রকে অস্বাভাবিকের পর্যায়ে ফেলা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের এ গুণটির পরে উল্লেখযোগ্য তাঁর চরিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি। কোনো কোনো উপন্যাসে বা তার অংশবিশেষে তিনি নিজে প্রচ্ছন্ন থেকে চরিত্রগুলিকে স্বাভাবিক-ভাবে বিকাশ লাভের সুযোগ দিয়েছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র দ্বিতীয়ার্ধ, 'চন্দ্রশেখরে'র প্রথমাংশ, 'সীতারামে'র প্রথমাংশ, 'কপালকুণ্ডলা' এ বিষয়ে প্রমাণ। আখ্যান বিকাশের এ পদ্ধতিটিকে বলা হয় নাটকীয় কৌশল। কারণ নাটক রচনার সময়ে গ্রন্থকারকে থাকতে হবে কাহিনী থেকে দূরে প্রচ্ছন্নভাবে। অথচ চরিত্রগুলি সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি এমন সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক হবে যাতে তাদের ওপর আরোপিত উক্তি প্রত্যুক্তিগুলিতে তাদের অন্তরের গোপন তথ্য বেশ সহজেই প্রকাশ পায়। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র এ কৌশলটি সর্বপ্রথম প্রয়োগ করলেও তা খুব সফল হয় নি। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসের যে যে অংশে তিনি চরিত্র-বিকাশের নাটকীয় পন্থা অনুসরণ করেছেন তা বেশ স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু 'চন্দ্রশেখরে' বঙ্কিমচন্দ্র এ পন্থা খুব সফল ভাবে অনুসরণ করতে পারেন নি, যদিও সে চেষ্টা করেছিলেন। আবার 'কপালকুণ্ডলা'য় ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রথমার্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বেশ সার্থকভাবে নাটকীয় কৌশলের সঙ্গে চরিত্রগুলিকে ফুটিয়েছেন।

'সীতারাম' উপন্যাসের একাংশও এ নাটকীয় কৌশলে রচিত। কোনও সমালোচকের মতে এ বইখানি বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। আখ্যান-বিন্যাস ব্যাপারে নাটকীয় কৌশলের উপযোগিতা যথেষ্ট থাকলেও উপন্যাসে তাকে একান্তভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়, আর বাঞ্ছনীয়ও নয়। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে পাত্র-পাত্রীদের নিগূঢ় মনস্তত্ত্ব বা কার্যকলাপের বাহুল্য তাদের কথাবার্তায় ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। সে সকল ক্ষেত্রে লেখককে সর্বজ্ঞ-রূপে সে সব বর্ণনার ব্যবস্থা করতে হয়। আর কোনো কোনো জায়গায় ঘটনা-বিশেষ সম্বন্ধে সুবিবেচিত মন্তব্যও বর্ণিত কাহিনী সম্বন্ধে পাঠকের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে উপন্যাস লেখককে সাবধানে নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বর্ণনার কাজ চালাতে হয়। 'মৃণালিনী' উপন্যাসের তুর্ক কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের বর্ণনা গ্রন্থকারের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগের এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ইতিহাস এ সম্বন্ধে যে অবিশ্বাস্য কাহিনীর উল্লেখ ক'রে গেছে, বাঙালীর পৌরুষ বজায় রেখে তিনি তার বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'তেও এ জাতীয় প্রয়োজনে তাঁকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর বলে সমস্ত আখ্যানটিকে ও তার অন্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলিকে ফোটাতে হয়েছিল। নিষ্কাম-ধর্মের ও অনুশীলনতত্ত্বের বিগ্রহ হিসাবেই তিনি এঁকেছিলেন প্রফুল্ল বা দেবী চৌধুরাণীর চরিত্র। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে এ উপন্যাসের মধ্যে অকুণ্ঠিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছে। এগুলি ছাড়াও প্রত্যেক উপন্যাসের মধ্যে এখানে সেখানে তিনি পাত্র-পাত্রীদের কার্যকলাপাদি সম্বন্ধে নানা ছোটখাটো মন্তব্য করেছেন যা উপাখ্যানের উপাদেয়তা বাড়াবার সাহায্য করেছে। এরকম মন্তব্যই কিয়দংশে উপন্যাসকে তার বৈশিষ্ট্য দান করে। পূর্বোক্ত দুটি ছাড়াও আখ্যান বিকাশের এক তৃতীয় পদ্ধতি আছে। সে হচ্ছে আখ্যানের অন্তর্গত পাত্রপাত্রী-বিশেষের দৃষ্টিতে অপরাপর পাত্রপাত্রীর কার্যকলাপকে দেখা। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'র শেষাংশে আখ্যানটিকে প্রায়শ বিমলার দৃষ্টিতেই দেখেছেন, আর 'আনন্দমঠে' তিনি কাহিনীটিকে দেখেছেন তাঁর কল্পিত মহাপুরুষের দৃষ্টি দিয়ে। আখ্যান বিকাশের তিনটি পন্থা অনুসরণ করলেও বঙ্কিমচন্দ্র কোনো উপন্যাসে কোনো একটিকেই একান্তভাবে অবলম্বন করেন নি। তাতে তাঁর উপন্যাসগুলি গঠনবৈচিত্র্যের দিক দিয়ে খুব মনোজ্ঞ হয়েছে।

নিজ রচনাকে বৈচিত্র্য দান করবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র আরও নানা কৌশল আশ্রয় করেছিলেন। তাঁর কতকগুলি উপন্যাসে (যেমন দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী ও রাজসিংহ আদি) গল্পাংশ আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন চরিত্র এবং ঘটনা-পর্যায়ের সমবায়ে তৈরী, কিন্তু তাঁর শিল্পকৌশলে এ বিচ্ছিন্নতাও

ঐক্য লাভ করেছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলা ও আয়েষার মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই, কিন্তু উভয়ের সঙ্গে পরিচিত জগৎসিংহ এ দুই নারীকে উপাখ্যান-গত ঐক্যে আবদ্ধ করেছেন। 'কপালকুণ্ডলা'রও নায়িকা এবং মতিবিবি পরস্পরের থেকে নানা বিষয়ে একান্ত পৃথক হয়েও নবকুমারের সম্পর্কে একত্রে মিলেছেন। 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্রনাথ ও হীরা এ দুজনের নানাদিক থেকে প্রভেদ সত্ত্বেও এক দিক দিয়ে তাদের এ সাদৃশ্য ছিল যে তারা উভয়েই প্রেমের তাড়নায় আত্মহারা। এ উগ্র প্রেমতৃষ্ণাই তাদের একত্রে বেঁধেছিল কুন্দনন্দিনীরূপ সূত্রের সাহায্যে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসেও দুটি কাহিনীকে একত্রে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এর এক দিকে আছে প্রতাপ-শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের আখ্যান, অপরদিকে আছে দলনী গুরগন্ ও মীরকাশিমের কাহিনী এবং তদানুষঙ্গিক নবাব ও ইংরেজের লড়াই। এ শেষোক্ত কাহিনীর যুদ্ধ-ব্যাপারই দুটি আখ্যানকে একত্র করেছে। 'রজনী' এবং 'রাজসিংহে'ও এরকম কৌশলের পরিচয় আছে।

চরিত্র-চিত্রণ ও আখ্যান বিন্যাসের কৌশল আলোচনার পরে দৃষ্টি দিতে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের আনুষঙ্গিক দেশকালের বর্ণনার ওপর। এ বর্ণনা যথোচিতভাবে করা হলেই আখ্যানবস্তুর কাঠামোটি এবং বর্ণিত চরিত্রগুলি জীবন্তবৎ প্রতিভাত হয়, আর সমগ্র আখ্যানের বিশ্বাস্যতা যথোচিত রূপ লাভ করে। এরূপ বিশ্বাস্যতার ফলে উপন্যাস-বর্ণিত পাত্রপাত্রীদের সম্বন্ধে সহৃদয় পাঠকগণ এক সমপ্রাণতা অনুভব করেন, যার দ্বারা রসানুভব সহজ হয়ে আসে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ আদি উপন্যাসের আরম্ভ ভাগের বর্ণনাগুলি মনে করা যেতে পারে। গ্রন্থগুলির অভ্যন্তর ভাগেও এরূপ বর্ণনার অসদ্ভাব নেই। 'কপালকুণ্ডলা'য় সমুদ্রতটে নায়িকার বর্ণনা, 'দেবী চৌধুরাণী'তে ত্রিস্রোতার কূলে জ্যোৎস্না-রাত্রে সখীসহিত নায়িকার বর্ণনা (২য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ) এ কথার উত্তম দৃষ্টান্ত। এ সকল স্থলে বঙ্কিমের গদ্য, কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং তার ফলে সমগ্র আখ্যানবস্তু এক অপূর্ব রসৈশ্বর্যে মণ্ডিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র আবার এ রসকে মাঝে মাঝে নিজ ব্যক্তিগত চিন্তার ধারায় অনুরঞ্জিত করে অপরূপ করে তুলেছেন। সীতারাম উপন্যাসের উদয়গিরি ললিতাগিরির বর্ণনা (১ম খণ্ড ১৩শ পরিচ্ছেদ) এর দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু স্থানে স্থানে দেশকালের নানা সুন্দর বর্ণনায় সমৃদ্ধ বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি কখনো অতি বৃহৎ হয়ে ওঠে নি। এদিক দিয়ে তাঁর গুরু স্থানীয় Walter Scott-এর চেয়ে তিনি বেশি সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের মাত্রাজ্ঞান বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

বঙ্কিমের সংলাপ-রচনাও বিশেষ চিত্তাকর্ষক এবং কৌশলপূর্ণ। তাঁর এ গুণপনা

সহজেই চোখে পড়ে, তাই এখানে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হ'ল না। চরিত্র-চিত্রণ, আখ্যান-বিন্যাস আদির সুকৌশলের সঙ্গে এ গুণটি থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত বাংলা উপন্যাসশিল্পের আদর্শ অতুলনীয়। এজন্যেই বাংলা উপন্যাসশিল্পে তাঁর দান চিরস্মরণীয়। পরবর্তী শক্তিমান্ লেখকরাও অল্পবিস্তর তাঁর পথেই চলেছেন।

উপন্যাস-সাহিত্য সম্বন্ধে উপরিস্থিত আলোচনার যে কয়টি অংশ বিশেষভাবে মনে রাখার দরকার আছে সেগুলি এই :—

(১) উপন্যাস কাকে বলে ? এ প্রশ্নের কেবল একটি মোটামুটি উত্তর দেওয়া যেতে পারে। গদ্যে লিখিত যে সুদীর্ঘ আখ্যানের মধ্যে নানা কল্পিত নর-নারীর চরিত্রের (চিন্তা ও কর্মের) বিস্তৃত বিবরণ এবং তারা যে দেশ কালে চলা-ফেরা করে তার যথোচিত বর্ণনা থাকে তাকেই 'উপন্যাস' বলা যেতে পারে। এই পরিসরের মধ্যেও বাংলা উপন্যাস বিচিত্রতায় ন্যূন নয়। যদি উপন্যাসের এর চেয়েও কোনো সংকীর্ণ লক্ষণ ধ'রে নেওয়া হয় তবে তার থেকে বাংলার দু'একখানি সুপরিচিত উপন্যাস বাদ প'ড়ে যেতে পারে।

(২) উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ কী ?

(ক) গল্পাংশই কি উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ ? যদি তাই হয় তবে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' সম্বন্ধে কী বলা যাবে ? আর 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধেও অবস্থা কি প্রায় সে রকম নয় ?

(গ) তবে কি চরিত্রাঙ্কনই উপন্যাসের প্রাণ ? এ অঙ্গটি সমস্ত ভালো বাংলা উপন্যাসে বর্তমান। যে সকল ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট চরিত্রগুলি জীবন্ত, কেবল তাঁরাই যশঃশরীরে দীর্ঘ-জীবন লাভ ক'রে থাকেন। কিন্তু জীবন্ত চরিত্র মানে এই নয় যে, তাঁরা যে সকল চরিত্র আঁকেন সে রকম চরিত্রের লোক আমরা বাস্তব জীবনে দেখে থাকি। নিপুণ ঔপন্যাসিক প্রায়শ বাস্তব জীবনের অনুকরণ করেন না ; তবে তাঁর চরিত্র-চিত্রণের পশ্চাতে থাকে এই বাস্তব-জীবনের ইঙ্গিত বা প্রেরণা ; একজন ইংরেজ লেখিকা (Mrs. Virginia Wolf) এ সম্বন্ধে একটি বেশ চমৎকার মন্তব্য করেছেন। একবার রেল গাড়িতে ভ্রমণের সময় এক বৃদ্ধার ব্যক্তিত্ব তাঁর এতটা অভিনব ব'লে মনে হয়েছিল যে তিনি তাকে একখানি অলিখিত উপন্যাসের চরিত্ররূপে গণ্য না ক'রে পারেন নি। উক্ত লেখিকা এ প্রসঙ্গে বলেন, 'Mrs. Brownকে দেখলে যে কোনো লেখক স্বতই তার চরিত্র নিয়ে উপন্যাস লেখার তাগিদ অনুভব করবেন। আমার বিশ্বাস সকল উপন্যাসেরই রচনা, সামনের কোনে বসা কোনে বুড়ো মেয়ে মানুষকে দেখার পরই শুরু হয়' (Heres is Mrs. Brown making some one begin almost

automatically to write a novel about her. I believe that all novels begin with an old lady in the corner opposite)। কিন্তু প্রায়শ দেখা যায় যে, ঔপন্যাসিক প্রয়োজন-মতো তাঁর দেখা নানা জনের ছবির নানা অংশ একত্র মিলিয়ে তাঁর গল্পের অন্তর্গত চরিত্রগুলি এঁকে তোলেন। আর কখনো কখনো তাঁর আঁকা চরিত্রগুলি বাস্তব জীবনের চেয়ে কল্পনার উপরই নির্ভর করে বেশির ভাগে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলির সঙ্গে থাকে বাস্তব-জীবনের সঙ্গতি। যদি সে চরিত্রগুলি দেখে তাদের সাধারণ মানব সমাজের অঙ্গীভূত জীব ব'লে চেনা যায় এবং বিভিন্ন ঘটনা চক্রের মধ্যে প'ড়ে তারা সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করে তবেই বলা হয় ঔপন্যাসিকের চরিত্র-সৃষ্টি সার্থক হয়েছে। সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন পাঠক এদিক দিয়ে উপন্যাসের মূল্য বিচার করতে সমর্থ। তিনি সহজেই বুঝতে পারেন কোনো অঙ্কিত চরিত্র কৃত্রিম কি স্বাভাবিক। অবশ্য চাঞ্চল্যজনক বা লোমহর্ষণ উপন্যাসের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। ভালো বাংলা উপন্যাসের বেলায় এটি প্রায়শই ঘটে যে তাতে অঙ্কিত চরিত্রগুলি আমাদের দেখা লোকদেরই মতো বাস্তব বলে মনে হয়।

১৬শ অধ্যায়

উপন্যাস ও ছোটো গল্প

একালের নূতন গীতিকাব্য, নূতন ধরণের প্রবন্ধ বা নাটক আমাদের যতই ভালো লাগুক না কেন, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সমসাময়িক সাহিত্যিক ক্ষমতার এক শ্রেষ্ঠ অংশ প্রকাশিত হচ্ছে কথা-সাহিত্যের (উপন্যাস তথা ছোটো গল্পের) মধ্য দিয়ে। যদিও উপন্যাস কথাটি একটি চলনসই সংজ্ঞা মাত্র এবং গদ্যে রচিত যে কোনো বড়ো আকারের গল্পের বেলায়ই ব্যবহৃত হতে পারে তবু আগের অধ্যায়ে অতীতের উপন্যাসগুলিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আজকাল এত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উপন্যাস লেখা হচ্ছে এবং রচনায় এত বিচিত্র রীতি অনুসৃত হচ্ছে যে, এর কোনো সাধারণ লক্ষণ নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। কাজেই উপস্থিত অধ্যায়ে আজকালকার বাংলা উপন্যাসের দু'য়েকটি বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য করা হবে, আর সেই সঙ্গে আলোচনা করা হবে ছোটো গল্প ও উপন্যাসের সম্পর্ক এবং ছোটো গল্পের প্রকৃত লক্ষণ।

যদিও বাংলা উপন্যাসের আদি গুরু বঙ্কিমচন্দ্র মোটামুটি ভাবে স্কটের (Sir. Walter Scott) আদর্শেই তাঁর নানা শ্রেণীর উপন্যাসগুলি রচনা ক'রে গেছেন তবু উপন্যাসের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে তাঁর একান্ত নিজস্ব আদর্শ ছিল। স্কটের বইএর তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি নিতান্তই ক্ষুদ্রকায়। নানা উপগল্প ও দেশ-কালের অতি বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে স্কট তাঁর উপন্যাসগুলিকে এত ভারী ক'রে তুলেছেন যে, স্থানে স্থানে সে সকলের দ্বারা গল্পের গ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়েছে এবং মূল গল্পের অন্তর্নিহিত ঐক্য নষ্ট হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে এ জাতীয় মারাত্মক কোনো ত্রুটি নেই বললেই হয়। নানা ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে প'ড়ে কোনো ব্যক্তিবিশেষ যে আচরণ করে তার বর্ণনাকেই যদি উপন্যাস বলা হয়, তবে যে বইতে যত বেশি ঘটনা ও অবস্থাপর্যায় বর্ণিত হবে সেই পরিমাণেই যে সার্থক হয়ে উঠবে এমন নয়। ওরূপ বর্ণনা-বাহুল্য ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই চরিত্রবিশেষ ফুটে ওঠে বটে কিন্তু এর অতিমাত্র বাহুল্য নিয়ে যখন স্কটএর মতো ঔপন্যাসিকও তাল সামলাতে পারেন নি, তখন অন্য ছোটো-খাটো লেখকদের 'কা কথা'। তাই ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ সাবধান, ঘটনা-বাহুল্য ও বর্ণনা-বৈচিত্র্যের প্রয়াস না করেই তাঁরা গল্পাংশ এবং তার অন্তর্গত চরিত্র-পর্যায়কে ফোটাবার চেষ্টা ক'রে থাকেন।

কিছুকাল আগে য়ুরোপীয় সাহিত্যে এক বহুপর্বাত্মক অতিকায় উপন্যাস দেখা দিয়েছে। সুবিখ্যাত ফরাসী লেখক রমঁ্যা রোলাঁ (Romain Rolland) কৃত 'জঁ্যা ক্রিস্তফ' (ইংরেজী John Christopher) এর দৃষ্টান্ত। আজকাল-কার বাংলা সাহিত্যেও এ জাতীয় বহুখণ্ডাত্মক উপন্যাসের দেখা মিলছে। কিন্তু এ সকল উপন্যাসের অধিকাংশেই উচ্চ শ্রেণীর কলা-কৌশল দুর্লভ। পাশ্চাত্য সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ লেখকের রচিত সুবৃহৎ উপন্যাসগুলি যেমন খণ্ডের পর খণ্ডে গল্পের আকর্ষণ সমানভাবে বজায় রেখে চলতে পারে বাংলা অতিকায় উপন্যাসগুলিতে প্রায়শ তেমন দেখা যায় না। এদের প্রথম খণ্ড প'ড়ে যে আশা জাগে, পরের খণ্ড গুলিতে তা কদাচিৎ সার্থক হয়। এ গুলিতে না থাকে ঘটনা-বৈচিত্র্য, না থাকে চরিত্র-বিকাশের চমৎকারিত্ব। কিন্তু এ ব্যাপারটি বাদ দিলে বাংলা উপন্যাসের আধুনিক লেখকগণের চেষ্টার প্রশংসাই করতে হয়। পাশ্চাত্য উপন্যাসের দু'একজন অন্ধ অনুকরণকারীকে বাদ দিলে একথা বলা যেতে পারে যে তাঁদের চেষ্টায় বাংলা উপন্যাসের ধারা বেশ সজীবভাবে এগিয়ে চলেছে। এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে নানা বিষয়বস্তু প্রকাশের ও রচনারীতি প্রকাশের যে পরীক্ষা চলছে তাতে মনে হয় উক্ত উপন্যাসকে কোনো সংজ্ঞার বাঁধা-ধরা সীমার মধ্যে আবদ্ধ না রাখাই ভালো।

অবশ্য এ সত্ত্বেও আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ যে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মেনে চলেন তা বলাই বাহুল্য। এ নিয়মগুলি হচ্ছে :—

(১) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে একটি গল্পকে বিবৃত করা। (২) সেই গল্পটিকে যথাসম্ভব বাহুল্য-বর্জিতভাবে বলা। (৩) গল্পকে নানা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য উপদেশমালা বা মনস্তত্ত্বের বিবৃতি দিয়ে বোঝাই না করা।

আধুনিক লেখকগণ যে, উপন্যাসের সীমা সম্বন্ধে সচেতন সেটি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের ছোটো গল্প রচনার বেলায়। উপন্যাসের সঙ্গে ছোটো গল্পের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে দৈর্ঘ্য নিয়ে। উপন্যাসের কাজ পাত্র-পাত্রীদের জীবন কাহিনী অনেকটা বিস্তৃতভাবে বিবৃত করা; সেই বিবৃতির অনেকটাই হচ্ছে তাদের সংশ্লিষ্ট দেশ-কালের বর্ণনা, কারণ এই বর্ণনাই উপন্যাসের চরিত্রগুলি ফোটাবার সাহায্য করে এবং গল্প ও গল্প-সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলিকে বাস্তবতার রঙে রঞ্জিত করে। অপর পক্ষে, ছোটো গল্প কোনো জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা নয়, জীবনের কোনো ক্ষুদ্র অংশের মোটামুটি ছবি। এই শেষোক্ত কথা কয়টির মধ্য দিয়েই ছোটো গল্পের রচনারীতি তথা উদ্দেশ্য বেশ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বিখ্যাত মার্কিন কথা-সাহিত্যিক পোএ (Edgar Allan Poe) বলেন যে, ছোটো গল্প পাঠকের মনের ওপর একটা সমগ্রতার প্রভাব (an effect of totality) অর্থাৎ অবস্থা অভিজ্ঞতা বা ঘটনা-বিশেষের একীভূত ছাপ রেখে যাবে। 'ছোটো' গল্প এই সংজ্ঞাটি বিশেষভাবে সার্থক এজন্যে যে, এর থেকে সহজেই জানা যায়, উপন্যাসের মতো সমগ্র জীবনকে না দেখে ছোটো গল্প জীবনের অংশ বিশেষের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। অর্থাৎ ছোটো গল্পের লেখক সমগ্র জীবন থেকে তার অংশ বিশেষকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে তার উপর সতর্ক দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত ক'রে থাকেন।

এ উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ করতে হলে উপন্যাস রচনার পদ্ধতিকে সরল ও বাহুল্য-বর্জিত ক'রে নেওয়া অত্যাবশ্যক। এজন্যে প্রথম কাজ হচ্ছে গল্পাংশকে (plot) উপগল্পের (subplot) বন্ধন থেকে মুক্ত করা। উপন্যাসে এই উপগল্পের প্রয়োজন এজন্যে যে তার দ্বারা মূল কাহিনী পরিস্ফুটনের সুবিধা পাওয়া যায়। আর ছোটো গল্পের অন্তর্গত ঘটনা পর্যায়কেও সংক্ষিপ্ত করতে হয়। যে ঘটনার চরম পরিণতিতে গল্প পরিসমাপ্ত হবে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় এমন ঘটনাবলীকে নির্মমভাবে বাদ দিতে হবে। আর ছোটো গল্পের পাত্র-পাত্রীরাও হবে খুব অল্পসংখ্যক, কেবল যাদের নেহাৎ না হ'লে নয়। কারণ বৃহত্তর আখ্যানে তার পটভূমিকা আঁকবার জন্য সকল অবান্তর চরিত্র-সৃষ্টির যে প্রয়োজন তা এখানে নেই। আর এই আখ্যানবস্তু, ঘটনাবিন্যাস ও পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা সম্বন্ধে সংযম অবলম্বনের পরেই

ছোটো গল্পের লেখককে দেখতে হবে, সমগ্র গল্পে যেন কোনো একটি মাত্র রসই প্রধানভাবে বর্তমান থাকে।

উপন্যাসে যে রসই মুখ্য হোক্ না কেন বৈচিত্র্য সঞ্চারের জন্যে মাঝে মাঝে অবান্তরভাবে তাতে অন্যান্য রসেরও অবতারণা করা চলে, কিন্তু ছোটো গল্পে এরূপ সুস্পষ্ট রসবৈচিত্র্য ঘটাতে গেলে ঐ গল্প পাঠকের বা শ্রোতার চিত্তে একটি অখণ্ড ছাপ দিতে পারে না, অথচ ওরূপ অখণ্ড ছাপ দিতে পারা ছোটো গল্পের অপরিহার্য লক্ষণের অঙ্গীভূত। আর ছোটো গল্প যে প্রায়শ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটানা লিখে ফেলা যায় তাতে বস্তুটি এক অখণ্ড রসানুভবের প্রেরক হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়।

উপরে যে সব কথা বলা হ'ল তার সার মর্ম এই যে :—ছোটো গল্পের একমাত্র কাজ কোনো একটি মাত্র চিত্তাকর্ষক অবস্থাকে প্রকাশ করা। যত অল্প সংখ্যক কথায় সম্ভব কোনো অবস্থার চরম কোটিতে পৌঁছানোই হচ্ছে ছোটো গল্পের উদ্দেশ্য। এর সমস্ত জোরই শেষের দিকে। যে উপাদান গুলি উপন্যাসের বেলায় অপরিহার্য ছোটো গল্পে সেগুলিকে ব্যবহার না করাই হচ্ছে ঐ শেষের দিকে পৌঁছাবার নিরাপদ উপায়। ছোটো গল্পে রসের স্ফুরণ ঘটবে সর্বশেষ ভাগটিতে। নিপুণ পাঠক একটু সতর্কতার সঙ্গেই গল্প পড়তে থাকেন; তিনি জানেন যে আরব্ধ কাহিনীর রহস্য উন্মোচিত হবে এই শেষের দিকটিতে। এখানেই যেন অপেক্ষা ক'রে আছেন সেই নিয়তি দেবী যিনি পূর্ব বর্ণিত সব ঘটনাকেই ঘটিয়ে অকস্মাৎ নূতন দিকে তাদের মোড় ফিরিয়ে দেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পটির উল্লেখ করা যায়। যে অনাথবন্ধু শ্বশুরের অর্থ অপহরণ ক'রে বিলাতে গিয়ে খরচ চালাবার জন্যে স্ত্রীর গয়না-বেচা টাকা পর্যন্ত নিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে এসেছিল, সর্বশেষে প্রায়শ্চিত্ত সভায় তার বিবাহিত মেমসাহেবের সশরীরে আবির্ভাবের মধ্যেই সমগ্র গল্পটির রস-রহস্য কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যে গল্পের মধ্যে এ ধরণের ব্যাপার ঘটে নি তাকে ছোটো গল্প বলা শক্ত। খুব অল্প কথায় এমন ক'রে গল্পটিকে চরম পরিণতিতে নিয়ে যাওয়াই হ'ল ছোটো গল্প লেখকের প্রধান গুণ। আর এদিক দিয়েই হচ্ছে ঔপন্যাসিকের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ। উপন্যাস লেখক আরো ধীরে সুস্থে এবং অনেক সময় ধ'রে আখ্যানবস্তুর আসল রহস্যটি প্রকাশ করেন। বাংলার সুপরিচিত লেখকদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা প্রায়শ ছোটো গল্পের উপসংহারে আখ্যানটিকে রসের চরম কোটিতে নিয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় এ দিক দিয়ে খুব কৃতী লেখক।

উপন্যাসের আসল কাজ হচ্ছে চরিত্র, গল্পাংশ ও পরিবেশের সৃষ্টি। এ তিনটি

বস্তুর সাহায্যে পাঠকের চিত্তকে আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু ছোটো গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে আকর্ষণকে এমন ভাবে বিক্ষিপ্ত করলে চলে না। নিপুণ লেখক তাই রুচি ও সুবিধা অনুসারে এ তিনটির একটিকে বেছে নিয়ে তাকেই গল্পে প্রধান ভাবে বিবৃত করেন। তার ফলেই গল্পটি একটি মাত্র অখণ্ড রসের উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এ তিন শ্রেণীর ছোটো গল্পই লিখেছেন। তাঁর 'মধ্যবর্তিনী', 'অনধিকার প্রবেশ' আদি গল্পে রসের আশ্রয় চরিত্র-চিত্রণ, 'শুভদৃষ্টি' 'সমস্যাপূরণ' প্রভৃতি গল্পে রস প্রধানভাবে ফুটেছে গল্পাংশের নিপুণ উদ্ভাবনে, আর 'ক্ষুধিত পাষাণ' 'একরাত্রি' আদি গল্পে রসের পরিপুষ্টি ঘটেছে পরিবেশের সুকৌশল বর্ণনায়।

ছোটো গল্পের আকর্ষণকে তিন ভাগে বিচ্ছিন্ন না ক'রে ফেলার মতো সংযম অবলম্বন করা খুব সহজসাধ্য নয়। কারণ কেবল পরিবেশ বা চরিত্রসৃষ্টি দ্বারা গল্প তৈরী করা যায় না। পরিবেশের মধ্যে কোনো পাত্র-পাত্রী থাকা চাই এবং তাদের বিশেষ কার্যকলাপও থাকা আবশ্যক। আবার এ সকল কার্যকলাপের বিবৃতির কোনো একটা পটভূমিকা এবং অল্পস্বল্প চরিত্র-চিত্রণও অপরিহার্য। তাই পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীর আকর্ষণের মধ্যে যে কোনো দুটিকে তৃতীয়টির চেয়ে দাবিয়ে রাখাই হ'ল ছোটো গল্প লেখকের এক কঠিন সাধনার ব্যাপার।

উপরে উল্লিখিত ছোটো গল্প লেখার কৌশল পাশ্চাত্য দেশের সমসাময়িক কথা-সাহিত্যের উপরও খানিকটে প্রভাব বিস্তার করেছে। কারণ সেখানেও ঔপন্যাসিকেরা প্রায়শ সমগ্র আখ্যানের দ্বারা পাঠকের মনে একটি অখণ্ড ছাপ দেবার চেষ্টা ক'রে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঔপন্যাসিক নিজের কাজে ছোটো গল্পের কৌশল সর্বত্র খাটিয়ে উঠতে পারেন না। ছোটো গল্পে চরিত্র-চিত্রণ, পরিবেশ অঙ্কন ও আখ্যান বস্তুর নির্মাণের মধ্যে যে সামঞ্জস্য অনাবশ্যক এবং যে সামঞ্জস্য উপন্যাসের বেলায় অত্যাবশ্যক সেটির প্রতি উদাসীন থাকা ঔপন্যাসিকের পক্ষে কষ্টসাধ্য। আর ছোটো গল্পের উপসংহারের দিকে যেমন সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা দরকার উপন্যাসে তেমনটি করা তাঁর পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আর আস্তে আস্তে দু'এক ছত্র ক'রে অনেক লিখে গল্পটিকে গ'ড়ে তোলার অভ্যাসটিও তিনি সহজে ছাড়তে পারেন না। পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র ও পরিবেশ সম্পর্ক যে নানা তুচ্ছ খুঁটিনাটি তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টির সামনে দেখা দেয় সেগুলির বিবৃতি ছোটো গল্পের বেলায় প্রায়শ অনাবশ্যক। তাই ঔপন্যাসিক ছোটো গল্প লিখলে তাঁর আখ্যানটি প্রায়শ, অস্বাভাবিক চাপে ছোটো করা একটি উপন্যাসের আকার ধারণ করে। আর দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহারের তারতম্যের ফলেও ঔপন্যাসিকের হাতের ছোটো

গল্প প্রায়শ ভালো উৎরায় না। কোনো একটা বস্তুকে খুব বিস্তৃতভাবে দেখা যাঁর অভ্যাস তিনি তার কোনো একটা অংশের উপর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করতে সুবিধা বোধ করেন না। একফোঁটা গঙ্গাজলকে অনুবীক্ষণের সাহায্যে খুঁটিয়ে দেখার চেয়ে সমগ্র গঙ্গাপ্রবাহের শোভার দিকে তাকানোই তিনি বেশি পছন্দ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র একান্তভাবে আখ্যানের কোনো একটি অংশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারতেন না; তাই তাঁর লেখা 'রাধারাণী' 'যুগলাঙ্গুরীয়' আকারে ছোটো হলেও ছোটো গল্প হয়ে ওঠে নি। আর কোনো কোনো সাম্প্রতিক বাংলা ঔপন্যাসিকের লেখাগুলিতে দীর্ঘ আখ্যান বস্তু থাক্‌লেও সেগুলিকে উপন্যাস বলা শক্ত।

অশুদ্ধি-সংশোধন

১১ পৃষ্ঠা	১৫ পংক্তি	'ভাস্তমনুভাস্তি'	স্থলে	'ভান্তমনুভাতি'	হবে।
১৫ ,,	২৪ ,,	'(সত্যেন্ দত্ত)'	,,	'(সত্যেন্দ্র)'	,,
২২ ,,	১১ ,,	'দুটির'	,,	'ক'টির'	,,
২৩ ,,	২৮ ,,	'ভাষাকে'	,,	'ভাবকে'	,,
৩৯ ,,	৯ ,,	'তাহারই'	,,	'তাঁহারাই'	,,
৪৭ ,,	২৩ ,,	'তর্তি মাহ'	,,	'তথি মাহ'	,,
৮৩ ,,	৩ ,,	'বিজয় বনে'	,,	'বিজন বনে'	,,

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

উদ্ধৃত যে সকল আধুনিক কবিতায় কবির নাম দেওয়া হয় নি, সেগুলি রবীন্দ্রনাথের রচিত। (ম) আধুনিক কোনো মহিলা কবির নামের আদ্যাক্ষর।